গোঁসাইগঞ্জের পাঁচালি

শক্তিপদ রাজগুরু

লেখাপড়া । কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭২

প্রকাশক

রাখাল সেন

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

শ্রীযুগলকিশোর রায়

শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস

৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

গোঁসাইগঞ্জের পাঁচালি

—বুঝলে, তোমার মতিস্থির নাই। রোগ সারবে কি করে? তা কত গাঁট গচ্চা দিয়ে এলে বাপধন? কতো দিলে ওই ঢপের নার্সিং হোমে? অ্যা—?

গগন শীর্ণ দেহটাকে নাড়িয়ে নাকে একটিপ কড়া নস্যি ঠেসে শুধোয় কথাটা।

গোবর্ধন সাঁপুই এর গায়ে জড়ানো ধুসো চাদর, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পাশের গ্রাম নলপুরের সমৃদ্ধ চাষী। তবে দেখে বোঝার উপায় নাই। খাঁকশ মার্কা চেহারা।

গোবর্ধন বলে—তা গেছে আজ্ঞে শ পাঁচেক! ডাক্তারবাবু কল বসিয়ে দেখলেন, বুকের ছবি তোল্লেন তারপর মলমূত্র পরীক্ষা করালেন, মায় ফুঁড়ে রক্ত নেছেন বলেন অপারেশন করতে হবে।

—রক্ত শুষছে বলো ওই পিশাচ অবনী চাটুয্যের ঢপের নার্সিং হোমে, 'কালে কালে হল কি, পান্থা ভাতে পড়লো ঘি?' গোঁসাইপুরেও গজিয়ে উঠলো হাট তলার নার্সিং হোম। টাকা মারার কল।

হলো কিছু? এত তো খর্চা করলে? কি হে গোবর্ধন?

গোবর্ধন বলে—নয়, এখনও পিঠ কন কন করে, মাথা ভোঁ ভোঁ করে, প্যাটে মোচড় মারে।

—মারবেই তো। গগন ডাক্তার গা ঝাড়া দিয়ে বলে—তবে এসে গেছ কোন ভয় নাই। হ্যানেমান ঠাকুরের দয়ায় সেরে যাবে। এই সা গুলি দেব—পেটের ব্যথা, কনকনানি পালাতে পথ পাবে না! আর শোন—গলাকাটা ডাক্তারি আমি করি না। ওই এলোপ্যাথির মুরোদ কি বল? ছুরি কাঁচি সে কাড়াফাড়িও নাই—একেবারে জড় থেকে রোগকে শিকড় সমেত নির্মূল করে দেবে।

হ্যাঁ—বেদনা কোনদিকে? ডাইনে না বাঁয়ে—

—বাঁয়ে।

—হবেই। গরম না ঠাণ্ডা কি ভাল লাগে?

গগন ডাক্তার এবার তার কাঠের খোপ খোপ কাটা বাক্স খুলে একটা ছোট শিশি বের করে চেপে ধরে বলে—শুনেছিস?

—আজ্ঞা! গোবর্ধনের কানের কাছে শিশিটা ধরে।

—শোঁ শোঁ শব্দ শুনেছি। গোবর্ধন বলে।

—শোঁ শোঁ শব্দ নয়। কথা কইছে ওদের ভাষায়। হ্যানিমান সাহেবের জার্মানী ভাষায়। এ ওষুধে কথা কয় রে। হ্যাঁ—দিনে তিন পুরিয়া খাবি

ব্যস। আর ফড় ফড় করে হুঁকো টানবি না। তামাক বন্ধ। তিনদিনে হাতে হাতে ফল পাবি। দে তিন দুগুনে ছ' টাকা মাত্তর।

গোবর্ধন পাঁচ টাকার নোট কোচড় থেকে বের করে বলে—

—এই নিন আজ্ঞে। তা ভালো হবো তো?

—তিন দিনেই বুঝবি। তোর? অন্য জনের দিকে নজর দেয়। পগন ডাক্তার।

ওদিকে গোঁসাইগঞ্জের হাটতলা তখন জমে উঠেছে।

এখন এই অঞ্চলে নানাদিকে যাবার রাস্তা হয়েছে। গোঁসাইগঞ্জ থেকেই রাঢ় অঞ্চলের চারদিকে পাকা রাস্তা গেছে। এখন মহকুমা শহরই রেলস্টেশন, প্রায় বাইশ কিলোমিটার দূরে। এখান থেকে চারিদিকে এখন বাস যাতায়াত করে বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলের দিকে, এটাই বড় বাস জংশন।

আর মফঃস্বলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোক হাট বাজার করতে যায়, ডাক্তার দেখাতে এখানেই আসে প্রথমে। মফঃস্বল অঞ্চলে এখনও বহু অঞ্চলেই পাশ করা ডাক্তার নাই।

এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিক খুলল এই গোঁসাইগঞ্জে। এখানে দূরে দূরান্তরের ছাত্ররা অনেকেই বোর্ডিং এ থাকে, বাসেও বহু ছেলে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে।

হাটবাজারও বিরাট।

প্রতিদিনই এখানে বাজার বসে। তবে অতীতে গোঁসাইগঞ্জ যখন অজ্ঞ পল্লী-গ্রাম ছিল তখন এখানের মিত্তির বাবুরাই ছিলেন জমিদার।

তাদের এলাকাতেই তখন সপ্তাহে দু দিন হাট বসতো মিত্তির পুকুরের ধারে বিস্তীর্ণ আম বাগানের পাশে। চারিদিক থেকে মালপত্র আনাজ সব আসতো। লোক সমাগমও হতো প্রচুর। আজও দৈনিক বাজার ছাড়াও এখানে সপ্তাহে দু দিন বিরাট হাট বসে। শহর থেকে ট্রাক আসে আনাজপত্র চলে যায় শহরেই। তাই গোঁসাইগঞ্জ এখন জমে উঠেছে।

এখন মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। আগে বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠগুলোয় জল সেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আকাশের বৃষ্টি হলে তবে চাষ হতো, সুবিধা হলে ধান বাঁচতো, ফসল হতো, তাও বছরে একটা ফসল হতো ওই ধান। আর বৃষ্টি না হলে এলাকায় দুর্ভিক্ষ সুরু হত।

এখন ময়ুরাক্ষীর জলাধার থেকে জল ছাড়া হয় ক্যানেলে। সারা মাঠেই সেচ পায়। খাল, বিল ও উদ্বৃত্ত জল ভরে থাকে, ফলে ধানই এখন দুবার হয়। এছাড়াও অন্য ফসল আনাজপত্র হয়। ফলে চাষীদেরও দিন বদলেছে। তাদের হাতেও পয়সা আসছে।

তাই এই গঞ্জের চেহারাও বদলেছে।

এখন মাটির বাড়িও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে। গড়ে উঠছে পাকা বাড়ি।

মদন মিত্র মিত্রবংশের বর্তমান বংশধর।

মিত্রবাড়িই ছিল আগে এখানের জমিদার। গ্রামের ওদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের বাড়ি—ওদিকে কাছারি বাড়ি—দেউড়ি, দিঘী—ঠাকুর মন্দির সবই ছিল।

ক্রমশঃ তাদের পূর্বপুরুষ বিলাসিতা আর আলসেমি করেই বেশী সম্পদ উড়িয়ে দেয়।

দু'তিনটে মহালও চলে যায়। তবু যা ছিল তাও কম নয়।

তাদের সদর নায়েব ছিলো ভূষণ চৌধুরী! শোনা যায় ওই ভূষণ চৌধুরী ছিল দুঁদে নায়েব

কত নিরীহ প্রজার সর্বনাশ করেছে তার ঠিক ঠিকানা নাই। আর গোপনে সর্বনাশ করেছে মিত্র বাড়ির। দেনার দায়ে একটার পর একটা মহাল বিক্রী হয়েছে, বেনামে কিনেছে ন কড়া ছ'কড়ায় ওই ভূষণ চৌধুরী। জমিদারীর আয় পয় অর্ধেক জমা পড়েছে তহবিলে বাকী গেছে তার পেটে।

তারপর জমিদারী চলে যাবার পর মিত্র বাবুদের দশারও শেষ হলো। ওদের বাড়ির অনেকেই কেউ বর্ধমান, কেউ কলকাতায় চাকরী করে, সেখানেই রয়ে গেল।

ক্রমশঃ মেরামত অভাবে বিরাট বাড়িটা এখন ধ্বসে পড়ছে। কাছারি বাড়িতে কোন কোম্পানী পাটের গুদাম, ধানের আড়ত বানিয়েছে। আর দেউড়ির অর্ধেকটা পড়ে গেছে, বাকী অর্ধেকটার মাথায় সিংহটার একটা পা ভেঙ্গে এখনও মিত্রবাড়ির শেষ প্রতিভূ হয়ে টিকে আছে। সেটা কবে কার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নাই।

আর রয়েছে মদন মিত্র। সেজবাবু।

অবশ্য এখন সব গেছে তবু চুনোট করা ধুতি পাঞ্জাবী পরে রোজ সন্ধ্যায় গুপী সাহার দিশী মদের দোকানে গিয়ে একটা পাঁইট কিনে আনে। আগে রাখাল ছেলেটা আনতো, কিন্তু মদনবাবু আবিষ্কার করে ব্যাটা ছিপি খুলে তাজা মাল দু'চার ঢোক গলায় ঢেলে টিউকলের জল মিশিয়ে ভর্তি করে আনে।

তারপর থেকে নিজেই আনে ওটা। একটা মাত্তর পাঁইট আগে বহু ইয়ার বক্স মুফতে খাইয়েছে, এখন সেই দিন আর নেই। ফলে হিসাবী হতে হয়েছে।

মদন মিত্রের মিত্র বাড়ি একদিকে ধ্বসে পড়েছে আর অন্যদিকে ভূষণ চৌধুরীর সুপুত্র অবনী চৌধুরীর বোলবোলাও সুরু হয়েছে।

ভূষণ চৌধুরী অবশ্য ওই চৌধুরী বাড়ির নতুন ভিত পত্তন করে গেছে নিজেই। অবনীও তখন গ্রামে সর্দারী করে। ক্রমশঃ সারা এলাকার মানুষ চেনে তাকে।

এদিকে প্রায়ই বন্যা হয়। অজয়, ময়ূরাক্ষীর বাড়তি, বাঁধভাঙ্গা জলরাশি

ঠেলে আসে, বহু গ্রাম ডুবে যায়। অবনী তখন দলবল নিয়ে বন্যাত্রাণে বের হয়।

অবনী বাড়িতে জমিজায়গা অন্য ব্যবসাপত্র দেখলেও ও নাকি দেশের মানুষের কথা ভাবে। তখন থেকেই পঞ্চায়েতের মেম্বার।

তাই বন্যাত্রাণের কাজও দেখে। সরকারী, বেসরকারি সাহায্য যা আসে তার থেকে আগাম কিছুটা সরিয়ে রেখে তারপর ত্রাণের কাজে যায়। ক্রমশঃ তার পরিচিতি, জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এলাকায়। সহরের মাতব্বররাও তার কাছেই আসে। সরকারি অফিসার, থানা পুলিশও অবনীর খুব চেনা জানা।

ক্রমশঃ অবনী দেখেছে জমিদারী চলে গেল। তার পিতৃদেব অবশ্য তার আগেই মিত্র পরিবারকে ফাঁক করে দিয়েছে। তবে অবনীদের বেনামী মহাল গুলোও গেছে—তার আগে ওরা বিক্রী করে বেশ কিছু টাকাও পেয়েছিল।

অবনীবাবু বুঝেছে এবার ব্যবসা বাণিজ্যই করতে হবে। আর দেশের নেতা হতে পারলে জমিদারের শূন্য আসনটা সেইই পাবে। তাই দেশসেবার কাজেও বেশী মন দেয়।

এই সঙ্গে গ্রামের বাহিরে তাদের বিরাট একটা ডাঙ্গায় ধানকল গড়ে তোলার পরিকল্পনাই করে। সরকারও চায় দেশে কলকারখানা হোক- -লোকের কর্ম-সংস্থান হোক। তাই ধানকল চোর আর এদিকে চাষীবাষীর জায়গা। কোদাল, সাবল-গাইতি এসবের খুব চাহিদা। তাই একটা ওইসব লোহার জিনিস তৈরীর কারখানা ও চালু করতে চলেছে।

এইসব কারখানার ব্যাপারে শহরের শেঠ মুকুন্দ রামও আগ্রহী। সেই এগিয়ে আসে।

বলে--চৌধুরীজী হামি ভি সাথে আছি।

সেইই বুদ্ধি দেয়—ঘর সে পুরা রুপেয়া ভি দেনে নেহি হোগা।

—তাহলে টাকা আসবে কোত্থেকে ?

অবনীর কথায় ও বলে—আরে ব্যাংক আছে না ? ওদের কাছে লোন পাবে হামাদের কোম্পানী হামরা এককাঠা হয়ে কারখানা করবে রাইসমিল—অয়েল মিল বানাবে। রুপেয়া হম ব্যাংকসে ম্যানেজ করবে। ধরেন পঞ্চাশ লাখ। তবে উলোগকে খুশী করতে হবে।

তারপর সেই অভয় দেয়—উ হামি ম্যানেজ করিয়ে দিবে।

অবনী চৌধুরী দেখেছে তার পিতৃদেব কেমন ম্যানেজ করেই বিনা মূলধনে কত কিছু করেছে। এখন সেও দেশের সেবা করার সঙ্গে সঙ্গেই এখানের বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টাই সুরু করেছে।

ধানকল— লোহার কারখানাও চালু হয়েছে। কিছু লোকও কাজ পেয়েছে।

ফলে এবার এই এলাকার মধ্যে অবনীবাবুর জনপ্রিয়তাও বেড়েছে তাই পঞ্চায়েতের প্রধানের পদটা সে সহজেই পেয়ে যায়।

অবনী বলে—আমি কোন গদি চাই না হে, তাহলে তো এম-এল-এ হতাম।

কিন্তু ভক্ত চ্যালা চামুণ্ডারা জানে এটা ওর মুখের কথা। আর ওদেরও অবনীবাবুকে মাথার উপর রাখতেই হবে। তাই তারা বলে,

—আপনি না থাকলে আমরা যে অনাথ অবনীদা। আপনাকে থাকতেই হবে। জনসাধারণ তাই চায়।

—জনতার রায়! অবনী যেন মাথা পেতে নিতে বাধ্য! তাই বলে

—ঠিক আছে।

গত তিনটে টার্ম অবনী অঞ্চল প্রধান হয়ে আছে।

অবনীর স্ত্রী লক্ষ্মীও স্বামীর গরবে গরবিনী। সে বলে

—হ্যাঁগো, এত নাম ডাক তোমার, মন্ত্রী হওনা গো। তবু মন্ত্রীগিন্নী হবো। পেধান গিন্নী আর কতদিন হয়ে থাকবো।

অবনী জানে এম-এল-এ হলে এলাকা ছেড়ে কলকাতায় পড়ে থাকতে হবে।

আর নানা কায়দা কৌশল করে কামাবার ধান্ধা করতে হবে। এখন পঞ্চায়েতের আমদানীও ভালো। আর কলকাতায় যেতে হবে না। এই মাটিতেই সর্দারী করে নানা ধান্দা করে ব্যবসাপত্রের চক্কর চালিয়ে কামানো যাবে।

বরং হবু এম-এল-এ-রাই তার মুঠোয়। কারণ অবনী বিহনে এই এলাকার ভোট কেউই পাবে না। সে এখানের মুকুটহীন সম্রাট। তাই এখানে প্রধান হয়েই থাকতে চায়।

গিন্নীকে বলে—ওসব এম-এল-এ আমিই বানাই। এই বেশ আছি।

লক্ষ্মীর তবু মন ভরে না।

তার সংসারে এখন শ্বশুরমশায় বেঁচে নাই। ভূষণ চৌধুরী নিজেই দুহাতে রোজগার করেছে। সে ছেলের চারহাতে রোজগারটা দেখে যায় নি।

লক্ষ্মী বলে—মেয়ের পড়াশোনা গান বাজনা এ সব চালাতে হবে। শহরের বাড়িতে চলো।

অবনীর শহরেও ব্যবসা, বাড়ি আছে। তবে গ্রামেই থাকে।

বলে সে—গ্রামের স্কুল তো নাম করা, পড়ুক এখানে। আর গান বাজনা শেখাবার জন্য সহর থেকে মাস্টারই তো এখানে আসছে।

অবনীর মেয়ে লতিকা মায়ের মতই বেশ গোল সাইজেরই হয়ে উঠেছে লক্ষ্মীর চেহারা মোটার দিকেই। তবে লতিকা এখন ক্লাস নাইনে পড়ছে। কিন্তু এর মধ্যেই বেশ মোটা। আর বুদ্ধিটাও তেমনি মোটা—দেহের অনুপাতেই।

এখানের স্কুলের হেডমাস্টার নরেশবাবু এখানকারই ছেলে। ওর বাবা

ছিলেন স্বদেশী যুগের লোক। বেশ কয়েকবার জেলও খেটেছেন। ছেলেকে ও আদর্শবান করেই মানুষ করেছেন। অবশ্য নরেশও দারুণ কৃতিছাত্র। ইউনিভার্সিটিতেও নাম করেছিল। ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে পাশ করে গ্রামেই এসেছিল। বাবা বলতেন—যে মাটিতে তুমি জন্মেছ সেই মাটির প্রতি তোমার কিছু ঋণ আছে। সেই ঋণ শোধ করার চেষ্টা করো। এখানের ছেলেদের শিক্ষিত করার ব্রতই নাও।

তখন গ্রামে মিত্রবাবুরা স্কুল শুরু করেছেন। এর আগে এদিকে হাইস্কুল বলতে ছিল ওই মহকুমা শহরে। যাবার রাস্তাও তেমন ছিল না। কাঁচা ধূলি ধূসর সড়ক—তারপর অজয় নদী পার হয়ে আরও বেশ কিছু পথ গেলে তবে শহর। বর্ষায় সে পথ হতো দুর্গম।

তাই এখানেই স্কুল হতে এই এলাকার ছেলেদের মধ্যে পড়ার প্রবণতাও দেখা গেল। সেদিন নরেশ এসেছিল সহরের ভালো চাকরীর লোভ ছেড়ে এই গ্রামে।

নির্মলবাবু তখন স্কুল নিয়ে মেতেছেন। মাস্টারী করতেন বাইরে। তিনিও গ্রামের স্কুলে এসে স্কুলকে গড়ে তুললেন! ওই মিত্রবাবুদের জমিদারী চলে গেছে। বোর্ডিং এর জন্য জায়গার দরকার। সব জায়গার এখন মালিক হয়েছে ভূষণ চৌধুরী।

ও বলে—তিন বিঘে জমি দিতে হবে বোর্ডিং এর জন্যে? তিন বিঘেতে কত ধান হয় জানেন মাস্টার মশায়? বছরে কত আয়?

গ্রামের ভবতোষবাবু, নির্মলবাবু আরও অনেকে বলে,

—দূরের ছেলেরা থাকতে পারবে—

—তাতে আমার লাভ কি? ভূষণ মাটি ছাড়তে নারাজ।

অথচ ওই ডাঙ্গা জমি পড়েই থাকে। চাষও হয় না।

অবনী তখন এলাকায় পঞ্চায়েতের সভা হতে চায়। সেইই এই সুযোগটা নেয়। বাবাকে বলে কয়ে ওই জমি দান করে আর পায় নাকের বদলে নরুণ।

অর্থাৎ ওই জমি দানের সুবাদে সেবার ভোটে জিতে পঞ্চায়েতে ঢুকলো। সেখানে এখন বোর্ডিং গড়ে উঠেছে।

নির্মলবাবু নরেশের মত ছেলেকে পেয়ে খুশী হন। নিজের আদর্শে এক আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলেন তাকে। নির্মলবাবু রিটায়ার করেন। তখন সেই মাটির ঘরের স্কুলের চিহ্ন আর নাই, তাঁর চেষ্টায় এখানে বিশাল দোতলা স্কুল বিলডিং, বিজ্ঞান বিভাগ—কৃষি বিভাগ এসব গড়ে উঠেছে। ওদিকে উঠেছে বোর্ডিং, মাঝখানে একটা পুকুর। তার ধারে নানা গাছগাছালি বাঁধানো ঘাট। বাঁদিকে খেলার মাঠ।

নরেশবাবুও নির্মলবাবুর আদর্শে স্কুলকে গড়েছেন। ফলে এখন মেয়েরাও

পড়ে এখানে।

এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছেন।

অবশ্য অবনী প্রধান হিসাবে স্কুল কমিটিতে আছে। তার মেয়ে লতিকাও স্কুলে পড়ে।

অবনী বলে —নরেশ, আমার মেয়েটাকে তুমিই বাড়িতে এসে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও, অবশ্য তার জন্য তোমাকে মাসে শ-দুয়েক টাকা দেব।

নরেশবাবু টুইশানি করেন না। সকালে স্কুলে আসেন সারাদিন স্কুলের ক্লাশ নেন সাধারণ শিক্ষকের মতই। হেডমাস্টার বলে কম ক্লাশ নেন না।

বিকালে ছুটির পর অফিসের কাজ করেন। সন্ধ্যা হয়ে যায় বের হতে। তিনি বলেন—প্রাইভেট টুইশানি তো করি না।

একটু ক্ষুব্ধ হয় অবনী। বলে—তা জানি, তবে আমার মেয়েকে পড়াবে।

নরেশ জানে মেয়েটা গবেট। মাস্টাররা অবনীবাবুর মেয়ে বলে তাকে না জানিয়ে নম্বর বাড়িয়ে পাশ করায়। নরেশ বলে,

—আর কাউকে দেখুন।

অবনী চটে ওঠে। তবে রাগলে সেটা প্রকাশ করে না সে।

অবনী জানে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

শীতলবাবু স্কুলের থার্ড টিচার। কোনমতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে বি-এড করে স্কুলে ঢুকেছে অবনীর তদ্বিরে। অবশ্য তার জন্য শীতলবাবুকে হাজার পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়েছে অবনীকে। প্রকাশ্যে অবনী ওকে বলে,

—বিলডিং ফান্ডে ডোনেশন দিতে হবে।

টাকাটা শীতল ঘোষ জমি বেচে দিয়েছিল গোপনে অবনীবাবুকে।

আর অবনীর জোর তদ্বিরে স্কুলে ঢোকে শীতল। এখন ভালোই মাইনে পায় সে স্কুলে।

এছাড়া অবনীর লোক। শীতল স্কুলের টিচার বলে প্রচুর টুইশানি করে। বাইরের বাড়িতে সকাল থেকে দশটা অবধি আর বিকালেও চারটে থেকে ন'টা অবধি দুই শিফ্‌টে সে ডজন কয়েক ছেলেকে পড়ায়। আর ওই প্রণামী দেওয়া পঞ্চাশ হাজার এখন দ্বিগুণ হয়ে তার ঘরে উঠে গেছে স্রেফ টুইশানি থেকেই। আর স্কুলের মোটা মাইনেটা এখন ব্যাঙ্কেই যায়।

এবার বার বাড়ির তিনখানা ঘরে সে কোচিং ক্লাশ খুলেছে।

স্কুলের আরও তিন-চারটে সাবজেক্টের শিক্ষকদের সেই লাগিয়েছে ওখানে। ফলে ছাত্ররা স্কুলের প্রায় সব বিষয়ের শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসে। কোশ্চেনও সব বিষয়ের কিছু আগাম জানতে পারে সাজেশন-এর নামে। তারা স্কুলের পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়।

তাই শীতলবাবুর কোচিং স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে।

এনিয়ে নরেশবাবুও তাদের বলেন।

—এই সব ঠিক নয় শীতলবাবু। সরকার এখন শিক্ষকদের যা মাইনে দেন সেটা এর আগে ছিল কল্পনার বাইরে। সেই দিন অল্প মাইনে পেয়েও যে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা শিক্ষকতা করে গেছেন, আজ তার বহুগুণ মাইনে পেয়েও সামান্য কি নিষ্ঠার সঙ্গে স্কুলে পড়াবেন না ?

শীতল নরেশবাবুকে সমীহ করে সামনে। বলে সে,

—পড়াই তো। স্কুলে ক্লাশ নিই।

—কিন্তু আপনার সাবজেক্টের ছাত্রদের রেজাল্ট মোটেই ভালো নয়। যারা আপনাদের কোচিং-এ পড়ে তাদের নাম্বারই দেখি ভালো। বাকী যারা স্কুলে পড়ে, মাইনে দিয়ে আপনার কোচিং-এ পড়তে পারে না, তারাই কি ফেল করবে ?

শীতল অবাক হয়। দেখে নরেশবাবু এর মধ্যে ছেলেদের নাম্বার বের করেছেন—কে কে তার কোচিং-এ পড়ে যায় তাদের নাম, নম্বরও।

নরেশ বলে—একটু মন দিয়ে স্কুলের ডিউটি করুন।

শীতল কেন তার দলের মাস্টাররা তখন কোচিং-এর বাড়তি মধুর স্বাদ পেয়েছে। তারা সকলেই নরেশবাবুর উপর খুশী নন।

কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার সাধ্য নেই।

শীতলও খবর রাখে অবনীবাবু নরেশকে তার মেয়েকে পড়াবার জন্য বলেছে। কিন্তু নরেশ রাজী হয়নি।

এবার শীতলই মৌকা বুঝে গিয়ে হাজির হয়।

তখন লতিকার বিকট চীৎকার ভেসে আসছে বাড়ির ভিতর থেকে।

—সা- আ—আ—রে—এ—এ--এ।

অর্থাৎ তখন মেয়েকে সঙ্গীতনিপুণা করার জন্য সহর থেকে কোন এক গাইয়ে এসেছে। গান তো নয়, লতিকার ওই বিশাল দেহ থেকে একটা আর্তনাদ বিকট স্বরে উঠছে।

শশী মাস্টারও বাবরি চুল নেড়ে গেয়ে চলেছে—সা—রে গা—

আর তার তিনগুণ জোর ভল্যমে ছাত্রী পাড়া মাথায় করে বেসুরো চীৎকার করে চলেছে।

লক্ষ্মী মেয়ের ওই বায়স কণ্ঠের চীৎকার শুনেমাথা নাড়ায়।

—আহা! কি মিঠে গলা মেয়ের!

মাস্টার বলে—দেখবেন তালিম দিয়ে একেবারে আশা ভোঁসলে বানিয়ে দেব।

সেই সুরের পরশ লেগেছে অবনীকেও।

ঘরে বসে মাথা নাড়ছে! শীতলকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—এসো মাস্টার।

শীতল বলে—লতু গাইছে। না?

ও জানে কি করে তৈল মর্দন করতে হয়। অবনী বলে,

—হ্যাঁ। সহরের শশী ওস্তাদ এসেছে তালিম দিতে। কেমন শুনছো?

শীতল বলে—একেবারে যেন মধু ঝরছে। আহা—কি গলা!

তখন বিকট সুরে লতিকা 'পা' ধরে টানতে শুরু করেছে।

শীতল বলে—গুণবতী, সুগায়িকা—বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের লতু।

অবনী বলে—নরেশকে ওকে পড়াতে বললাম. এড়িয়ে গেল।

শীতল বলে—ওর, কথা ছাড়ুন তো। ভারি বিদ্বেন। তা লতুকে পড়ানোর জন্য আমি তো আছি।

অবনী বলে তোমার আবার কোচিং ক্লাশ—

হাসে শীতল—ওসব ম্যাস্টর রেখেছি তারাই সামলে নেবে।

লতুকে আমিই এসে পড়াবো।

—তাহলে তো ভালোই হয় হে। শ দেড়েক—

শীতল শুনেছিল নরেশকে দুশো টাকা বলেছিল তার বেলায় এক ধাক্কায় পঞ্চাশ টাকা কম! তবু জানে শীতল পেটে খেলে পিঠে সয়। তাই বলে—আপনার দয়াতেই করে খাচ্ছি অবনীবাবু। আপনার সঙ্গে টাকার সম্পর্ক তো নয়।

অবনী বলে—ধরো মিষ্টি খাবার জন্য দিচ্ছি।

—আপনি বললে তো না করতে পারি না। তাহলে কাল থেকেই সকালে আসছি। আপনি ভাববেন না। স্কুলের পরীক্ষায় মা আটকাবে না। তবে জানে শীতল তার ছাত্ররা গিয়ে ডিগবাজী খায় স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারীতে। এখানের স্কুলে যে কৌশলে তার মেষপালকে স্কুলের বেড়া টপকাতে সাহায্য করে সেই কৌশলটা সেখানে খাটে না।

তবে তখন কে ফেল করলো কে পাশ করলো এসব বদনাম চাপিয়ে দেয় স্কুলের উপরই।

অবনীর অনেক ধান্ধা। তাই বলে।

—আজ উঠি শীতল। আবার নার্সিং হোমে যেতে হবে।

এসব চিকিৎসার ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি। সারা এলাকার মানুষের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। তাই তাদের চিকিৎসার জন্য এটা করেছি।

শীতল বলে—নির্মলবাবু, রিটায়ার্ড জজ ওই ভবতোষবাবু, সুধীনবাবু আরও আশপাশের গ্রামের লোকজন সরকারী হাসপাতাল গড়ছে। আপনিও রয়েছেন।

অবনী ওই সরকারী হাসপাতালের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়। বলে,

—সরকারী হাসপাতাল! ছাড়ো তো—সরকারের আঠারো মাসে বছর। তাই

নিজেই একরাশ টাকা খরচা করে ওই শেঠ মুকুন্দরামের পাল্লায় পড়ে এখানে বিশাল বাড়ি বানিয়ে যন্ত্রপাতি, সহরের ডাক্তারদের এনে নার্সিং হোম বানালাম। তবু দেশের লোকের উপকার তো হচ্ছে—

শীতল জানে ওর নার্সিং হোমের ব্যবসা এখন রমরমিয়ে চলছে। আর ওখানে গেলেই মানুষ যে হাজার খানেক টাকা ওর পিছনে গচ্ছা দিয়ে আসে তাও জানে।

তার স্ত্রীর প্রসবের সময় নার্সিং হোমেই পাঠিয়েছিল। আগে গ্রামের ধাইরাই প্রসব করাতো। বিশ পঁচিশ টাকাতেই কাজ হতো। একখানা নতুন কাপড় পেলে আশীর্বাদ করতো তারা।

নার্সিং হোমে প্রসব হতে গিয়ে পাকা ঘর-পাখা প্রসবের মাশুল বাবদ তিন দিনে হাজার বারোশ টাকা দিয়ে এসেছে শীতল।

শীতল ঘোষ বলে—এখন সারা এলাকার মানুষের হাতে টাকা হয়েছে। তাই তারা সুচিকিৎসার জন্য নার্সিং হোমেই আসে।

কারণ এলাকায় কোন ডাক্তার নেই। এলেও যে কোন কারণেই হোক টিকতে পারে না। তারা পালায় আর অবনীবাবুর নার্সিং হোমেই ভিড় করে রোগীরা।

অবনী চৌধুরীকে মতলবটা ওই শেঠ মুকুন্দরামই দিয়েছিল। ওর ব্যবসার মাথা খুবই সাফ।

এখন ধানকল, লোহার কারখানা বেশ ভালোই চলছে। শেঠ মুকুন্দরামের ছেলে গিরিধারীকে শেঠ কৌশল করে দিল্লীতে রিস্তাদারদের ধরে করে হরিয়ানার কোন কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করিয়ে এনেছে।

সহরে চেম্বার করে দেয়। কিন্তু গিরিধারীর সেখানে পশার জমে না। কারণ সহরে হাসপাতাল আছে ভালো। এ ছাড়া অনেক নামী ডাক্তার আছে। তাদের মধ্যে গিরিধারী তেমন পশার করতে পারে না। এমনিতে ঠেলেঠুলে বিশেষ কোটায় পাশ করা ডাক্তার। বাবার জোরে এই অবধি এগিয়েছে।

এবার মুকুন্দরামই বলে অবনীকে,

—এখানে একঠো নার্সিং হোম খুলেন। আধা রুপেয়া হামি দেব। আধা আপনে। হাসপাতাল ডাকদার নাই। বহুৎ পেশেন্ট আসবে। বেলাড টেস্ট সব টেস্ট ভি করাবে। সহরে করবে—আমাদের নাম থাকবে। এক্স রে ভি বসাবে। দেখবেন ক্যা ফ্যায়দা।

—নার্সিং হোম। কত লাভ হবে? অবনী শুধোয়। মুকুন্দরাম ভারতের নানা ঘাটের খবর রাখে। বলে সে—

—আরে টাটা বিড়লা হিন্দুজা এত বড় বড় কোম্পানী তবে কেন করছে অবনীবাবু? নাফা! নাফা ই কারবারে।

অবনীবাবু বলে—ডাক্তার নার্স ?

—আরে ভাত ছড়াবেন কাউয়া আসবে না ? বহুৎ আসবে। উসব হামার উপর ছোড়িয়ে দেন। ওই হাটতলার পিছনে হাপনার জমিন আছে। উখানে পুকুরের ধারে বটগাছভি আছে। ব্যস—ফাসকেলাস লোকেশান। একদম বড় রাস্তার নজদিক—উখানে বিলডিং বানিয়ে দিন—হামি সব বন্দোবস্ত করিয়ে দিবে। আর ওই গিরিধারী তো বহুৎ নামী ডাকদার হয়েসে, ওই সব দেখ ভাল করবে। আউর শহর থেকে ভি পয়সা পেলে অনা ডাক্তাররা আসবে হপ্তামে দো তিন রোজ করে।

অবনীর তখন কাঁচা টানা আমদানীও ভালোই হচ্ছে।

প্রধান সে। অঞ্চলে আসে লক্ষলক্ষ টাকা। তার কারখানার—ধানকলের আমদানীও কম নয়। ফলে নার্সিং হোমের ব্যবসা ভালোই লাগে।

বিলডিং হয়ে যায়।

এদিকে গ্রামের লোক, সারা অঞ্চলের লোক সরকারের কাছে দাবী জানায়, এই অঞ্চলে গ্রামীন হাসপাতাল করতে হবে।

মন্ত্রীদের কাছেও দরবার করে এবার স্যাংশেন করিয়ে আনেন ভবতোষবাবু কলকাতা থেকে।

এককালে জেলা জজ ছিলেন। ছেলেরাও কলকাতায় বেশ নাম করেছে। তার চেষ্টাতেই গ্রামীণ হাসপাতাল অনুমোদন পায়।

তখন অবনীবাবুদের নার্সিং হোম এর উদ্বোধন হচ্ছে ঘটা করে। সহর থেকে নেতারা—দু চারজন সরকারী অফিসারও এসেছে। লতিকাই বিপুল দেহ নিয়ে তাদের চন্দনের টিপ পরিয়ে বরণ করে।

উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনা করেছে শীতল মাস্টার।

শশী ওস্তাদের তালিম নিয়ে লতিকা গাইল গান। তারপর জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য দরদ-মানবিকতা-সেবা এই সব দিয়ে অবনী দারুণ লেকচারও দেয়।

শেঠ মুকুন্দরাম সপুত্র উপস্থিত। এর মধ্যে সহরের দু তিন জন ডাক্তারকেও সে ফিট করেছে। তারাও বেশ মোটা টাকার বিনিময়ে এখানে সপ্তাহে দু তিন দিন এসে চিকিৎসা করবেন।

মহাসমারোহে নার্সিং হোমের উদ্বোধন হয়ে গেল। আর রোগীদের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। সেই মহকুমা শহরে না গিয়েই কাছাকাছি তবু চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছে, লোকজনও এখানে আসতে শুরু করলো।

গিরিধারী ডাক্তার বেশ জমিয়ে ফেলেছে নার্সিং হোম। এখন অবনীর মনে হয়, শেঠজী ঠিকই বলেছিল, অসুস্থ মানুষকে মোচড় দিতে পারলে মানুষ তিনগুণ টাকাই বের করে রোগযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। ওরা তাই

শুরু করেছে।

এখন ব্লাড টেস্ট ইউরিন টেস্ট এক্সরে-এসবই প্রয়োজন না থাকলেও করিয়ে বেশ ভালোই রোজগার হচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ এখানে সরকারী হাসপাতাল হবার অনুমোদন আসাতে এবার বিপদে পড়ে অবনী। শেঠজীও বলে

—ইসব ঝামেলা হঠাও অবনীজী। সরকারী হাসপাতাল ইখানে হলে আর কোই পয়সা খর্চা করে নার্সিং হোমে আসবে? কাম ধান্ধা চৌপট হয়ে যাবে।

অবনীও বিপদে পড়েছে। সে এখানের জনপ্রতিনিধি, অঞ্চল প্রধান। প্রকাশ্যে সে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকারের এই হাসপাতাল প্রকল্পের প্রতিবাদ করতে পারে না।

বরং ওই ভবতোষবাবুদের সঙ্গে সেও হাসপাতাল কমিটিতে আছে। ভবতোষবাবু, নরেশবাবু, নির্মলবাবু আশপাশের গ্রামের বহু নামীদামী মানুষ হাটতলায় প্রকাশ্য জনসভা করেছে। অবনীবাবুও সেখানে ছিল, থাকতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

সেও এই প্রকল্পকে রূপায়িত করার জন্য সবরকম সহযোগিতা করবে তা স্বীকার করে। তুমুল হাততালি দিয়ে শ্রোতারাও তাকে অভিনন্দিত করেছে এবং চাঁদা দেবার সময় দেখেছে অবনী উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর মানুষই অকাতরে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য দিয়েছে। গরীব, দিন মজুররা হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরীর কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে বাড়ি—কোয়ার্টার তৈরীর কাজ করেছে। অবশ্য জায়গাটা দিয়েছেন ভবতোষবাবু আর নির্মলবাবু এরা দুজনে।

দুজনের পাশাপাশি বিঘে চারেক ডাঙ্গা কিছু পড়া জমি ছিল গ্রামের একটু ওপাশে। সেখানেই হাসপাতাল গড়ে উঠছে।

অবশ্য এরা চেয়েছিল অবনীবাবুর কাছে কিছু জায়গা গ্রামের লাগোয়া, রাস্তার ধারেই হতে পারতো হাসপাতাল। কিন্তু অবনী সেটা আইনের ফাঁকড়া তুলে দেয় নি। বলে,

—ও জমির পড়চাও ঠিক নাই। পরে যদি গোলমাল হয়।

অর্থাৎ এড়িয়েই যেতে চায় সে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেশবাবু বলেন.

-- হাসপাতাল গড়ে উঠলে আর কেউ বাধা দেবে না।

অবনিই বলে—যদি আপত্তি দেয় সব কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমার সমন্ধীর জায়গা ওটা সে যদি আপত্তি করে তাই বলছি।

—তাহলে কি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরও হাসপাতাল হবে না?

নরেশবাবুর কথায় অবনীবাবু বলে,

—হবে না কেন?

ভবতোষবাবুই বলেন—নির্মলদা হাটের ওদিকে আপনার আমার পাশাপাশি জমি আছে।

—রাস্তা থেকে একটু দূরে হবে যে।

ভবতোষবাবু বলে—ওটুকু রাস্তা করে নেব।

গ্রামের জনতাও বলে—ওই রাস্তা আমরা সাতদিনের মধ্যে করে দিচ্ছি বাবু কিছু ঝামা ইট দ্যান আর একটা রোলার আনিয়ে দ্যান, বাকী কাজ আমরা করে দোব। রাস্তা হয়ে যাবে।

অবনী প্রথমে প্রকারান্তরে বাধা দেবার চেষ্টাই করেছিল জায়গা না দিয়ে। ভেবেছিল জায়গার অভাবেই হাসপাতালের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এখনই। তারপর জায়গা খোঁজা নিয়ে নানা টালবাহানা করে সরকারী লাল ফিতের ফাঁসে হাসপাতালকে কবর দেওয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ এইখানে এই মুহূর্তে ওইভাবে জায়গার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবেনি অবনীবাবু।

বাধ্য হয়েই সে বলে।

—তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

নরেশবাবু বলেন—সব সমস্যার সমাধান করতেই হবে।

হাসপাতালের বাড়ি তৈরীর কাজও সুরু হবে।

এবার অবনী আর এক চাল চালার চেষ্টা করে। সে সদরে জানায়—গ্রামীণ হেলথসেন্টার তৈরী হবার টাকা অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই দেওয়া হোক।

বুদ্ধিটা গোপেনই দেয়।

গোপেন অবনীর খুড়তুতো ভাই। গোপেন গ্রামের হাটতলায় চা পানবিড়ির দোকান করতো, আর গ্রামের লোকদের মধ্যে নানা ভাবে জমি, বসতবাটির বাটোয়ারা, তুচ্ছ নানা কারণে ঝগড়া হলে শাসালো যে পক্ষ তার দিকে ঝুঁকে তাকে প্ররোচিত করে সেই ঝগড়া কোর্ট কাছারি অবধি নিয়ে যেতো।

বলতো—ওসব আদালতের ঝামেলা আমি সামাল দেব।

এইভাবে অপমান সইবে ?

মামলা শুরু হতো। গোপেন তাদের পয়সায় মামলা তদ্বির করার নামে সদরে যেতো। নানাভাবে কিছু টাকা রোজগার করতো আর সন্ধ্যায় হাটতলার ওদিকে দলবল নিয়ে বসে ধেনো মদ গিলতো, মেয়েদের দিকেও তার নজর দোষ ছিল।

অবনী প্রধান হবার পর অঞ্চল পঞ্চায়েতের একটা কাজে ওকে বসিয়ে দিল। গোপেন ক্রমশঃ ওইসব টাউট গিরি ছেড়ে এবার অঞ্চলের মানুষদের সেবার কাজে মন দিল।

ক্রমশঃ বুঝতে পারলো তার অবনীদা তাকে সোনার খনির সন্ধানই দিয়েছে। তবে এই সোনার খনি থেকে সংগৃহীত সোনার বেশীর ভাগ দাদাই খান—তবে তার জন্য ছিটে ফোঁটা যা থাকে সেটাও কম নয়।

তাছাড়া সারা অঞ্চলের লোক এখন তার কাছে আসে। গোপেন চাওয়ালা এখন পরিচিত হয়েছে গোপেনদা না হয় গোপেনবাবু নামে।

অবশ্য হাটতলার চায়ের দোকানটা আছে। তবে এখন তারও ছন্নছাড়া হাল বদলেছে। সানমাইকার টেবিল চেয়ার ঝকঝকে আলো দিয়ে সাজানো সহরের ধারে রেস্তোরাঁই করেছে সে। চপ কাটলেট, চাও চিকেন, চিলি চিকেন। এসব মেলে আর মেলে বিলাতিমদও—অবশ্য গোপনে। তারজন্য থানার বাবুদেরও নিয়মিত ভেট পাঠায় গোপেন।

সেই গোপেনই বলে কথাটা।

—অবনীদা, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, আউটডোর এসব তৈরী করতে ভালো টাকাই আসছে। কয়েক লাখ টাকা। বিলডিং তৈরীর কাজটা আমিই করতে পারি কনট্রাক্ট পেলে --অবশ্য তোমারও।

বাকীটা বলতে হয় না। অবনীবাবু 'ক্যাচ' করে নেয়। বলে সে — ঠিকেদারির কাজ, তাতো করতেই হবে একজনকে।

—তুমিই প্রধান। অঞ্চলের কাজ। তাই যদি এটা হাতে আসতো। অবনীও জানে টাকাটা হাতে এলে অন্যখাতে খর্চা করে হাসপাতাল তৈরীর কাজ বিলম্বিত করা যাবে।

একটা আর্থিক বছর কোনমতে পার করে দিতে পারলে ওই টাকার আবার স্যাংশন আনতে হবে, সরকারী ফাইলটা তখন সদরের অফিসে লোপাট করে দিতে পারলে হাসপাতাল প্রকল্পও বিশ বাও জলেই চলে যাবে।

তাই কাজটা হাতে আসার জন্যই সদরে ওইভাবে দাবী জানায় অঞ্চল প্রধান। কাজটা অঞ্চল থেকেই করানো হোক।

কিন্তু ভবতোষবাবু নির্মলবাবুরা এটা করিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর অর্থমন্ত্রীকে ধরে। কাজটা স্বাস্থ্যবিভাগ থেকেই ওই হাসপাতাল কমিটির মাধ্যমেই করানো হবে। সরকারীভাবে জানানো হয় অঞ্চল প্রধানকে সেই কথা।

সবশুনে গোপেন বলে –তাহলে কাজটা ওই কমিটিই করবে।

অবনীও হতাশ হয়। বলে—তাইতো লিখেছেন ডি. এম.সাহেব। তাহলে হাসপাতাল হবেই।

এই হাসপাতাল হওয়া নিয়েই সারা অঞ্চলে একটা যেন প্রতিবাদ গুঞ্জরিত হয়। গোঁসাইগঞ্জের চারিপাশে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মানুষ এতকাল রোগে ভুগেছে। তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গতি আছে তারা শহরের ডাক্তারের কাছে গেছে! আর অন্যদের ভরসা করতে হয়েছে এখানে হাতুড়ে ডাক্তার নিবারণবাবু, গণেশবাবুর উপর। ওদের কেউ কোন ডাক্তারের কাছে কিছুদিন কমপাউন্ডারি করে গাঁয়ে এসে নিজেই ডাক্তার সেজে বসেছে। ওষুধ কিছু দেয়, আর কারণ

অকারণে ইনজেকশন দিয়েও কিছু পয়সা আদায় করে, তাতে যার সারবার সারে, না হয় সরে যায় নিজে থেকেই।

এছাড়া ওদিকে দু'একজন কবরেজও আছে, তাদের মধ্যে বদ্যিনাথ কবরেজের নাম ডাকই বেশী, আর আছে ওই গগন হোমিওপ্যাথ। ওদের কাছেই লোকে আসে।

আর আছে কিছু দাই মহিলা। তাদের শিক্ষা কি আছে কেউ জানে না। তবু প্রসবের সময় তারাই ভরসা।

এবার তাদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়ে। গোপেনই কথাটা ক্রমশঃ ওঠায়। সেদিন নিবারণ ডাক্তারের ওখানে বসে আছে। এদিক ওদিককার গা থেকে কিছু লোকজনও আছে বসে। গোপেন বলে—তোমাদের ভাত উঠলো ডাক্তার।

নিবারণ বলে—কেন?

—আর কেন তা বুঝছ না? ওই সরকারী হাসপাতাল হলে পাশ করা ডাক্তার পাবে বিনি পয়সায়, তোমাদের মত হাতুড়ে পার্টির কাছে আর কেউ আসবে? সেখানে ওষুধও পাবে ফিরিতে। তোমার ওই তিনগুণ দামের ওষুধ কেউ কিনবে?

কথাটা নিবারণের মনে ধরে।

- তাইতো হে!

নন্দ ডাক্তারও বলে -এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার।

নার্সিং হোমে যায় বড়লোকেরা, গ্রামের সাধারণ মানুষ আসে আমাদের কাছে। তারাই তো আসবে না।

গগন ডাক্তার হোমিওপ্যাথি করে। গোপেন তাকে কথাটা বলতে গগন বলে,

—ওহে গোপেন, এর নাম হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথির আসুরিক চিকিৎসা নয়। যারা এতে বিশ্বাস করে তারা জানে হোমিওপ্যাথির যাদুর খবর। তারা ও পথে যাবে না।

গগন ওকে উড়িয়েই দেয়।

কিন্তু অন্য ডাক্তারদের মনে ভয় হয়। আর গোপেন গ্রামের অশিক্ষিত দাইমহলেও বলে—তোদের ভাত উঠলো রে কমলার মা।

—কেনে গো? কমলার মা গাঁয়ের নামকরা দাই।

গোপেন বলে—হাসপাতালে যাবে প্রসব হতে এবার, গাঁয়ে যে সরকারী হাসপাতাল হচ্ছে।

দাইমহলেও গুঞ্জরণ শুরু হয়।

ওদিকে সারা দেশে তখন আবার নির্মূল হয়ে যাওয়া ম্যালেরিয়া ফিরে আসছে। এতদিন ওই ম্যালেরিয়া ছিল না। ছিল আগে গ্রামে মহামারী রূপেই ছিল।

গ্রাম শুদ্ধ লোক বেলা বারোটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বিছানা নিত। লেপ কাঁথা চাপা দিয়ে হি হি করে কাঁপতো, আবার বৈকাল চারটে পাঁচটা নাগাদ গলগল করে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তো। এটা ছিল নিত্যকার ব্যাপার।

ক্রমশঃ পিলেটা বড় হতো—হাত পা লিক লিকে হয়ে আসতো। তারপর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত, সর্বাঙ্গ হলুদ হয়ে যেতো।

সেই ম্যালেরিয়া দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল! কিন্তু আবার ফিরে আসছে। আর রোগীদের ভিড়ও জমছে ওই নিবারণ, গণেশ ডাক্তারদের ওখানে।

তারা বলে—সরকারী ডাক্তারখানা হচ্ছে—সেখানেই তো যাবি এবার।

—রোগীরা বলে—বাঁচাও গো বাবু।

বদ্যিনাথ কবরেজের সময় নাই। তার ভাই গৌর এখন নিমছাল, শিউলিপাতা অর্জুনছাল কণ্টিকারী তুলে শেষ করতে পারে না। আরও সব শিকড়—লতাপাতা শুকিয়ে ঢেঁকিতে কুটে হামানদিস্তায় পাউডার করে গুলি তৈরি করছে।

আর গগন ডাক্তার বলে—তিন পুরিয়া করে রোজ আমার ওষুধ খাও রাত্রে।

যাদের পয়সা আছে তারা হাজির হচ্ছে ওই অবনী শেঠজীর নার্সিং হোমে। সেখানে রক্ত, ইউরিন পরীক্ষা হচ্ছে মোটা টাকায়। তারপর ওষুধের দামও আলাদা। বেডে থাকো দিনে আড়াই শো টাকা—রাত্তিরে হলে অন্ততঃ দুশো। সব মিলিয়ে দিনে শ চার পাঁচ তো বটেই।

তাতেই জায়গা দিতে পারছে না।

পাশের গাঁ সংগ্রামপুরের অতুল বেশ তরতাজা যোয়ান।

বাপের বেশ কিছু গাই গরু আছে। ইদানীং সহরের লোক আসে গাড়িতে করে তার এখান থেকে দুধ নিয়ে যেতে।

অতুলের বাবার স্বপ্ন অতুল এই ব্যবসাকে আরও বড় করুক। অতুলের ওসব দিকে ঝোঁক নাই। সে প্রায় নরেশবাবুর কাছে আসে। স্কুলে ক্লাশ এইট অবধি পড়েছে। তারপর ওর বাবা ওকে ব্যবসার কাজে লাগাতে চায়।

অতুল এর মধ্যে অনেক বইই পড়েছে। রামায়ণ, মহাভারত—মায় শরৎচন্দ্রের বইও। রবিঠাকুরের বেশ কিছু কবিতাও তার মুখস্থ। তারও ইচ্ছা হয় তক্ষুণি কথার পর কথা সাজিয়ে সে কবিতা লিখবে। দুচারটে কবিতাও লিখেছে।

নরেশবাবু বলেন—স্কুলে না পড়িস বাড়িতে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই পড় অতুল। শিক্ষার তো শেষ নাই। জীবনের পাঠশালেই শিক্ষা নে।

অতুল ওই হাসপাতাল তৈরীর জন্যও মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। ভবতোষবাবুর কমিটিও গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাঁদা এনে জমা দিয়েছে।

দেখেছে অবনীবাবুদের নীরব অসহযোগিতা। তার কথাতেই গোপেন পাঁজার হালুড়ে ডাক্তার-কবরেজদের ও বিরুদ্ধ মনোভাবের করে তুলতে চায়।

অতুল গান বাঁধে—

দেশেতে আইছে কি এক মালোয়ারি ॥
হায় মেনেছে নিবারণ
শুড়ে তুলেছে গজানন ॥
ভাবছে এবার কি করি ॥
ডেকে যদি কবরেজ কয়
গোর করিস নারে ভয়।
গুড়ুরবাদের ভাইসাহেবেরা বজায় থাকলে হয়।
টাকায় তিনগণ্ডা বড়ি—
ভাঙবো ডাক্তারের জারিজুরি।
হোমিও গগন ঠাকুর কয়
আমার ওষুধ কথা কয়,
দেখতে গুলি—নামেও গুলি, কাজেও বলিহারী॥

সেদিন ধর্মরাজ পুজোর আসরে সং-এর মাঝে অতুলের ওই নৃত্যসহকারে গান শুনে গাঁয়ের মেয়েমন্দ সবাই হেসে কুটি কুটি হয়।

নরেশবাবু বলেন—তুই বেঁধেছিস এই গান ?

অতুল হাসে। ভবতোষবাবু বলেন,

—এবার হাসপাতালের দরকার নিয়েই গান বাঁধ অতুল।

মানুষের সুখ দুখের কথা বল। খাসা হয়েছে।

অবনী চৌধুরী আড়ালে বলে।

—আজে বাজে লোকদের মাথায় তুলছে। পরে বুঝবে মজা।

গগন হোমিও অবশ্য প্রথমে চটে উঠে চীৎকার করে।

—হোমিওপ্যাথী নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে? মহাত্মা হ্যানিম্যানকে নিয়ে রসিকতা! অ্যা অতুল—

বদি কবরেজই বলে—আঃ থামো না। তোমার মহাত্মা হ্যানিম্যান তো দু তিনশো বছরের শিশু, আমাদের মহর্ষি চরক। তিনিতো বেদ পুরাণের আমলের।

গগন বলে—বয়স বেশী হলেই জ্ঞানে বড় হতে হবে, তাহলে ওই তালগাছ তো একশো বছরের। তোমার থেকেও ও জ্ঞানী বলছ? মহাত্মা হ্যানিম্যান—

গগন প্রাণ থাকতে হোমিওপ্যাথীর নিন্দে সহ্য করবে না।

ওদিকে গ্রামের মেয়ে বৌদের মধ্যে ছিল গগনের মেয়ে চন্দনা। সেও দেখছে বাবার ওই বাতিক। ওই হাসির আসরে হঠাৎ বাবাকে চটে উঠতে দেখে তারও

বিশ্রী লাগে।

মেয়েদের মধ্যে থেকে কে বলে—দুর্বাশা চটে গেছে রে। শাপ অন্যি না দিয়ে বসে।

অবনী চৌধুরীর বৌও এসেছিল মেয়েকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে। তারাও তামাসা দেখছে। বলে অবনী চৌধুরীর গিন্নী লক্ষ্মী।

- মরণ! মিন্সে যেন ক্ষেপে গেছে। চল লতু।

কথাগুলো শোনে চন্দনা।

সেও স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছে এবার। বাবার উপর চটে ওঠে।

আবার অন্য সং শুরু হয়। প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়।

অবনী চৌধুরীও ছিল আসরে। সে দেখছে গ্রামের মধ্যে এতকাল তারই প্রাধান্য ছিল। আজকের আসরে লোকজন ম্যালেরিয়া, হাসপাতাল-এর দরকার এই সব নিয়ে গান বেঁধেছে। মায় ইস্কুলের পড়ানো, মাস্টারদের ইস্কুলের মাইনে নিয়ে কোচিং ক্লাশ চালানো এসবও সং-এর মধ্যে এসেছে।

অতুল-এর শেষ সংটা নিয়েই অবনী চটে ওঠে।

পঞ্চায়েত রাজত্বের রাজা যেন সিংহাসনে বসে আছে। আর পাত্র মিত্ররাও আছে। সেখানে জনসাধারণের ভালোর জন্য নানা কাজের জন্য টাকা আসছে। কৃষিঋণ দেবার নামে মিথ্যা টিপ ছাপ দিয়ে অন্যদের ঋণ দেবার নামে রাজা মশাই তা নিয়ে নিচ্ছেন।

সাঁকো করা হয়েছে দেখানো হলো—তার জন্য দশ লাখ টাকা খরচাও দেখানো হলো, আবার পরের বার বন্যায় তা ধুয়ে মুছে গেছে বলেও দেখিয়ে কোন কাজ না করেই দশ লাখ টাকা চলে গেল।

অতুল এবার ঠিক খবর বের করে গান বেঁধেছে। আর ঢোলের তালে তালে কোমর দুলিয়ে নেচে নেচে যেন অবনীবাবুকেই দেখাতে চায়।

লোকজনও খুব উপভোগ করে তার সং। কেউ বলে—খুরে ফিরে ভাই। খুরে ফিরে।

অতুল মেজাজ নিয়ে গাইছে। অবনী চটে গেছে। এ তাকেই ইঙ্গিত করছে। এমনি সাঁকো তৈরীর নাটক হয়েছিল তারই এলাকায় ব্রহ্মাণী নদীর উপর।

গোপেনও চটে ওঠে। এসব তারই কীর্তি।

অন্ধকার নামছে। হেসাকের আলোটুকু পড়ছে আসরে, চারিদিকে আবছা অন্ধকার। অতুল গাইছে, হঠাৎ অন্ধকারে একটা আধলা ইট এসে ওর মাথাতেই লাগে। বেশ জোরে নিখুঁত লক্ষ্যেই ছোঁড়া হয়েছে ইটটা, অতুল কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ে, রক্ত ঝরছে।

চারিদিকে কলরব ওঠে—কে! কে মেরেছে?

যে মেরেছে সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে তখনিই।

অবনীও বুঝেছে ব্যাপারটা। সেও বলে, এসব কি হচ্ছে?

গ্রামের মধ্যে রক্তারক্তি! কে করেছে এসব কাজ?

ততক্ষণে আসর ভেঙ্গে গেছে লোকের কলরবে।

নরেশবাবু বলেন—এই ইট অতুলকে মারা হয়নি, এটা মারা হয়েছে গ্রামের পঞ্চজনকেই। এর বিহিত করতে হবে।

সেদিন হঠাৎ অন্ধকারে একটা আধলা ইট গ্রামের শান্তির পরিবেশকেই সচকিত করে তুলেছিল।

ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে। অবনীবাবুই বলে এর তদন্ত করতে হবে। দোষীকে শাস্তি দিতেই হবে। এ গণতন্ত্রের যুগ। মানুষের নিজের মত করে কথা বলার অধিকারে বাধা দেওয়া যাবে না।

বেশ নিপুণভাবেই অভিনয় করে এল অবনী চৌধুরী।

আসলে গোপেনেরই কাজ এটা।

ওই অতুল ওদের এসব কীর্তিকলাপ জনসমক্ষে এমন রসিয়ে প্রচার করে দেবে এটা অবনীও চায়নি। তারই ইঙ্গিতে গোপেন অতুলের মুখ বন্ধ করার জনাই ওই কাজ করেছে।

ওইসব গোলমাল থামিয়ে অবনী বাড়ি ফেরে। তখন গোপেন চলে এসেছে। অবনী বলে,

—ওই ভাবে ইট মারলি?

গোপেন বলে—না হলে ব্যাটা গোয়ালার পো থামতো? তা এসব ভিতরের খবর বের হলো কি করে কাকা?

অবনীও তাই ভাবছে, তার আসল কীর্তি কাহিনীই এখনও গোপন আছে, সে গুলো যদি প্রকাশ পায় বিপদই হবে। তাই অবনী বলে,

—এবার সাবধান হ।

গোপেন বলে—তা না হয় হলাম, কিন্তু এসব খবর কে দেয় তা জানা দরকার। সরষের ভিতরেই যদি ভূত থাকে সর্বনাশ হবে।

চন্দনা বাড়ি ফিরেছে।

গগণ ডাক্তার তখনও ফেরেনি। আসর থেকে একবার চেম্বার গেছে। হাটতলায় তার একটা ঘর আছে। ময়লা রং ওঠা একটা সাইন বোর্ড কাৎ হয়ে ঝুলছে। বেশ অনুধাবন করলে পড়া যাবে—গ্রেট হ্যানিম্যান হোমিও হল।

ডাঃ গগনবিহারী ভট্টাচার্য তার পর কি অক্ষর গুলো উপাধি হিসাবে লেখা আছে বোঝা যায় না।

বড় করে লেখা আছে গোঁসাইগঞ্জ।

হল বলতে খড়ের চালার একখানা ঘর। সামনে দাওয়া। দাওয়ার একদিকে মাটি ফেলে উঁচু করা বেদী মত। তার উপর জীর্ণ কম্বলের আসন পাতা। এইটাই গগনের হোমিওপ্যাথীর পঞ্চমুণ্ডীর আসন। ওদিকে একটা টিউবওয়েল আছে। তারই জলে গগন তার হোমিওপ্যাথি ওষুধের দুচার ফোঁটা ঢেলে রোগীদের দেয়।

সন্ধ্যারপর হাটতলা কিছুটা শুনসান।

বড় রাস্তার দিকটাই এখন বেশী জম জমাট। ওদিকে বিরাট বাড়িতে ন্যার্সিং হোম! সেখানে নিওন দেওয়া সাইন বোর্ড। ডিসটেমপার করা ঘরে টিউব লাইট জ্বলে, দরজা জানলায় রঙ্গীণ পর্দা টাঙ্গানো।

তার তুলনায় হাটতলায় যেন সাবেকী গ্রাম্য ভাব—গাছগাছালির অন্ধকারই রয়েছে।

এরা যেন অতীতের অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে—আজকের সভ্যতার ঝলক লাগানো গোঁসাই গঞ্জের থেকে এরা দূরের বাসিন্দা।

বদিকবরেজের কবরেজ খানা ও গগনের ডাক্তার খানার ওদিকে।

গণেশ—নিবারণ বাসুদের ডাক্তারখানা হাটতলাতেই। এককালে এই হাটতলাই ছিল এখানের চৌরঙ্গী এলাকা।

কিন্তু বাসরাস্তাগুলো থেকে ওই দিকে রাস্তার ধারেই নতুন সহর জাঁকিয়ে বসেছে তার বিলাস বৈভব নিয়ে, এরা যেন আজ ব্রাত্য হয়ে গেছে।

তাই এরাও ভাবনায় পড়ে।

গ্রামে সরকারী হাসপাতাল হচ্ছে। রোগীরা ওখানেই যাবে। তাদের এখানে আর কেউ আসবে না।

গগন তাই নিয়ে ভাবনায় পড়েছে।

হ্যারিকেনটা কমানো। ডাক্তারখানা বন্ধ করে ফিরছে বাড়ির দিকে।

গগনের জীবনে স্বপ্নছিল অনেক।

সে বড় ডাক্তার হবে। তাই সহরের নামকরা হোমিওপ্যাথ শ্রীহরি ঘোষের ওখানেই ঢোকে। ঘোষ মশায় ওকে ভালো বাসতেন। বলতেন,

—বইপত্র যোগাড় করে পড়ো, মন দিয়ে পড়বে হোমিওপ্যাথির বই। সব ওষুধের নাম, গুণাগুণ জানতে হবে। আর রোগীর লক্ষণ মিলিয়ে তবে ওষুধ দেবে। একই ওষুধে বিভিন্ন লক্ষণে এখানে রোগ সারে। একেবারে রোগের মূল নির্মূল করতে পারে ঠিকমত ওষুধ প্রয়োগ হলে।

চাই সাধনা—মনসংযোগ আর মহাত্মা হ্যানিম্যানের আশীর্বাদ।

ক্রমশঃ গগনও শিখতে থাকে অনেক কিছুই। রোগী এলে ঘোষ মশায় দেখে শুনে গগনকে বলতেন।

—তুমি দ্যাখো, বলো কোন ওষুধ কত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

গগন দেখতো, ওষুধের নাম বললে কখনও ঘোষ মশায় বলতেন আবার দ্যাখো, রোগীর বাঁ দিকে ব্যাথা না ডাইনে ব্যাথা দ্যাখো, তারপর ভেবে চিন্তে বলো।

ঠিক হলে ঘোষ মশায় খুশী হতেন।

—নাঃ হবে তোমার।

তখনই বিয়ে করে গগন, ঘোষ মশায়ের এক বন্ধুর মেয়েকে।

এই গোঁসাইগঞ্জেই তার স্ত্রীর বাড়ি। শ্বশুর মশায়ের ছেলে পুলে ছিল না। একমাত্র মেয়ে। তাই এখানেই এসে বসবাস শুরু করে। হাটতলাতেই শ্বশুর মশায়ের ওই ঘর খানায় চেম্বার খোলে তার গুরু ঘোষ মশায়ও মারা যান। গগনের আর শেখা হয়নি তার কাছে।

তার বেশ কিছু প্রাচীন বই পত্তর সেঁইই আনে। আরও বইপত্র কিনে গগন এখনও পড়ছে।

তার খুব ইচ্ছা চন্দনাও হোমিওপ্যাথি শিখুক। ওর বুদ্ধি আছে পড়াশুনাতেও ভালো। ফাস্ট ডিভিশান-এ স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে।

গগন ওকে তার সর্ববিদ্যাই দিয়ে যাবে।

মহিলা হোমিওপ্যাথ এই এলাকায় কেন মহকুমাতেই নাই। ও ই হবে প্রথম মহিলা ডাক্তার।

তবে এখন হোমিওপ্যাথির কলেজ হয়েছে। সে সব কলকাতায়। সেখানে পড়াবার মত এত পয়সা তার নেই। তবু বাড়িতেই পড়ায় সে! কথাটা বলেছে ও চন্দনাকে।

চন্দনা বলে—ওসব বড়ি আর ফোঁটার ওষুধের দিন আর নেই বাবা।

চটে ওঠে গগন—ওসব বলবিনা। দেখবি ওই গাদা গাদা ওষুধের চেয়ে লোকে একদিন এই ওষুধের দিকেই ঝুঁকবে।

এসব এলোপ্যাথিক ওষুধ তো বিষই। ওর রিঅ্যাকশন যখন হবে তখন বুঝবে। তাই বলি পড় বই গুলো—দেখবি মহাশাস্ত্র।

চন্দনার ইচ্ছা কলেজে পড়ে, আজকাল অবশ্য বাসে ডেলি প্যাসেনজারি করে এখান থেকে অনেক ছেলে মেয়েই মহকুমা শহরে কলেজে পড়তে যায়।

সেও তাই যাবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ওদের বাড়িটা গ্রামের একদিকে। ওপাশে রাস্তার ওদিকেই এখন নতুন হাসপাতালের বাড়ি উঠছে। তাই এদিকে কিছু লোকজনের আসা যাওয়া হয়েছে।

বাবাকে হ্যারিকেন নিয়ে বাড়ি ঢুকতে দেখে চাইল চন্দনা।

চন্দনার মা কয়েক বৎসর হলো গত হয়েছে। চন্দনার এখানে কাজ করে

কুসুম।

কুসুমের বাবা ফনী সাশ এককালে ঘরামির কাজ করতো। চাল ছাইতে পারতো খুব মজবুত করে। ঘরের চেহারাই বদলে যেত ওর হাতের ছাউনিতে।

দুচালা—চার চালা—আটচালা ছাওয়ার মত লোক কম মেলে। ফনী ছিল এক নম্বর বারুই। লোকও ভালো।

কিন্তু দোষ ছিল একটা, খুব মদ গিলতো, আর মদ না খেলে নাকি কাজই করতে পারত না।

কুসুম বলে—ওই দোষেই অনর্থ ঘটে গেল দিদি। লোকটা অথর্ব হয়ে গেল।

ঘটনাটা দেখেছিল চন্দনাও।

দত্তদের উঁচু চারচালার মাঠকোঠায় ছাউনি দিচ্ছে ফনী। ক বছর আগেকার ঘটনা।

টং-এ উঠেছে। নীচে থেকে যোগাড়ে ভিজে খড়ের আঁটি ছুঁড়ে দেয় জোরে উপরের দিকে ওস্তাদ বারুই চালের মটকায় বসে নিপুণ হাতে উড়ন্ত ওই খড় গুলোকে এক হাতে ধরে নিয়ে ছাউনির কাজ করে।

নেশায় টলমল করছে সেদিন ফনী।

নগদ পয়সা হাতে পেয়ে একটু বেশীই গিলেছে। যোগাড়ে গুপী বলে —এখন উঠো না। টেলছো। ওস্তাদ, একটু সামলে নে মড়কচায় ওঠো।

ফনী বলে—ব্যাটা আমাকে মড়কচায় ওঠা শিখুচ্ছিস? চালে ওঠার মত ক্ষেমতা আমার নাই? খড় ভিজো—আমি উঠছি চালে।

মইদিয়ে উঁচু চালের মড়কচায় বসেছে ফনী, গুপী খড় ছুড়ছে, হঠাৎ দেখা যায় খড়টাও নীচে এসে পড়ে তার সঙ্গে উঁচু চালের মাথা থেকে গড়িয়ে পড়েছে ফনীও।

বেকায়দায় পড়ে কোমরই ভাঙ্গে। লোকজন জুটে যায়।

কোনমতে তুলে আনে। নিবারণ ডাক্তার বলে—হাড় ভেঙ্গেছে। এতো প্লাস্টার করতে হবে। সহরে নে যাও।

থাকার মধ্যে ওই কুসুম। তার কি সামর্থ. সে এসে কেঁদে পড়ে গগন ডাক্তারের কাছে। বাড়িতে পড়ে কাতরাচ্ছে ফনী। নেশা ছুটে গেছে।

বলে ওষুধ ফষুধে কাজ হবে না গো. আমাকে একবোতল নিশা দাও ডাক্তার বাবু?

গগন ওকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে। এ ছাড়া কুসুমের আর কোন সামর্থ্যই নেই এই হোমিওপ্যাথিতেই ক্রমশঃ ফনী একটু সুস্থ হয়। তবে কোমর আর সোজা করতে পারে না। লাঠি নিয়ে হেঁট হয়ে চলে। চালে ওঠার সাধ্যও

আর নেই। এখন পাটের দড়ি—শনের দড়ি পাকায় বসে বসে। দোকানে দিয়ে আসে কুসুম। চাষের কাজে গরু বাঁধতে, নানা দরকারে দড়ি দড়া লাগে। ওই ভাবেই কিছু আসে আর কুসুম চন্দনাদের বাড়িতে কাজ কর্ম করে যা পায় তাতে মেয়ে বাবার কোনমতে চলে যায়।

আর নরেশ বাবুর বাড়িতেও কাজ করে। মেয়েটার দেহে সদা বিকশিত যৌবনের মাদকতা।

গোপেন ওকে বলে

—আমাদের বাড়িতে কাজ করবি চল কুসুম। বছরে চারখানা কাপড় পাবি, মাসে একশো টাকা দেব।

কুসুমে চেনে গোপেনকে। মেয়েটা গাঁয়ের গেজেট! দামাল ডানপিটে মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই নেশাখোর বাপের চড় লাথি খেতে, মারখেতে ও যেমন পারে আবার তেমনি পারে ফুসেও উঠতে।

ছেলেবেলায় তাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারপিটের প্রচলন দেখে সেও ওটাকে রপ্ত করতে পেরেছে। তার হাতের ছোঁড়া ঢিলে বাগানের আমগাছের মগডালের আমও পড়ে যায়।

এখনও সেই মারপিট, ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাসটা রেখেছে কুসুম।

গোপেনের কথায় বলে।

—এখন হাতে অনেক কাজ। টাইন নাই গোপেনবাবু।

কুসুমে চন্দনার কাছে দু' একটা ইংরাজী কথাও শেখেছে। মাঝে মাঝে সেগুলো প্রয়োগ করে।

গোপেনকে চটাতে চায় না! তবে লোকটাকে তার মোটেই ভালো লাগে না। কেমন সাপের মত কুত কুত করে চায়।

গোপেন বলে—কথাটা ভেবে দ্যাখ। তোর ভালোর জন্যই বলছি।

কুসুমে অবাক হবার ভান করে।

—হেই মা গো! বাবু তুমি আমার ভালোর জন্যে ভাবছো? হাসে গোপেন—হাঁরে। পরে বলবি। কেমন।

কুসুম অবশ্য আর কোন কথাই বলেনি।

চন্দনার কাছে থাকে সন্ধ্যাটা। সারা গাঁয়ের খবর দেয়।

আজকের আসরে অতুলের নাচগান তারও খুব ভালো লেগেছে। কুসুম অবাক হয়ে ওর গান শোনে।

ছেলেটাকে দেখেছে পথে ঘাটে। হাসপাতালের কাজকর্ম ও দেখাশোনা করে অতুল। বাবুদের সঙ্গের ওই ছেলেটার যে এত গুণ তা জানতো না সে।

বলে কুসুম—দেখলা চন্দনা দি, আসরে এত লোকের সামনে ক্যামন গান বেঁধে ওই প্রধানের গুণের ব্যাখানা করছিল গো? যেমন গলা তেমনি গান।

চন্দনা শুনেছে ওর কথাগুলো। বলে

—হঠাৎ ওই অতুলকে তোর এত ভালো লাগলো কেন রে?

—ধ্যাৎ! কি যে বলো দিদি!

কুসুমও যেন কি লজ্জা বোধ করে! ওর চোখে মুখে কি মিষ্টি স্বপ্নের আভাস।

বলে কুসুম—কিন্তুক ওকে মারলেক ওই গোপেন বাবু?

চন্দনা অবাক হয়—কি যা তা বলছিস?

—হ্যাগো! আসরের, ইদিকে আমি ছিলাম। স্বচক্ষে দেখলাম ওই গোপেনবাবু একখান আধলা ইট তুলে ধাঁই করে মারলেক ওকে।

চন্দনা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। তাই বলে.

—কি যা তা বলছিস?

—হি, গ। ওই গোপেনবাবু মেরেই আঁধারের মাঝখানে পালিয়ে গেল। ওটা শয়তান বটে।

ঢুকছে গগন। স্তব্ধ পরিবেশে গগন কুসুমের কথাটা শুনে চমকে ওঠে। গগন ভেবেছিল কোন ফচ্‌কে ছেলের কান্ড। কিন্তু এমনি মতলব করে গোপেন অতুলকে মারতে পারে তা ভাবেনি গগন।

গগনকে ঢুকতে দেখে থেমে যায় কুসুম।

চন্দনা বাবার দিকে চাইল—এত দেরী হলো বাবা?

—হাটতলায় নিবারণ, বদ্যিনাথ সবাই ছিল। কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল।

তারপরই গগন কুসুমকে চলে যেতে দেখে বলে,

—শোন।

কুসুম চাইল। গগন বলে,

—ওইসব কথা—ওই ইট মারার কথা যা বলছিলি আর কোথাও বলবি না।

কুসুম বলে—কেনে গো? উদের ভয়ে?

গগন বলে—গোপেন সাংঘাতিক লোক। কেন শত্রু বাড়াবি?

—তাই বলে ইমন অন্যায় করবেক তার পিতীকার হবেক নি ডাক্তারবাবু?

এর জবাব গগন ত জানে না। কুসুম বোধহয় জানেনা যে এই সমাজে একশ্রেণীর মানুষ অন্যায় করার অধিকার অর্জন করে নেয় আর তারা বিনা বাধায় সেটাই করে।

অবনীর অন্যায়গুলো—তার বাবা ভূষণ নায়েবের অন্যায়গুলোরও কোন প্রতিকারই হয়নি।

বলে গগন—হয়তো হবে কোনদিন। তাই বলে আগ বাড়িয়ে ওসব কথা গাঁ ময় বলে বেড়াস নি। বুঝলি?

মেয়েটা অন্য কেউ হলে হয়তো প্রতিবাদই করতো। নেহাৎ ডাক্তারবাবু বলে প্রতিবাদ করে না। চলে যায়।

চন্দনাও চুপ করে শুনছিল বাবার কথাগুলো। এবার বলে—হাত মুখ ধুয়ে নাও। খেতে দিই।

আসরের ওই হোমিওপ্যাথী নিয়ে কিছু আর বলতে চায় না চন্দনা! জানে বাবার ওই রোগ সারার কোন ওষুধ হোমিওপ্যাথিতে লেখা নেই।

—খেতে খেতে বলে গগন—তা হোমিওপ্যাথি বইগুলো পড়ছিস তো মা। মেটিরিয়া মেডিকার চ্যাপটারটা মন দিয়ে পড়বি। ওই একটা ওষুধকে চিনতে পারলে অর্ধেক হোমিওপ্যাথিকে চেনা যাবে। মহৌষধ।

চন্দনা বলে—বাবা, গাঁয়ের বাসন্তী—শিখারা কলেজে পড়বে বলছে। বাসে যাতায়াত করবে ওরা। আমি ভাবছি কলেজেই ভর্তি হবো। অবশ্য বাড়িতে হোমিওপ্যাথিটাও পড়বো। তবে কলেজে পড়লে হোমিওপ্যাথিটা ভালো করে জানা যাবে।

হোমিওপ্যাথিকে জানার আগ্রহের কথা শুনে গগন খুশী হয়। একটা মাত্র মেয়ে, অবশ্য জমিজমার আয়পয় কিছু আছে। ওর কলেজে পড়তে অসুবিধা হবে না। গগন বলে।

—কলেজে পড়তে চাস পড় মা। তবে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিটা পড়তেই হবে।

—তা পড়বো বাবা।

—তাহলে কলেজে ভর্তি হয়ে যা। খরচপত্র কি লাগবে বলবি। হাঁ। পাশ করে একেবারে পাশ করা ডাক্তার হয়ে চেম্বারে বসবি।

কি স্বপ্ন দেখছে গগন।

ফনী তখন বোতলটা নিয়ে বসে আছে।

ইদানীং ফনী আর ঘর ছাওয়ার কাজ করতে পারে না। ঘরে বসে দড়িদড়া পাকায়। বৈকালে লাঠিতে ভর করে ছিদাম মুদির দোকানে ওগুলো দিয়ে আট দশ টাকা যা পায় তাই নিয়ে হরিসাহার মদের দোকানে গিয়ে হাজির হয়।

একটা ছোট বোতল তার চাই-ই।

নিজের পয়সা যেদিন জোটে না সেদিন ঘরের চাল ধানই বিক্রী করে মদ খায়। কুসুমও বাপের এই গুণের কথা জানে।

কুসুম দুতিনটে বাড়িতে কাজ করে নগদ টাকাও বেশ পায়। কিন্তু বাড়িতে রাখলে বাবা ঠিক খুঁজে বের করে সব পয়সা মদে ফুঁকে দেবে। তাই নিজের বুদ্ধিমত একটা নিরাপদ জায়গাতেই রাখে। দরকার মত বের করে আনে।

বাড়ি ঢুকছে। ফনী পায়ের শব্দ পেয়ে হাঁক পাড়ে—কে! কুসুম!

এলি ?

কুসুম নরেশদার বাড়িতে সন্ধ্যায় রান্নাটা করে দেয়।

নরেশবাবু ওঁর স্ত্রী লীলাবৌদি দুজনেই কাজ করেন। লীলাবৌদি এখানের সরকারী অফিসে কাজ করে। হাসি খুশী মহিলা।

কুসুমকে খুব ভালোবাসে। ওর নিজের দুচার বার পরা শাড়ি ব্লাউজ দেয়। সাবানও দেয়।

বলে—নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে থাকবি।

আর ছিমছাম থাকলে কুসুমকে সুন্দর দেখায়। মুখ চোখও বেশ সুন্দর। নাকটা সুডোল। মেয়েটাকে তাই ভালোবাসে লীলাবৌদি। রাতের রান্না করা রুটি—তরকারী ডিমেরকারী এনেছে বাড়িতে কুসুম। আগে ওসব আনতে চাইতো না। লীলাবৌদি বলে!

- আবার গিয়ে বাপটার জন্য রাধবি, নিয়ে যাবি খাবার। চন্দনাদিও এটা সেটা রান্না হলে দেয়। ফলে রাতে রাধতে হয় না কুসুমকে।

কুসুম বাবাকে বলে, খেতে বসো।

ফনী বলে—যাচ্ছি। হ্যারে শুনিসনে ইখানে এবার বড় ডাক্তার আসবে। হাসপাতাল হবে। মাগনায় চিকিচ্ছে হবে লোকের।

কুসুম বলে—হ্যাঁ। হাসপাতাল বাড়িতো হয়ে গেছে। ইবার যন্ত্রপাতি ডাক্তার সব আসবে।

ফনী বলে—আমার এই কোমরটা ভালো হবে। বড় ডাক্তোর পারবে ? বুটীল ওই নার্সিং-হোমের ডাক্তার ওই যে ধানকল মালিক শেঠের ছেলে।

—গিরিধারী ডাক্তার ?

—হাঁ ওব্যাটা ডাক্তার না ছাই। বললে—তোমাকে দেখবো পরীক্ষা করতে বত্রিশ টাকা লাগবেক। তু বল—ইটা কি হলো ? চোখে দেখবে বাস গুণে লিবে বত্রিশ টাকা, তিনটে পাইটের দাম! হাসপাতালে বড় ডাক্তার এলে ওদের গুমোর ঠাণ্ডা হবে।

কোমরটা ঠিক হলে—

কুসুম জানে বাবার চিকিৎসা সে করাতে পারে নি। তারও খুব সাধ একবার হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে দেখাবে। বলে।

-কিন্তু আবার মদ গিলে তো পড়ে মরবে চাল থেকে।

ফুঁসে ওঠে ফনী—তাই বলে অকম্মা থাকতে হবে! আর মাল খাই তুর পয়সায় ?

কুসুম বলে—ঘরে তো কিছু রাখার যো নাই। মায় চাল ধান ও বিচে মদ খাও—

ফনী বলে—চুপ মেরে থাক। খাইতো খাই—আলবাৎ খাবো। কুসুম

জানে নেশার ঘোরে ও বকেই চলবে। তাই বলে,

— তাই গেলো। আর গিলে মরো, তোমারও হাড় জুড়োয়, আমারও।

ফনীর নেশা চড়ছে। সে গর্জে ওঠে।

—আমি মলে তোর খুব মজা হয় নারে? ওটি হচ্ছে না। তোর বিয়ে থা দিয়ে ঘরে থিতু করে তবে মরবো। করালীর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

করালী দাস বাজারে আনাজপত্রের ব্যবসা করে। ভোর থেকে আনাজপত্র নিয়ে বসে, বাজারে ইদানীং তার দোকান ভালোই চলে। মফঃস্বলের অনেক চাষী ওদের ক্ষেতের সবজি সব এনে ওর কাছে ঝাড়ি দরুণে বিক্রী করে যায়। করালী সেই মাল অন্য দোকানদারদের বিক্রী করে, এ ছাড়া নিজেও মাল বেচে এখন দুটো পয়সা রোজগার করছে।

লোকটা দেখতে মোষের মত কালো আর মুষকো চেহারা। চোখ দুটো সব সময়ই লাল হয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর আর দোকানে থাকে না। গিয়ে হাজির হয় হরিসাহার দোকানে।

এর আগে দুটো বিয়ে করেছে। প্রথম পক্ষের একটা ছেলে আছে। সেও বাবার সঙ্গে দোকানে বসে। প্রথমা স্ত্রী কি অসুখে ভুগে মারা যেতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে করালী সহরের একটি মেয়েকে। মেয়েটা এসে বছর কয়েক থাকার পর কোন একটা ফেরিওলা ছোড়ার সঙ্গে ভেগে যায়।

করালী এখন তৃতীয় পক্ষের সন্ধানে রয়েছে।

ফনীকে আজ মদের বোতলটা সেই-ই দিয়েছে। ইদানীং করালীও ফনীকে হাতে আনার চেষ্টা করছে।

কুসুম করালীর নাম শুনে বলে।

— ওই বুনো মোষটার সঙ্গে এখন দেখি খুব পিরীত।

—করালীর মত দিলদার আদমী হয় না। বুঝলি? খুব মান্যি করে আমাকে।

কুসুম বলে—তা করবে না। বাপ, তোমাকে বলছি ওই লোকটার পয়সায় মদ গিললে তোমাকে ঘর থেকে বিদেয় করে দেব। ও বাজে লোক।

ফনী অবাক হয়—মদে দোষ নাই। ও বাজে হতে পারে মানছি, কিন্তু এই জিনিসটা তো বাজে নয়। একেবারে সরকারী ছাপমারা শিলবন্দী মাল।

কুসুম বলে—আর মালের ব্যাখ্যা করতে হবে না। ওঠো—মাল খেলেই হবে? মরবে যে—চলো খাবে চলো। মাতাল-অসহায় অথর্ব বাপকে গালি গালাজও দেয় আবার ভালোও বাসে। দুনিয়ায় ওই লোকটা ছাড়া কুসুমের আর কেউ নেই।

এতদিন তাই ছিল। এবার কুসুমের আর একজনের কথা মনে পড়ে। একটা বিচিত্র বাঁশীর সুর ওঠে। কুসুমের মনে অতুলের অস্তিত্ব যেন ওই সুরের মতই।

কিছুদিন আগে কুসুম নদীর ধারে গেছে শ্বেত আকন্দের সন্ধানে, বদ্দি কবরেজের নানা গাছ গাছাড়ি শিকড় বাকড় লাগে। তার জন্য দুপাঁচ টাকা দামও দেয়। কুসুমের মন চায় এই গাঁয়ের বসতি ছাড়িয়ে দূর সবুজের মাঝে উধাও হতে। তাই নদীর ধারে মাঠের ওদিকে কাশবনে সে ঘোরে। শরতের মুখে সবুজ ধান ক্ষেতে--ঢেউ বয়ে যায়। নদীর ধারে চরভূমিতে তখন সাদা কাশফুলের উত্তরী। অজয়ের বুকে তখনও যৌবনের গেরুয়া জল বয়ে চলে, কুসুম চলে আসে এদিকে। আর পথে ওই সব গাছগাছালিও তোলে।

সেদিন কুসুম এসেছে। নদীর বাঁধের উপর থেকে নজর মেলে দেখছে এদিকে সবুজ ধান গাছের বিস্তার তাদের গ্রাম অবধি, এদিকে শ্বেতশুভ্র উত্তরী কাঁপে কাশ বনে।

হঠাৎ বাঁশীর সুর শুনে চাইল। এই সুন্দর স্বপ্নময় জগতে ওই বাঁশীর সুর যেন তার মনে কি দোলা আনে। মিষ্টি সুরটার উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখে অতুলকে।

তন্ময় হয়ে বাঁধের উপর একটা জিওল গাছের ছায়ায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে ওই অতুল।

—তুমি! হঠাৎ করে পায়ের শব্দে চমক ভাঙ্গে অতুলের। সামনে কুসুমকে দেখে চাইল।

কুসুম বলে—সুন্দর বাঁশী বাজাও তো!

অতুল যেন লজ্জায় পড়ে, বলে—না—না। এদিকে আমাদের গরুগুলো বাথানে আসে। সেই কাজে এসেছি, বসে বসে কি করবো তাই

—কিষ্ট ঠাকুরের মত বংশী বাজাচ্ছিলা?

কুসুমকে দেখছে অতুল। বাতাসে ওর শাড়ির আঁচল উড়ছে। নবাগত যৌবনের রেখাগুলো ওর দেহে সোচ্চার, চোখের গভীর চাহনিতে কি যেন আদিম রহস্য ফুটে ওঠে।

কুসুম বলে—ইখানে প্রায় আসো, না?

অতুল বলে—এ জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। সবুজ, সুন্দর, তাই চলে আসি। এখানে এসে ভালো লাগে—

এ যেন কুসুমের কথাই।

কুসুম বলে—তা সত্যি। গাঁয়ের কচকচি নাই, মানুষ গুলোন সব ক্যামন বদলে গেছে। ইখানে কেমন শান্তি—

অতুল বলে—সত্যি।

দুজনে সেই প্রথম ঘনিষ্ঠতা। কুসুমের মনে সেই সুরটা আজও বাজে। তারপরও দেখা হয়েছে তাদের।

কুসুম বলে—ক'দিন আসোনি ইথানে?

অতুল বলে—গাঁয়ে হাসপাতাল হচ্ছে। তাই ভবতোষ বাবু, নরেশবাবুদের সঙ্গে ঘুরছি গাঁয়ে গাঁয়ে চাঁদার জন্য। তা বুঝলে সবাই চায় হাসপাতাল হোক, কিন্তুক ওই যে অবনী বাবু গোপেন তারপর ধানকল মালিক মুকুন্দরামরা চায় না ওসব হোক।

কুসুমের আশা বড় ডাক্তার এলে সে বাবাকে দেখাবে। তার বাবা ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু অতুলের কথায় অবাক হয়।

—কেন। উরা চায় না কেন?

অতুল বলে—ওদের ওই নার্সিং হোম এর ব্যবসা মারা পড়বে যে, এখন লোকের গলা কাটছে চিকিচ্ছের নামে। গেলেই বত্রিশটাকা—

কথাটা কুসুমও শুনেছে বাবার কাছে। তাই বলে

—হ্যাঁ।

—তবে! ওরাতো চাইবেই না ওসব হোক।

অতুলের কথায় কুসুম বলে—তাহলে হবে না হাসপাতাল? অতুল বলে—হবে না মানে? ওদের চোখের ওপর ভবতোষ বাবুরা হাসপাতাল গড়বেই? বিলডিং হয়ে গেছে—এবার চালু হবে।

কুসুম যেন কি আশ্বাস পায় ওর কথায়।

দুজনে ফিরছে গ্রামের দিকে। পথের দুধারে এখন সরকার থেকে বহু গাছ লাগানো হয়েছে। বেশ ছায়া ছায়া ভাব। জীবনের উষর পথে যেন কুসুমও অতুলকে এমনি ছায়ার মতই ভাবে।

আজ আসরে ওর আর এক রূপ দেখেছিল কুসুম। ও বড় কবিয়াল—গাইয়ে। ওর মনের কথা গুলোই যেন কবিগানে ফুটিয়ে তুলেছিল সে। তারপরই ওকে থামানোর জন্যই ওই ভাবে ইট মেরেছিল ওরা।

কেমন আছে কে জানে অতুল। ওই আঘাত যেন কুসুমের বুকেই বেজেছে!

ওই ইটের টুকরোটা আজ নরেশ মাস্টারকেও যেন ঘা মেরেছে। শুধু ওকেই নয়, এখন মনে হয় এবার ওই অবনী চৌধুরী এতদিন নিরাপদে লুট পাট করেছে, কেউ কোন কথাই বলেনি। তাতে ওরা ভেবেছে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তাই অতুল কবিগানে ওর প্রতিবাদ করতেই তারাও এবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আর এই ইট মারার মাধ্যমেই তারা জানিয়ে দিয়েছে প্রতিবাদ করলে এখুনি

আঘাতই জুটবে।

অবশ্য অবনী সকলের সামনে এর প্রতিবাদই করেছে। কিন্তু নরেশবাবু জানেন এর শেষ এখানেই নয়। এই তার শুরু, গোঁসাইগঞ্জের শান্ত জনপদে শুরু হল নতুন এক সংগ্রামের।

লীলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে,

—কি এমন গেয়েছিল অতুল?

অতুলকে চেনে লীলা। সতেজ কবিমন ছেলেটার! প্রায়ই আসে। দু চারখানা করে বইও নিয়ে যায়। হাসপাতালের জন্য খাটছে। বাপের ব্যবসা পত্র দেখে না। এইসবই করে।

লীলা বলে—খুব জোর চোট লেগেছে?

নরেশবাবু বলেন—লেগেছে। নিবারণ ডাক্তার ওষুধ ইনজেকসন দিতে নিয়ে গেল। তবে কি জানো লীলা—যারা এ ভাবে আঘাত করতে পারে তারা যে এবার প্রকাশ্যেই সেটা করবে তাই মনে হয়!

লীলা বলে—কিন্তু এতো অন্যায়।

· অন্যায় তো আজ সমাজের সর্বস্তরে বাসা বেঁধেছে।

এখানেও দেখছ না? এবার তাই সংঘাতই শুরু হবে।

অবনী চৌধুরীর বাড়িতে, এর মধ্যে খবর পেয়ে শেঠ মুকুন্দরাম, ওর ছেলে গিরিধারী ডাক্তারও এসেছে। এসেছে শীতল ঘোষ, নন্দ বাবু আরও দু' একজন।

গোপেনও রয়েছে। শেঠজী বলে

—অবনী হামি শুনলো তোমাকে কারা ইট মারলো? গিরিধারী বলে:

আমি তাই ছুটে এলম খবর নিতে।

হাসে অবনী—না, না। তোমরা অকারণেই ব্যস্ত হচ্ছো। তেমন কিছুই নয়। লক্ষ্মীও এসে পড়ে।

সে বলে গিরিধারীকে—এসো বাবা। সব সময়তো নার্সিংহোমেই থাকো, সময় পাও না। এসো—বাড়িতে জল খাবার খেয়ে যাবে।

গিন্নী গিরিধারীকে ভিতরে নিয়ে যেতে এবার শেঠজী বলে

—হাসপাতাল তো হলো। অবনীবাবু—উদের এত হিম্মৎ তোমার নামে কেচ্ছা গাইবে?

গোপেন বলে—হাসপাতালের কাজে বাধা দিতে পারলাম না দেখে ওরা ভেবেছে আমরা কমজোর হয়ে গেছি, তাই এবার ওই সব করে আমাদের এগেনস্টে দল পাকাতে চায়।

শীতল ঘোষের রাগ ওই নির্মলবাবু, ভবতোষ বাবু আর বেশী করে

নরেশবাবুর ওপর।

শীতল বলে—এসব ওই নরেশ বাবুরই মতলব। ও আমাদের কোচিং ক্লাশের পিছনে লেগেছে। এবার হাসপাতাল হলে আপনার নার্সিং হোমের পিছনেই না লাগে।

গোপেন বলে—থামোতো মাস্টার। ওসব করার আগেই ওদের ব্যবস্থা করে দেব। হাসপাতালই চৌপট করে দেব।

অবনী চৌধুরী সাবধানে পা ফেলে।

বলে সে—গোপন, হুটহাট করে মাথা গরম করে কাজ করিসনা। জানবি ওরাও আটঘাট বেঁধে নামছে। আর আজ যা করেছিস যদি ওরা কেউ দেখতো ওখানেই তোকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিত। তাই বলছি মাথা গরম করবি না।

শেঠজীও বলে, ঠিক বাত। ধীরজ সে কাম লেও, হোনে দেওনা হাসপাতাল।

এর মধ্যে সারা গ্রামাঞ্চলের মানুষ জেনে গেছে ব্যাপারটা। তারা অবনী বাবুর অঞ্চলে বাস করে। দেখেছে আশপাশের অনেক অঞ্চলে পথ ঘাট হয়েছে, কৃষিঋণ, সারের বণ্টনও ঠিক মত হয়। সে সব এলাকায় সেচের বাঁধ গুলোরও সংস্কার হয়।

কিন্তু এখানে তেমন কিছুই হয় নি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে তাদের মনেও। এর মধ্যে অনেক গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করে। আর মেম্বারদেরও প্রশ্ন করে। ওদের এলাকায় কাজ হয়, আমাদের এখানে কেন হয় না।

প্রধান কি বলে?

এ সব আলোচনা এবার পঞ্চায়েত মিটিং-এ, গ্রাম সভার মিটিং এ তুলছে লোকজন। অবনীবাবুর কানেও আসে কথা গুলো! ক্রমশঃ এ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনাও হয়।

এই সময়ই স্কুল-এর ম্যানেজিং কমিটির ভোট এসে যায়। এতকাল পরে মিত্তির বাবুদের এই স্কুল নিয়ে লোকে মাথা ঘামায় নি। ওদের তরফ থেকে মদন মিত্রই রয়ে গেছে।

এখন তার অবস্থাও ভালো নয়। তবু মদনের একটা নীরব রাগ অবজ্ঞা রয়ে গেছে অবনীর উপর। ওর বাবা একদিন তাদের এস্টেটের নায়েব ছিল। আর তখন থেকেই চুরি করে তাদের অনেক বিষয় আশয় গ্রাস করেছে। তাদের দিঘী—আমবাগান আজও আছে। তবে সেগুলো আর মদনবাবুদের নয়, কি ভাবে দখল করে নিয়েছে ওই অবনী। সেখানে নতুন করে সাজিয়েছে বাগানকে, একটা বাংলো বাড়িও করেছে সেখানে। সদরের সাহেব সুবোদের

এনে সেখানেই তাদের আপ্যায়ণ করা হয়।

মদন মিত্র এসব দেখে।

এবার সে-ই এগিয়ে এসেছে স্কুলের ইলেকসনে। ভবতোষবাবু, নির্মলবাবু, গণেশ ডাক্তাররা ওই সেদিন ইটমারার ঘটনাটাকে ভুলতে পারেন নি।

তারাও এবার জেনেছে এটা কার কাজ।

সেই অন্যায়ের জবাব দেবার জন্যই এরাও এবার তৈরী হচ্ছে।

ওদিকে শীতল মাস্টার জানে স্কুলে অবনীবাবুকে প্রেসিডেন্ট করে রাখতেই হবে। সেক্রেটারী হবে গোপেন। তাই নিয়েই শীতলবাবু, গোবিন্দবাবু অন্য শিক্ষকরা ওই কোচিং ক্লাশ গুলো চালায় স্কুলের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে তারাও একজোট হয়েছে। অভিভাবকদের কাছে যাচ্ছে। শিক্ষকদের মধ্যেও নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

সেদিন কুসুম নদীর ধারে এসেছে, দেখে সেই হিজল গাছের নীচে বসে আছে অতুল। কপালে ব্যান্ডেজ। এগিয়ে আসে কুসুম

—কেমন আছো কবিয়াল?

—কবিয়াল! অতুল চাইল।

কুসুম এসে ওর পাশে বসে দেখছে ওকে।

—খুব লেগেছিল না গো?

অতুল ওর কণ্ঠস্বরে যেন কি অনাস্বর খুঁজে পায়। সবুজ পাখী ডাকা এই নিরালায় কুসুমকে নতুন করে দেখে সে।

হাসে —না।

—ওই গোপেন মুখপোড়াই ইট মেরে পালালো। দেখবে এর শোধ আমিই একদিন নোব।

অতুল বলে—ওসব কথা ছাড়ো কুসুম। এদিকে—হঠাৎ?

কুসুম বলে তোমার জন্যেই গো। ত্যাখন থেকেই তোমার কথা ভাবছি।

—আমার জন্য এত ভাবো? কেন?

কুসুম এর জবাব জানেনা। চুপ করেই থাকে। মনের গোপন খবরটা জানাতে মন চায় না।

ওর হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ওই সামান্য স্পর্শটুকুই কুসুমের মনে যেন সেই সুর তোলে।

—অনেক দিন তোমার বাঁশী শুনিনি।

অতুল বলে—শোনাবো একদিন। তবে কুসুম, শ্যামের বাঁশী শুনে রাধা কি করতো জানো? ঘর ছেড়ে যমুনার তীরে আসতো।

তুমিও কি ঘর ছেড়ে অজয়ের ধারে আসবে?

কুসুম হেসে ফেলে বলে

—আমি রাধা লই, তুমিও কেষ্ট লও গো কবিয়াল। তা বাপু, ওই গান আবার গাইবে দেখবো কে ইট মারে।

অতুল দেখছে মেয়েটিকে। দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলে কুসুম।

—ওদের ভয়ে থেমে যাবা না কবিয়াল। থামবা না তুমি!

অতুলের বাবা ছিনাথ এর বড় গরুর গোয়াল। গরু মোষ তার বেশ কয়েকটা আছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সে গরু মোষ কিনে দুধের ব্যবসা করে।

ব্যবসা ভালোই চলে। সহরের মহাজনরা তার সব দুধ নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কের টাকাও দিচ্ছে সে, আর ব্যাঙ্কের লোন পেয়েছিল সে পঞ্চায়েতের প্রধানের সুপারিশে। অবশ্য তার জন্য গোপেন বাবু আর ব্যাঙ্কের লোকদেরও কিছু দিতে হয়েছিল। তবু ব্যবসা মন্দ চলছে না।

ছিনাথ বারবার বলে অতুলকে—দাদারা এদিক দেখছে তুইও গরু বাছুর গুলোকে দ্যাখ।

ওই গরু মোষের পিছনে দিনরাত পড়ে থাকতে পারে না সে তাই নিয়েই বাধে বাবার সঙ্গে।

—তোকে কি বসে বসে খাওয়াবো? দিনরাত বাঁশী বাজাবি অকাজে ঘুরবি। ওই হাসপাতাল ইস্কুল এসব নে কি হবে তোর? প্যাট ভরবে? জাতব্যবসা কর।

অতুল চুপ করেই থাকে।

সেদিন আসরে ওই কবিগান এর কথা শুনে ছিনাথ এবার রেগে ওঠে। মার খেয়ে ফিরেছে ছেলেটা। মাথায় ব্যান্ডেজ, ছিনাথের কানে উঠেছে—পঞ্চজনের সামনে প্রধানের নামেই কেচ্ছার গান বেঁধে গাইছিল। তারপরই ইট মেরেছে কে অতুলকে।

অতুল ফিরতেই ছিনাথ তার বড় ছেলে অতুলের দাদা নিধিরামও বলে, —জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করবি?

ওই প্রধানের নামে খেউর গেয়ে নিজের মাথা তো ফাটিয়েছিস এবার আমাদের কপাল না ফাটে। ওর এলাকায় বাস করি!

অতুল বলে—ওর খাস তালুকে বাস করো নাকি যে ওই অবনীবাবু তোমাদের মাথা কেটে নেবে?

ছিনাথ বলে—ওরা অনেক বুদ্ধি ধরে—

নিধিরাম ব্যবসা পত্রের দিকটা দেখে। সে জানে ব্যাঙ্ক লোনের জামিনদার ওই অঞ্চল প্রধান। তাছাড়া কৃষি ঋণও নিয়েছে কয়েক হাজার টাকা। এসবই হয়েছে প্রধানের হাত দিয়ে; অবশ্য তার জন্য প্রণামীও দিতে হয়েছে।

এবার হঠাৎ ব্যাংক থেকে ওই চিঠি পেয়ে চমকে ওঠে ছিনাথ। বলে—কি লিখেছে রে নিধি ?

নিধিরামই লেখাপড়া জানে। ছিনাথ বেশী জানেনা।

নিধিরাম বলে, ব্যাঙ্ক বলেছে সব ঋণের টাকা ফেরৎ দিতে হবে।

—কেন ? ছিনাথ বলে। আমরা তো কিস্তী ঠিক মতই দিচ্ছি। বলে নিধিরাম।

—আমাদের জামিনদার ছিলেন অবনীবাবু উনি আর জামিন থাকতে রাজী নন।

—সে কি !

নিধিরামই এবার বলে

—কেনে থাকবে ? ওই অতুল পঞ্চজনের মধ্যে ওর নামে যা তা খেউর গাইবে আর চুপ করে থাকবে অবনীবাবু, এখন বোঝো মজা।

যাও অবনীবাবুর হাতে পায়ে ধরে মেটাও গে। নাহলে এত টাকা দিতে হবে ব্যাংককে। এমনি সর্বনাশই করবে ওই অতুলো তা জানতাম।

ছিনাথ কি ভাবছে বসে।

—তার জন্য এত ট্যাকা নেল প্রধান আর ওই সব গানের জন্যে তো অতুলোকে মেরেছে শোধবোধ হয়ে গেল না ?

নিধিরাম বলে, ওটা তোমার কথা। প্রধান তা বুঝবে কেন ?

তাই নিজেই প্রধানের কাছে এসেছে ছিনাথ।

গোপেন বাইরের ঘরে ছিল। গোপেনের অনুমতি ছাড়া ভিতরে যাওয়া যাবে না। গোপেন জানতো অতুলের বাবা ঠিকই আসবে! বিশেষ চালটা সেইই দিয়েছিল অবনীবাবুকে বলে।

শত্রুদের যে চরম আঘাত করতে হয় তা জানে সে।

ছিনাথ আসার আগেও কথাটা ভেবেছে।

প্রধান তার কাজের পুরোদাম নিয়ে আজ বেইমানী করছে।

ওই ওর সব নোংরামির খবর জানে ছিনাথ। কৃষিলোন এর জন্য সরকারের কাছে জমি বন্ধক রাখতে হয় যে লোন নেয় তাকে দেনা শোধ করে দিলে সরকার থেকে সেই বন্ধকীদলিলও ফেরৎ পায় মালিক কিন্তু ওই অবনীবাবু প্রধান হিসাবে বহু চাষীকে কৃষিলোন পাইয়ে দিয়েছে সরকারী ফান্ড থেকে আর অশিক্ষিত চাষী জানতেও পারে নি যে বন্ধকী দলিল সরকারের নামে নয়—ওটা হয়েছে অবনীবাবুর কোন বেনামদারের নামে।

সরকারী ঋণ শোধ দেবার তাড়াও থাকেনা। দু চার বছর পর বাকী দেনার দায়ে জমি দখল করে অবনীবাবু সেই বেনামদারের হয়েই, বাধা দিলেই তার সর্বনাশই হবে।

ওই ভাবে রাতের অন্ধকারে কারো ঘরেই আগুন জ্বলে উঠবে। নাহয় তাকে একঘরে করে দেওয়া হবে। দোকান ধোপা নাপিত বাজার সব বন্ধ।

এ ছাড়া গোপেনের গুণেরও শেষ নাই।

বহু বৌ মেয়ের সর্বনাশ করেছে সে কিন্তু কেউ কেলেঙ্কারীর ভয়ে, ওদের দাপটের ভয়ে কিছুই বলতে পারে নি।

ছিনাথও রেগেই ছিল।

আজ সে ব্যবসা করে বেশ কিছু জমি জায়গা করেছে। সহরেও একটা ছানার আড়ত, দুধের ডিপো করেছে। তার গরু মোষ গুলোর জন্য থাকার জায়গাও অবনীর পঞ্চায়েত এলাকার বাইরে, সেখানে এত অত্যাচার নাই।

তাই অবনীবাবুর এই অন্যায়কে সে চুপ করে মেনে নেবে না। মনে হয় অতুল ঠিকই করেছে। ছেলেটাকে সে ভালোবাসে, মুখে বকাবকি করে মাত্র।

আজও করেছে ওই সব কাজের জন্য।

অতুল বলে—চিরকাল এই ভাবেই চালাবে ও, গাঁয়ের কোন ভাল কাজ হতে দেবেনা। নিরীহ লোকদের সর্বস্ব লুঠবে, মা বোনের ইজ্জত নেবে, তাই গান বেঁধেছি।

নিধিরাম বলে, যে যা করছে করুক। তোর কি?

অতুল বলে বাড়তে বাড়তে এখন তোমার ঘাড়ে হাত দিয়েছে তবুও চুপ করে থাকবো?

ছিনাথ জানে নিধিরাম আর তার বউ ওই মা মরা অতুলকে সহ্য করতে পারে না। বৌটা মনে করে অতুল তার শরিকান, শত্রুই। তাই ওকে দেখতেও পারে না। তাছাড়া কাজকর্ম দেখে না, গান গেয়ে বেড়ায় নানা অকাজে থাকে তাই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগই রয়েছে নিধিরাম ও তার স্ত্রীর মনে।

নিধিরাম বলে—সে আমরা বুঝবো। তুই ওসবের মধ্যে একদম থাকবি না।

অতল ও শুধোয়—থাকলে?

—আমাদের শত্রুতাই করতে চাস তুই? ব্যবসায় ক্ষতি করে দেবে ওরা।

নিধিরামের কথায় ছিনাথ বলে,—এখন চুপ কর। এনিয়ে ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া করিসনা। একটা বিহিত হবেই।

তাই এসেছে ছিনাথ অবনী বাবুর কাছে।

অবনীবাবু তখন ব্যস্ত।

গোপেন এসে বলে—দেরী হবে। কাকা ব্যস্ত।

অবশ্য এটা সাজানো ব্যাপারই। অবনীবাবু নিজের গুরুত্বটাই বোঝাতে চায় ওকে।

ছিনাথ ও মনে মনে চটে উঠেছে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর এবার অবনীবাবু ওকে ভিতরে ডাকে, জানে ছিনাথ কেন এসেছে। তবু না জানার ভান করে শুধোয়।

কি ব্যাপার ছিনাথ ?

ছিনাথ ব্যাঙ্কের চিঠিটা দেখিয়ে বলে।

—টাকা সব দিচ্ছি, আর আপনিও জামিনদারির টাকা নিয়েছেন। মাঝপথে ইটা কি করলেন ?

অবনী বলে—তোমার ছেলে অতুলকে শুধোও গে।

পঞ্চজনের সামনে এই ভাবে অপমান করবে ? সকলের ভালো করতে চাই. এলাকার উন্নতির চেষ্টা করি এই আমার অপরাধ ?

দরকার নাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে, তাই ওসবে আর নাই নিজের ব্যাপার নিজেরাই বুঝে নাও।

ছিনাথ বলে

ছেলে মানুষ, করে ফেলেছে একটা কাজ।

গোপেনও এসে পড়ে, সে বলে,

—ছেলে মানুষ ! এদিকে তো দেখি ডানা পালক বেশ গজিয়েছে। এখন সামলাও গে।

ছিনাথকে জবাবই দেয় অবনী।

এখন গোপেন বলে—অতুলকে পঞ্চজনের মাঝে কাকার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে তবেই কিছু হতে পারে।

ছিনাথ জানে অতুল তেমন কোন অপরাধ করেনি। এদের লোভের সীমা নাই, অনেক চায় এরা। আরও টাকা চায় এই ভাবে মোড়ক দিয়ে। ছিনাথকে বলে গোপেন

হাজার দশেক টাকা দিলে কাকাকে বলে এসব চিঠি ক্যানসেল করাতে পারি।

ছিনাথ ব্যবসা করে খায়।

সে বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে—ভেবে দেখি।

দশ হাজার টাকা পেলে গোপেনেরও হাজার তিনেক আমদানী হবে। তাই বলে—ভেবে দেখে জানাও। তারপর চেষ্টা করবো।

ছিনাথ মনের রাগ চেপেই বের হয়ে আসে।

এতদিন ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করছে সে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও তার চেনা। সেখানেই যাবে।

ছিনাথ বের হয়ে আসতে গোপেন অবনীকে বলে।

—ব্যাটাকে দম দিয়ে কিছু টাকা বের করে নিই কাকা। তারপর অতুলকে দেখছি।

অবনী বলে—এবার তাহলে বাপটা বুঝেছে। ছেলেকে সামলাক। ব্যাঙ্ক চাপ দিলে আর ব্যবসা লাটে উঠবে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সরসীবাবু ওই ছিনাথ ঘোষকে চেনে।

সৎ পরিশ্রমী লোক। ব্যাঙ্কের দেনা ঠিকমত মাসের প্রথম সপ্তাহেই কিস্তী দিয়ে যায়।

তাকে এসে ওই সব খবর দিয়ে ব্যাঙ্কের চিঠি দেখাতে ম্যানেজ্যার অবাক হন। ছিনাথ বলে—ব্যাঙ্কের আগের ঋণ ঠিক সময়ে দিয়ে তবে একলাখ টাকা আরও নিয়েছি। তার কুড়ি কিস্তি ঠিকমত দিয়েছি—বাকীও দেব। তা সব টাকা একসঙ্গে চাইলে দোব কোথা থেকে?

ম্যানেজ্যার ডিলিং ক্লার্ককে ডেকে আনেন। তাকে না জানিয়ে একজন সম্ভ্রান্ত কাস্টমারকে এভাবে চিঠি কেন দেওয়া হলো?

কেরাণীটি এখানেরই ছেলে। ওর বাবা শীতলবাবু। ছিনাথ বলে।
—তাই বলেন স্যার।

ছেলেটি বলে—ওর জামিনদার রাজী নন।

—অবনীবাবু! ম্যানেজার বলেন—উনি রাজী না হলেও ছিনাথবাবুকে বলো তার জমি-টমি বন্ধক রাখতে পারেন জামিন হিসাবে। তার এগেন্সটেই ব্যাঙ্ক ওই লোন বহাল রাখবে।

ছিনাথ বলে—তাই দেব আজ্ঞে। বিঘে পাঁচেক জমিই বন্ধক থাকবে। দলিলপত্র এনে দিই।

তাই আনুন। ম্যানেজ্যাব বলে আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। জামিনদার লাগবে না।

ছেলেটিকে বলেন—ভবিষ্যতে এই ধরণের চিঠি কোন পার্টিকে দেবার আগে আমার কাছে ফাইল দেবে। গ্রামের ওইসব গ্রাম্য প্যাঁচগুলো ব্যাঙ্কে বসে চালানো যাবে না। তোমাকে এখান থেকেই বদলি করা হোল তুমি বর্ধমান সদরের ব্যাঙ্কেই যাতে যাও তার ব্যবস্থা করছি।

আঘাতটা করতে গেছল ছিনাথকে অতুলের ওই দুঃসাহসের জন্য। এই কাজে শীতল মাস্টারই প্রধান হোতা। সেই রাতে অবনীর বাড়িতে বসে শীতলই বলেছিল অবনীকে খুশী করার জন্য।

—একটা ঘা মারার ব্যবস্থাই করেছি ছিনাথকে তাহলেই অতুল ঠাণ্ডা হবে।

তারপরই ব্যাঙ্কের জামিনদারী ক্যানসেল করে চিঠি দেয় অবনী। আর শীতল তার ছেলেকে দিয়ে সরকারী ম্যানেজ্যারকে দিয়ে ছিনাথকে ওই নোটিশ ইস্যু করায়।

অবনীবাবু ছিনাথকে চাপ দিয়ে আরও টাকার দাবী করায় ছিনাথ ব্যাঙ্কে

গিয়ে নতুন ম্যানেজ্যারকে ধরে ওর ঋণও বহাল রাখে আর ম্যানেজার এসবের মধ্যে দুর্নীতির গন্ধ পেয়ে শীতলবাবুর ছেলেকেই বদলি করে দিয়েছে বর্ধমানে।

শীতলমাস্টার এবার বিপদে পড়ে। ছেলেটা ঘরের খেয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা পাচ্ছিল এখন সহরে গিয়ে মেসে হোটেলে থেকে চাকরী করতে হবে। হাজার দু আড়াই টাকা মাসে লোকসান।

শীতল ছুটে আসে অবনীবাবুর কাছে। বলে,

—এযে আমারই আছোলা বাঁশ হয়ে গেল প্রধান মশায়, ওই কেসে ছেলেটাকে বদলিও করে দিল আর ছিনাথের ঋণও বহাল করে দিল ম্যানেজার।

অবনী অবাক হয়।

ওটা তার এক্তিয়ারের বাইরে। বরং অবনীবাবুই ম্যানেজারের কাছে নানাভাবে উপকৃত। তার নার্সিংহোম, ধানকল, কারখানার অনেক টাকা ঋণ রয়েছে ওই ব্যাঙ্কে।

ওকে বলার কোন সাধ্যই নেই! ম্যানেজারকে চেনে অবনী। কড়া লোক। এটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

এখন বলে—তাইতো হে শীতল। দেখছি ম্যানেজারকে বলে। এখন হুকুম মানুক, তারপর বলে কয়ে ফিরিয়ে আনবো তোমার ছেলেকে এদিকের ব্যাঙ্কেই।

শীতল চুপ করে যায়।

তার রাগটা বেশী পড়ে ওই অতুলের উপরই। ওই ছেলেটার জন্য তারও এতবড় ক্ষতি হয়ে গেল।

আর গ্রামের প্রতিপক্ষের মধ্যেও খবরটা বেশ ডালপালা গজিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হাটতলায় কারা বলে।

—মাস্টারের ব্যাটাও বাবার পথ ধরেছে হে, ব্যাঙ্কে জালিয়াতি না কি করেছে। তাই হটিয়ে দিয়েছে এখান থেকে।

শীতলও শোনে কথাগুলো।

আজ গ্রামের মানুষদের চোখে মুখে দেখেছে শীতল নীরব ঘৃণায় ছায়া। ততই বুঝেছে এবার নিজেদেরও সাবধান হতে হবে। তাই অবনীবাবুর বটবৃক্ষের তলেই তত নিবিড়ভাবে সে আকৃষ্ট হয়েছে।

শেঠ মুকুন্দরাম এই মুলুকে এসেছিল লোটা কম্বল সম্বল করে। প্রথম-দিকে সে সহরে তাদের জাতভাই কোন মাড়োয়ারীর গুদাম থেকে কাপড় নিয়ে ঘাড়ে করে দোকানে দোকানে দিয়ে যেতো। ক্রমশঃ তার থেকেই কিছু আমদানী করে এখানের হাটে একটা দোকানও করেছিল।

সেই সময় থেকেই মুকুন্দরাম দেখেছিল মিত্র বাবুদের বোল বোলাও আর

থাকবে না। জমিদারী ফোত হলে ওরাও ফোত হবে।

আর তখন ব্যবসাদারদেরই দিন আসবে। তাই তখন থেকেই মুকুন্দ অবনীশবাবুর সঙ্গেই বেশী মিশতো। তাকেই বলে ওই সব ডাঙ্গাজমি যা পথের ধারে পড়ে আছে সেগুলো জমিদারী সেরেস্তা থেকে বন্দোবস্ত করে নিতে।

হেসেছিল অবনী—ওখানে ঘাস হয় না মুকুন্দ, ওসব ডাঙ্গার দাম কি?

—তাহলে আমাকেই বন্দোবস্ত করিয়ে দিন!

অবনীর চেষ্টায় তার পিতৃদেব ওই পতিত পঞ্চাশ বিঘে ডাঙ্গা মুকুন্দরামকে পাইয়ে দেয় অবশ্য তারজন্য মুকুন্দ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল অবনীকে।

ক্রমশঃ তার দোকানও চলতে থাকে।

মুকুন্দ এছাড়াও সহরে চিটেগুড়—ধান চালের আড়ত খোলে। ক্রমশঃ লক্ষ্মী আসতে থাকে।

ছেলে গিরিধারীকে সে বাঙালীবাবুদের মতই মানুষ করেছে। গিরিধারী জন্মেছে এই দেশেই। এখানের স্কুলে পড়েছে—ততদিনে মুকুন্দর সহর, গ্রামের ব্যবসাও জমে উঠেছে। গিরিধারী মোটামুটি সাধারণভাবে পাশ করে হায়ার সেকেন্ডারী।

মুকুন্দর মাথাটা খুবই উর্বর। সব সময়ই সে নানা হিসাব করে চলে। এখানে ছেলেকে ভালোভাবে পড়াতে পারবে না। ছেলেকে ডাক্তার করার সখ ওর ঘরবালীর। কিন্তু এখানে ওই নম্বর নিয়ে, ডাক্তারীতে বসাই যাবে না।

তাই তার স্ত্রীই বলে—দেশে মামাজীর কাছে যাও।

তার মামাজী কোন মন্ত্রীর পি-এ। বেশ নাম ডাক ওদেশে। তাই মুকুন্দ গিয়ে মামাজীকেই ধরে, আর তার একবন্ধু তখন হরিয়ানার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। তার এক ভাইঝি চন্দ্রা গলায় লেগে আছে কাঁটার মত।

সেই বন্ধুই মামাজীর কথায় বলে:

—তোমার ওই গিরিধারীকে এখানের মেডিক্যালে ভর্তি করে দেব, তবে একটা সর্তে।

মুকুন্দ শুধোয় সর্তটা কি?

আমার ভাইঝি চন্দার সঙ্গে সাদী দিতে হবে ছেলের। তবে মুফত নয়। চন্দার বাবার জায়গা জমিন জায়দাদ আছে। সে সব পাবে তোমার ছেলে।

মুকুন্দ হিসাব করে রাজী হয়ে যায়।

সেই গিরিধারী এখন পাশ করে ডাক্তার হয়েছে এখানে।

হরিয়ানাতে তার ফার্ম আছে, চাষবাস হয়। আর চন্দা এখানে থাকে মাঝে মাঝে সেখানেও যায়।

চন্দা চায় গিরিধারীও সেখানেই চলুক।

তার গাঁ বসতিতেই ডাক্তারী করবে আর চাষবাস জমিন জায়গা দেখ ভাল

করবে। তাতেও কম আয় হবে না।

কিন্তু মুকুন্দরাম তাতে রাজী নয়।

সে চায় ছেলে এখানেই থাকবে। নিজে যা রোজগার করেছে তা কম নয়। এখানে নার্সিংহোমেও প্রচুর আমদানী। ধানকল, কারখানা-দোকান এসব ছাড়াও তার শহরে তেজারতির ব্যবসাও বেড়ে চলেছে।

তাই চন্দার সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ীরও বনে না।

এই নিয়ে ঝগড়াও হয়। চন্দা বলে গিরিধারীকে।

—এখানে থাকবো না আমি। চলো হিম্মৎনগরে—ওখানেও কিছু কমতি নাই আমার।

গিরিধারী স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে। তবুও অশান্তি বাড়ে। চন্দা মাঝে মাঝে হরিয়ানায় চলে যায়। কলকাতায় তার এক চাচা আছে সেখানেও চলে যায়।

গিরিধারী বুঝিয়ে সুজিয়ে আনে।

চন্দা তাই স্বামীকে ঠিক ভালবাসতে পারে না। বলে।

—বাপকা গুলাম! আদমী! তুম্ পায়জামা আছে। এতই যদি বাপ মায়ের পিছু টান তো হামাকে সাদী করলে কাহে?

গিরিধারী বলে এখানে এত সব রয়েছে। ডাকদারী—

চন্দা ফুঁসে ওঠে—তুমাকে ডাকদার কোন বানালো? এইসা ঘুমছিলে সড়কছাপ লেড়কা,—আমার চাচাজী তোমাকে ডাকদার বানালো স্রিফ হামার জন্যে। বেইমান কাঁহিকা—

চটে ওঠে গিরিধারী স্ত্রীর উপর, গর্জে ওঠে।

—থামবে তুমি? খুব বড়লোকের মেয়ে দেখা আছে।

—হ্যাঁ। তোমার বাপের মত আমার বাবা ফেরেববাজ নয়। তোমার বাবা তো মক্ষীচুষ আছে।

এবার রেগে ওঠে শাশুড়ীই। স্বামীনিন্দা শুনে সে শাসায়।

খামোস হো যাও বহু।

চন্দাও বলে—তোমার ছেলেকে বলো ওসব বাত। ওসব ফালতু বাত হামি মানে না।

এই নিয়েই ঝামেলা বাধে শাশুড়ি বৌ এর মাঝে।

গিরিধারী বের হয়ে চলে আসে, কোথায় যাবে জানে না। শেষ অবধি অবনীবাবুদের এখানেই আসে।

এখানে ওর অবারিত দ্বার। লক্ষ্মী বলে।

—এসো বাবা। ওরে লতু—কে এসেছে দ্যাখ।

লতিকা তখন হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। তার ওই বিশাল দেহযন্ত্র থেকে তখন সুর নয়—অসুরের গর্জনই বের হচ্ছে।

গিরিধারীকে দেখে চাইল।

লক্ষ্মী বলে—বোসো বাবা। নার্সিংহোম থেকে তেতে পুড়ে এলে একটু জিরোও। আমি জলখাবার আনি।

গিরিধারী বাড়িতে এই আদর আপ্যায়ণ পায় না।

চন্দা তো তার উপর মারমুখী হয়ে আছে। আর তার সঙ্গে তাল রেখে ওর মা শেঠানীও বিশাল দেহ কাঁপিয়ে গর্জন করে।

—তোর মত বহুকে ঝেঁটিয়ে ঠান্ডা করে দেবার হিম্মৎ রাখি।

চন্দাও রুখে ওঠে—এসো দেখি ক্যামন হিম্মৎ।

মাও ছেলেকেই বলে—তোর বহুকে সামলা। নিজের আওরৎ কে সামাল করতে পারে না সে ক্যামন মরদ।

বাড়িতে এই চলে দিন রাত।

তাই গিরিধারী চলে আসে এখানে।

জলখাবার এনেছে লক্ষ্মী। বাড়িতে খাওয়াও হয়নি। লুচি বেগুন ভাজা সঙ্গে একবাটি ক্ষীর, সন্দেশ। গিরিধারী তৃপ্তিভরে খাচ্ছে।

লক্ষ্মী বলে—লতু। গান টান শোনা। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লতিকারও ভালো লাগে গিরিধারীকে।

মোটকা মেয়েটাকে দেখেছে আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যেই তার বন্ধুরা তাকে কেউ মুটকি, কেউ বলে স্টীম রোলার।

লতিকা দেখেছে দু একজন ছেলেও হাসাহাসি করে তাকে দেখে।

কিন্তু গিরিধারী তা করে না। তার গান শুনে একমাত্র সেইই বলে - খুব বড়িয়া গাও তুমি। বহুৎ মিঠা আওয়াজ।

লতিকা ওর কথার মধ্যে কি যেন অনুপ্রেরণা পায়। মনে হয় তার পৃথিবীটা কেমন সবুজ, সুন্দর, পাখীর ডাকে ভরা।

শান্ত পুকুরের জলে একটা ঢিল পড়লে আলোড়ন তোলে—ক্রমশঃ তার চারপাশের ঢেউগুলোও ছোট থেকে বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তারিত হয়।

তেমনি অতুলের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই আধলাইট যে গ্রামে এতটা সোরগোল তুলবে তা ভাবেনি অবনী, গোপেনের দল।

এর পরই ঘটে যায় ছিনাথের কেসটা। গ্রামের সকলেই জেনেছে অবনী ওই খানেই শান্ত হয়নি। অতুলকে শাস্তি দেবার জন্য তার বাবা ছিনাথের উপর এই আক্রমণ করেছিল। আর এটার সঙ্গে যে শীতল মাস্টার জড়িত তাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। ছিনাথের লোনও হয়ে গেছে। বরং বদলি হয়ে গেছে শীতল

মাস্টারের ছেলে এই চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য।

সাধারণ মানুষও এবার অবনীর ষড়যন্ত্রের খবরটা পায়।

তারই প্রতিফলন ঘটে স্কুলের ইলেকশনে।

অবশ্য মদনবাবু এবার এগিয়ে এসেছে। নরেশবাবু, ভবতোষবাবু, নির্মলবাবুরা চান স্কুলের কমিটিতে এবার লেখাপড়া জানা মানুষই আসুক, যারা স্বার্থপর মানুষের ষড়যন্ত্র থেকে স্কুলকে বাঁচাতে পারবে।

গোপেন অবশ্য কাকার হয়ে স্কুলের গার্জেনদের বাড়ি বাড়ি চক্কর দিচ্ছে। শীতল মাস্টার ইদানীং একটু মিইয়ে গেছে, তবু বেশ জানে এবার ইলেকশনে অবনীবাবুকে জেতাতেই হবে। কারণ নরেশবাবুও এখন তাদের এই স্কুল ফাঁকি দিয়ে সমবেতভাবে কোচিং ক্লাস করাতে আপত্তি জানাচ্ছেন। ভোটে জিতে ওকে টাইট দিতে হবে।

দরকার হয় ছাত্রদের দিয়ে গোলমাল বাঁধিয়ে আন্দোলন ধর্মঘটই করাতে হবে নরেশবাবুকে তাড়াবার জন্য। তাই স্কুল কমিটিকে হাতে চাই। শীতল, নন্দবাবুরাও শিক্ষকদের কাছে আবেদন রাখছে।

অবনীবাবুও বসে নেই। গদিব মোহ কে ছাড়বে?

তাই মদন মিত্র বাবুর নামেও হাওয়ায় অনেক বদনাম ছড়ায়।

ভোটের সময় ঠিক ব্যাপারটা বোঝা যায় না। যে যার ভোট বাক্সে দিয়ে আসছে। অবনীবাবু বাইরের বারান্দায় বসে। নরেশবাবু, ভবতোষবাবু, স্কুলের রিটায়ার্ড প্রধান শিক্ষক নির্মলবাবুও আছেন।

ভোটের ফল যখন প্রকাশিত হল দেখা গেল, এতদিন ধরে থাকা স্কুল কমিটির অনেক মেম্বারই ধরাশায়ী হয়েছেন।

এবং অবনীবাবু, গোপেনও গেছে। শীতলবাবু কোনমতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে টিকে গেছে। বাকী সবাই এসেছে ভবতোষবাবুদের দল থেকে।

অবনীবাবু কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না। বলে—সেকি হে? কি বলছ মাস্টার?

শীতলবাবু বলে—আজ্ঞে গাঁয়ের লোক বেইমানী করেছে।

অবনী চুপ করে থাকে। গোপেন বলে—ব্যাটাদের দেখে নোব। এক একটাকে এবার তুলোধোনা করবো।

অবনী রেগে বলে—থামতো তুই। সেদিন ওই আসরের মধ্যে বোকার মত অতলোকে মেরে তুই যে ভুল করেছিস এসব তারই ফল। মশা মারতে কামান দাগতে গেলি। ওরাও এবার রুখে উঠেছে। বুঝলি গোপেন—দিনকাল বদলাচ্ছে। বেশী মস্তানি করবি না। যা করবি ভেবেচিন্তে চুপচাপ কৌশলে করতে হবে।

কি করবে তাই ভাবছে অবনী।

এবার তার মনে ভয় ঢ্কেছে। অবশ্য পঞ্চায়েতের ভোটের দেরী আছে। কিন্তু যে ভাবে এরা মাথা তুলছে তাতে বিপন্নই বোধ করে সে। এবার গদি ধরেই না টান দেয়।

স্কুলে তার প্রাধান্য চলে গেল। আর এর জের না বেড়ে চলে।

এমনি দিনে ভবতোষবাব্র কাছে খবর আসে সরকার থেকে গ্রামীণ হাস-পাতাল এবার তৈরী হয়েছে স্তরাং ওটাকে চাল্ করতে হবে।

নরেশবাব্ ভবতোষবাব্র ওখানে যায়।

তাদের হাসপাতাল কমিটির মিটিংও হয়। অতুল এখন আবার প্রো দমে এদের সঙ্গে কাজে নেমেছে।

অবশ্য স্কুলের ভোটেও সে গায়ে, পায়ে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে অভিভাবক-দের কাছে গেছে। শিক্ষকদের অনেককেই বলেছে। তারা ওই ঢিল খাওয়া মাথা দেখেই অবনীর বির্দ্ধে ভোট দিয়েছে। এবার এলাকার মান্ষদের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।

হাসপাতালের উদ্বোধন হবে। ডাক্তারও আসছে কলকাতা থেকে। আর নার্স, অন্য কর্মচারীদেরও ব্যবস্থা হবে। ভবতোষবাব্ বলেন—অতুল তুই তো ম্যাট্রিক পাশ, এখানের রোগীদের খাবার, হাসপাতালের স্টক, স্টোর এসবও দেখাশোনা করতে হবে। ভালো সৎ, কর্মঠ ছেলের দরকার। সরকারী চাকরী হবে তুই থাক!

এই চাকরীর ব্যাপারে অবশ্য অবনীবাব্র একট্ আগ্রহ ছিল। তার তাঁবেদার ওই বদ্যি কবরেজের ভাই গৌরকেই সে ওখানে বহাল করতে চেয়েছিল।

তাতে অবশ্য অবনীর স্বিধাই হবে।

অবনী এখন উভয় সংকটে পড়েছে। তার নার্সিংহোম এর বিপদ ঘনাবে হাসপাতাল ভালো ভাবে চলতে দিলে। অথচ অঞ্চল প্রধান হিসাবে হাসপাতাল কমিটিতে ও যে আছে। আর প্রকাশ্যে এই কাজে কোন রকম অসহযোগিতা প্রকাশ পেলে সারা এলাকার মান্ষের রাগ পড়বে তার উপর।

এদিকে স্কুল কমিটিও বের হয়ে গেছে অবনীর হাত থেকে। মনমেজাজ ভালো নাই। এবার হাসপাতালও কৌশলে দখল করতেই হবে খ্ব গোপনে।

তাই গৌরকে ওই চাকরীতে বসাতে চায় সে। গৌরও বেশ কারিতকর্মা ছেলে! বেকার তবে বদব্দ্ধি তার অনেক। মাথায় নানা প্যাঁচ খেলিয়ে ভোটের সময় অবনীবাব্র দলকে জেতায়। ইদানীং পঞ্চায়েতের ট্কটাক ঠিকেদারীর কাজও করে। অবনী তাকে রাস্তাঘাট-বাঁধ বাধার কাজগ্লো পাইয়ে দেয়। গৌর জানে কি ভাবে কি করতে হবে।

খই ছিটোনোর মত মোরাম ছড়িয়ে রাস্তা করে। বাঁধে মাটি কাটার মাপ উলটো পালটা করে ওভারসিয়ারদের খুশী করে বিলও পাশ করায়।

আর বাঁধের কাজ সুরু করে বর্ষার আগেই। সুতরাং বর্ষা নামলে সব মাটি কাটার চিহ্ন জলে তলিয়ে যায়। তার বাঁধ কাটার বিলও পাশ হয়ে যায়। গোপেন মারফৎ অবনীবাবুর কাছে প্রণামীও পৌঁছে যায়।

অবনীই সেদিন হাসপাতাল কমিটির মিটিং-এ নানা কাজের আলোচনা, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কার্যসূচী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। দুজন নার্স— ডাক্তার দুজন আসবে বাইরে থেকে। এখানের থেকে চৌকিদার, নাইটগার্ড আর ওই সরকারকে নিতে হবে। এছাড়া ক্যাজুয়াল কর্মীও দিতে হবে দরকার মত।

অবনীই বলে—সরকারের চাকরীটার জন্য দরখাস্ত তো পড়েছে অনেক। তবে গৌরকে নিলে ভালো হয়। ছেলেটা কাজের। নির্মলবাবু শুধোন—গৌর!

ওই গৌর কবরেজ, বদ্যিনাথের ভাই।

পরেশবাবু কিছু বলার আগেই মাধব গোঁসাই বলে—ওই পঞ্চায়েতের ঠিকেদারী করার মতই ও হাসপাতালেও খেলা দেখাবে। পথ না করে, বাঁধ ঠিকমত না করেই টাকা মারে, সে হাসপাতালে এলে রোগীদের ভাত মারবে! ফাঁক করে দেবে সব। লাটে তুলে দেবে। সকলেই হেসে ফেলে।

অবনী রেগে যায়। তবে প্রকাশ্যে সে কিছুই প্রকাশ করে না। ভবতোষ বলেন—ওসব পরে ভাবা যাবে। আরও কিছু টাকা চাই। নার্সদের কোয়ার্টার হয়েছে। একজন ডাক্তারের কোয়ার্টারও হয়েছে। তবে অন্য ডাক্তার একজন আসবেন তারও তো কোয়ার্টার তৈরী করতে হবে, না হলে থাকবেন কোথায় তিনি? এটার ব্যবস্থা না হলে হাসপাতাল উদ্বোধন করাই যাবে না।

তাই হাজার পঞ্চাশ টাকার দরকার।

টাকার কথা আর সমস্যার কথা শুনে খুশী হয় মনে মনে অবনীবাবু। সে বলে—ভবতোষবাবু, অঞ্চল অফিসে যেতে হবে। আমি উঠছি।

—কিন্তু এই সমস্যা—

মনে মনে অবনী চায় সমস্যা ওদের বাড়ুক। তবে মুখে বলে।

—ওর জন্য আপনারা রয়েছেন ঠিক ঠাক করুন। আমি আসি।

অবনী উঠে পড়ে জরুরী জনসেবার কাজ দেখিয়ে।

নরেশবাবু বলে—তীরে এসে তরী ডুববে? কোয়ার্টারের অভাবে সব আটকে যাবে।

গগন ডাক্তারও মিটিং-এ ছিল। তার বাইরের বাড়িটা এমনিই পড়ে আছে তার ঢোকার পথও আলাদা। বেশ সাজানো বাগান ঘেরা বাড়িটা। চন্দনা ঠিক ঠাক রেখেছে! ওটা খালিই থাকে।

গগন বলে—কোয়ার্টার যতদিন তৈরী না হয় আমার বাইরের বাড়িটা তো খালিই পড়ে আছে। হাসপাতালের কাছেই, ডাক্তার তো এখানেও থাকতে পারে। পরে পশ্চাতে না হয় বাসা তৈরী হলে চলে যাবে।

কথাটা ভবতোষবাবুরও মনে ধরে।

নরেশবাবুও বলেন—আপনি দেবেন থাকতে ?

গগন বলে—হোমিওপ্যাথী হলে ভাবতাম আমার ভাতে না হাত দেয়। ও সব আসুরিক চিকিৎসা করা লোক হোমিওপ্যাথীর কিস্সুই জানে না। তোমাদের সুরাহা হবে বলছো – কেন দেব না ?

ভবতোষও দেখেছেন বাড়িটা। সবকিছুই আলাদা আর হাসপাতালের খুবই কাছে। রাস্তার ওপরেই।

পরেশবাবু শুধোন—ভাড়া কত নেবে মাসে ?

গগন চমকে ওঠে—অ্যাঁ-ভাড়া। বাড়ি ভাড়া তো দিই না। গাঁয়ের কাজে যদি লাগে তাই দিচ্ছি। থাকুক তোমাদের ডাক্তার যতদিন খুশী। আমার ঘরগুলোও ব্যবহার হবে, ঠিক থাকবে।

ওরা সকলেই রাজী হয়ে এবার উদ্বোধনের দিন ধার্য করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জেলার ডি-এম-ও, মহকুমার ডাক্তার গণ্যমান্য লোকজন আসবেন তারই আয়োজন সুরু হয়।

অবনী ভেবেছিল ওদের ওই ডাক্তারের গৃহসমস্যার জন্যই পিছিয়ে যাবে। আর ততদিনে আগাছায় ভরে যাবে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। আর রাতের অন্ধকারে গোপেনের দলই দরজা জানলা সব খুলে শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে। তাহলেই হাসপাতাল আর খুলবে না।

অঞ্চল অফিসে বসে কাজ করছে সে। এমন সময় গৌরই এসে খবর দেয়। ওদের ডাক্তারের বাসাও ঠিক হয়ে গেছে। এবার উদ্বোধন হচ্ছে হাসপাতালের।

গোপেন শুধোয়—সেকি। পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠে গেল ?

গৌর বলে—টাকা পরে তুলবে। এখন ডাক্তার এসে থাকবে ওই হ্যানিম্যান সাহেবের বার বাড়িতে।

—গগন ডাক্তারের ওখানে ? অবনীবাবুও অবাক হয়। অর্থাৎ ওই গগন ডাক্তারকে ওরাই রাজী করিয়েছে। গৌর আরও জানায়—ওই গগন নিজে থেকেই বলেছে।

গোপেন কি ভাবছ। অবনীকে বলে।

—একটু ব্যাপারটা বুঝতে দাও কাকা। দেখি কি করা যায়।

অবনী ভাবনায় পড়েছে। গৌরকে ওখানে ফিট করতে পারলে তার সুবিধা হতো। গৌর নিপুণ চোর। ঠিক হিসাব করেই এইসা চুরি করতো যে হাসপাতালকে ডকে তুলে দিত।

কিন্তু ওর সেই মতলবটাও বানচাল করে দিল। আবার বাসার সমস্যাও মিটে যেতে এবার অবনী চিন্তিত হয়। তবু গোপেনকে বলে—মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করবি। গোপেনও তা জানে। বলে সে।

—এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না কাকা।

কুসুম সন্ধ্যাবেলাতে চন্দনার কাছে আসে। এখন সেও পড়াশোনা করে।

চন্দনা একাই ঘরে রয়েছে। একটু আগে কলেজ থেকে ফিরেছে বাসে। রবি ডাক্তার বলে—তাহলে যাই চেম্বারে ঘুরে আসি। বুঝলি, ওই নরেশববাবুদের বললাম—বার বাড়িতে ডাক্তার এসে থাকবে।

চন্দনা বলে—বার বাড়িটা ছেড়ে দিলে বাবা?

—নারে। ভাড়া দিচ্ছি না। গাঁয়ে হাসপাতাল হবে, ডাক্তার আসবে বাইরের লোক, থাকতে পাবে না? তাই দিলাম। তবু কাজে লাগবে।

চন্দনাও বলে—তা ভালোই করেছো।

গগন ডাক্তার বের হয়। চন্দনা বলে—দেরী করো না।

না-না। দেরী হবে না।

চন্দনা জানে কুসুম এসে পড়বে।

হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে সামনেই গোপেনকে দেখে চাইল।

—আপনি?

গোপেন দেখছে চন্দনাকে। মেয়েটা যে এমন সুন্দরী হয়ে উঠেছে খেয়াল করে নি। আবছা আলোয় কেমন রহস্যময়ী বলেই বোধ হয় চন্দনাকে।

নিটোল যৌবনমদির দেহের রেখাগুলোও সোচ্চার।

—কিছু বলবেন? চন্দনাই শুধোয়।

গোপেনের হুঁস ফেরে! বলে সে ডাক্তারবাবু আছে?

—বাবা তো চেম্বারে।

গোপেন বলে—তাহলে কথাটা তোমাকেই বলে যাই। পাট কোম্পানীর এক অফিসার এখানে আসতে চায়। অবশ্য তোমাদের লাভই হবে। মাসে দুশো টাকা—চাপাচাপি করলে আড়াইশো অবধি উঠতে পারে। ভাড়া পাবে মাসে মাসে। বাইরের বাড়িটা যদি ভাড়া দাও। পড়েই তো আছে ওটা। মাসে এতগুলো টাকা আসবে। আর শ পাঁচেক টাকা রেখে এই রসিদে সই করে দাও—ব্যস, ডাক্তারবাবুরও হাতে কিছু টাকা আসবে। সরকারী পাট অফিসার—কড়কড়ে টাকা।

চন্দনা কি বলবে ভাবছে। একা এসময় ওকে এখানে দেখে ভয় ত হয় তার। জবাব দিলে যদি চটে ওঠে। এমন সময় কুসুমের গলা শুনে চাইল চন্দনা।

কুসুম ঢুকছে, সে সবই শুনেছে। তাই বলে।

—এবার পাট কোম্পানীর দালালিও করছ নাকি গো গোপেনবাবু? আর কত লীলে খেলা দেখাবে গো?

গোপেন ওই মুখরা মেয়েটাকে দেখে চাইল।

—তুই! এখানে?

কুসুম বলে—তুমরাই বলো গাঁয়ের গেজেট আমি, তা সন্ধ্যেবেলায় ইখানে এসে টাকা দেখাবে আমি জানবো নাই?

এবার চন্দনা ওকে দেখে সাহস পেয়ে বলে,

—বার বাড়ীটা ভাড়া তো দেব না আমরা।

বাবাকে বলো—পড়ে আছে। এতগুলো টাকা ছেড়ে দেবে? নগদ টাকা। মা লক্ষ্মী।

চন্দনা বলে ওটা দেওয়া যাবে না! দিতে পারলে ভালোই হতো আমাদের তা জানি। কিন্তু আর দেওয়া যাবে না। আপনি আসুন।

চন্দনা গোপেনের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দেয়। গোপেন চুপ করে বের হয়ে আসে। মনে হয় একা থাকলে মেয়েটার ডাঁট সে ভেঙ্গে দিত। কিন্তু কুসুমের মত দজ্জাল মেয়েকে গোপেন এড়িয়ে চলে।

ও মেয়েটাকে বিশ্বাস নাই।

তাই সরে এল। বেশ বুঝেছে ওরা জেনে শুনেই ডাক্তারকে থাকতে দেবে। তাই এই টাকার ব্যাপারটা ও এড়িয়ে গেল। অবশ্য কোন অফিসার আসছে না। গোপেন টাকা গছিয়ে রসিদটায় সই করাতে পারলে ডাক্তারের কোয়াটারের সমস্যাটাকে প্রকট করে তুলতে পারতো। সেই মহান কাজটা করতে দিল না ওই চন্দনা।

আর তাতে যোগ দিয়েছে ওই কুসুম।

সেও বলে—যাও গো গোপেনবাবু, হাঁ করে সাঁঝবেলায় দেখছো কি?

কুসুম আজও ভোলেনি সেই অতুলকে মারার ঘটনাটা। তারও রাগ রয়েছে ওই গোপেনের উপর। ইস্কুলের ভোটেও হেরে গিয়ে দুচারজন গ্রামের লোককে আড়ালে শাসিয়েছে গোপেন।

—তোর জমিতে জল পাস কি করে দেখে নেব।

আর গদাইকে তো চড়ই মেরে গর্ঝায়—খুব ডানা পালক গজিয়েছে?

গদাই বলে—নরেনবাবুর দয়ায় ছেলেটা পড়ছে। তুমরা তো দ্যাখনি—

—চোপ! চড়ই মেরে বসে গোপেন।

কুসুম দেখেছিল ব্যাপারটা। সেও বলে

—ভোটে হেরে গিয়ে ক্ষেপে গেলা নাকি গো গোপেনবাবু ?

গোপেন ওকেই ধমকায়। চুপ করে থাকবি ! নাহলে -

—নাহলে আধলা ইট মেরে মোর মাথা ফাটাবা, না ?

গোপেন বলে—ব্যাটা অতুলের জন্যে দেখি খুব দরদ।

—নাতো কি তোমার মত চামারের জন্যে দরদ হবে ? তুমি তো কাকার পা চাটা দু নম্বরী মাল। অতুল সাচ্চা আদমী।

গোপেন গর্জায়—বেশী বাড়িস না। গোপেনকে চিনিস নি।

কুসুমও বলে তোমার মুরোদ দ্যাখা আছে। যাও তো। গোপেনের উপর মেয়েটার রাগ রয়েছে।

আজ এমনি সন্ধ্যা বেলায় গোপেনকে এখান থেকে বের হয়ে যেতে দেখে কুসুম ওর পিছু নেয়।

চন্দনা বলে কোথায় চললি !

—আসছি গো। এলাম বলে !

কুসুম অন্ধকারে গলিপথ দিয়ে চলে যায় হন্ হন্ করে।

গোপেন বেশ অপমানিত বোধ করে। ডাক্তারের মেয়েটা তাকে বসতেও বলেনি। এতগুলো টাকার লোভ দেখালো তাও সাড়া দেয় নি। গোপেনের রাগটা ওর জন্যই। ওই মেয়েটাকে একদিন উচিত শিক্ষাই দেবে সে।

সাইকেল নিয়ে চলেছে গোপেন। ভিতরে জ্বালাটা টগবগ করে ফুটছে। হঠাৎ অন্ধকারে সপাটে এসে কপালে লাগে ইটখানা। আধলা ইটটা ওপাশের ঝোপের ওদিক থেকে কে নিপুণ লক্ষ্যে ছুঁড়েছে আর এক নজর দেখেছিল আবছা ঝোপের ওদিকে চলে যায় কে ইট মেরেই।

অতর্কিতে মোক্ষম আধলার চোট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে কপাল ধরে সাইকেল সমেত উঁচু রাস্তা থেকে পাশের পানাপুকুরেই সশব্দে আছড়ে পড়ে গোপেন।

ভাদ্র মাস। এসময়ে পুকুরের ধারের তাল গাছ থেকে পাকা তাল সশব্দে জলে পড়ে। তাল পড়েছে মনে করেই দুটো ছেলে ছুটে আসে। তাদের একজন বলে

—তাল এতবড় লয় রে—

—ওই তো কালো মত !

ক্রমশঃ লোকজন জুটে যায়। হ্যারিকেন, টর্চও এসে পড়ে। তারাই উদ্ধার করে গোপেনকে। তখন কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। সাইকেলও উদ্ধার হলো জলের তল থেকে লগি দিয়ে খুঁচিয়ে সন্ধান করে।

সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে দত্তগড়ের পচা পুকুরে গোপেনবাবুকে কারা

মেরে ফেলে দিয়েছিল। নার্সিং হোমে খবরটা পেয়েই ছুটে আসে অবনীবাবু, শীতল মাস্টার, গৌর কব্‌রেজ আরও অনেকে।

শীতলও ভয় পেয়ে যায়, বলে

—এসব ইট পাটকেল মেরে এভাবে ঘায়েল করলো গোপেনকে।

অবনীবাবু বলে—থানাতেও খবর দাও। ডাইরী করানোর দরকার।

অবশ্য খবর দিতে হয় না। থানার দারোগাও খবর পেয়ে এসে পড়ে। নার্সিং হোমের বেডে তখন গোপেন, মাথায় ব্যান্ডেজ। গিরিধারী ডাক্তার এন্টি টিটেনাস ইনজকেসনও দেয়।

দারোগাবাবু শুধোন—কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন ওদের গ্যাং-এর ?

গোপেন এর থুতনিতেও লেগেছে সাইকেল সমেত পড়ার সময়। সেখানেও কেটেছে, সেলাই করতে হয়। তাই বাক্য বন্ধ। আসল আসামীকে দেখা যায়নি।

আসল আসামী তখন রবি ডাক্তারের বাড়িতে মন দিয়ে সেলেটে অ—আ—ক—খ লিখছে নিরীহ ছাত্রীর মত।

একটু আগে অন্ধকারে বের হয়ে গিয়ে কি কর্ম করে এসেছে তার ছাত্রী তা চন্দনাও জানে না।

গগন ডাক্তার একটু পরেই ফেরে। হাটতলাতেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধকারে গোপনকে কে ইঁট মেরে পুকুরের জলে ফেলে খুনই করতে চেয়েছিল। নেহাৎ লোকজন জুটে যেতে পারেনি। ওকে ইঁট মেরেই পালিয়েছে। এখন গোপেন নার্সিং হোমে রয়েছে। কপাল ফেটেছে—আরও কোথাও চোট লেগেছে।

চন্দনা অবাক হয়—সে কি ? ও তার একটু আগেই এখানে এসেছিল।

কুসুম বলে—টাকা দিয়ে তোমার বার বাড়ি ভাড়া নিতে এয়েলো কুন পাট অফিসারের জন্যে।

—সে কি ! এখানে কি করবে ? গগন বলে।

চন্দনা বলে—ওসব ভেজাল আমি হটিয়ে দিয়েছি। ওদের সংস্পর্শে থেকো না বাবা।

গগন ডাক্তার নিরীহ মানুষ। সে বলে—না মা। ওসবে নাই। কিন্তু গাঁয়ে যা শুরু হলো। সেদিন অতুলকে কারা মারলো। আজ আবার গোপেনকে। গাঁয়ের শান্তির পরিবেশই এবার নষ্ট না হয়ে যায়।

কুসুম বলে—ডাক্তারবাবু, ইঁট মারলেই পাটকেল খেতে হয়। কে জানে তাই কেউ ঝেড়েছে কিনা দ্যাখো গা।

চন্দনা বলে—সব তাতে তুই ফোড়ন কাটিসনা কুসুম। পড়া হয়েছে। যা তো খাবার নিয়ে।

কুসুম এর পর বাবার আর নিজের জন্য খাবার নিয়ে চলে যায়! আজ তার মনটা বেশ খুশী খুশী।

ফণী এর মধ্যে এক পাঁইট মদ আজ করালীর কাছ থেকে ম্যানেজ করেছে। করালী এখন ফণীকে একটু মান্য করে। হরি সাহার দোকানে গেছে ফণী।

আজ পকেটে পয়সা নাই। বৃহস্পতিবার মুদিখানার দোকান বন্ধ। দড়ির মজুরী পায় না। সে দিনটা ফণীর ম্যানেজ করতে হয় বাড়িতে চুরি চামারি করে। কুসুম এখন বাড়িতে টাকা রাখে না।

তাই ফণীও কিছুই পায় নি।

এসেছে হরি সাহার দোকানে যদি বাকীতে একটা বোতল পায়।

কিন্তু হরি সাহাও হিসেবী লোক। সে বলে—মালের দোকানে ধারবাকির হিসাব নাই ফণী। এখানে আজ নগদ কাল ধার।

ফণীও চটে ওঠে—তোকে দাম দিই না? টাকা-ধান-মায় সোনার গহনা অবধি দিয়েছি। বেইমান!

হরিও ফুঁসে ওঠে—যা তা বলবে না।

শেষে করালীই মীমাংসা করে—যেতে দাও ফণীদা, হরি একটা পাঁইট দাও ওকে আমিই দিচ্ছি দামটা।

গেঁজিয়া থেকে দলা পাকানো নোট বের করে করালী। ফণী দেখছে। করালী বলে—বোস ফণীদা।

ফণী মাল পেটে পড়তে এবার শান্ত হয়। করালীও তাক বুঝে বলে। —তাহলে কথাটা ভেবে দেখলে?

—কুন কথা?

করালী বলে—কুসুমের বিয়ের কথা। অবশ্য সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে। তবে পাত্র হিসাবে আমি মন্দ নই। দু-পয়সা রোজকারও করছি। কুসুমের ঘর হবে—তোমাকেও ফেলব না। ফণীও ভাবছে কথাটা।

তবে কুসুমকে চেনে। বললে ফোঁস করে উঠবে—ওই বুনো মোষকে বিয়ে করতে হবে? আধবুড়ো মিন্‌সেকে?

করালীর বর্ণটা যদি একটু ফর্সা হতো—তা নয়। একেবারে ভূষো কালির মত।

ফণী বলে—মেয়েটাকে চেন তো? ওকে বশ্ করেই কথাটা পাড়বো তাক্ মত। ও হয়ে যাবে। দুদিন সবুর করো।

করালী বলে—এদিকে বয়স তো বাড়ছে। সময় থাকতে বিয়ে করাই ভালো।

ফণী উত্তর দেয়—হবে। হবে।

ফণীও এবার কথাটা গভীর ভাবেই ভাবছে। যেমন করেই হোক একটা পথ বের করতেই হবে।

অতুল এখন খুবই ব্যস্ত।

হাসপাতালের উদ্বোধন এগিয়ে আসছে। তার পাকা আয়োজন—কার্ড ছাপানো, বহুত বড় প্যান্ডেল তৈরী করার কাজ চলছে।

নতুন সাজে সেজে উঠেছে হাসপাতাল।

অতুল সরকারের চাকরীটা এখনও নেয় নি। বলে—চাকরী করা পোষাবে না আজ্ঞে, বাঁধা গরুর মতন গোঁজে আটকে থাকা আমার চলবে না।

ভবতোষবাবু তাকে হাসপাতাল কমিটির সহ-সম্পাদকই করে রেখেছেন। অতুল তাই ব্যস্ত। হাসপাতালে বেড, কম্পাউন্ডার, নার্সরা এসে গেছে।

একজন ডাক্তার এসেছেন বর্ধমানের ওদিক থেকে আর একজনও এসে পড়বেন কলকাতা থেকে।

ছোট ডাক্তার বরেণবাবুও কাজের লোক। এর মধ্যে হাসপাতালকে সাজিয়ে নিয়েছেন।

ওদিকে ইনডোর—এ পাশের হলঘরে আউটডোরের রোগীদের দেখা হবে। ওষুধপত্রও আসছে। অতুল, গ্রামের আরও দু-চার জন ছেলে তাদের কাজে সাহায্য করছে।

গোপেন সেরে উঠেছে।

সে এর মধ্যে খবর টবর রাখছে। গোপেনও এবার নতুন পথ নিয়েছে। সে কাকার মতই সাবধানে পা ফেলতে চায়। তাই গোপনে সেও খবর নিচ্ছে তাকে সেদিন ইঁট কে মেরেছিল।

তার মনে হয় এটা করেছে ওই অতুলই। সেদিনের ইঁট মারার প্রতিশোধ নিয়েছে এই ভাবে। মাঠে বিরাট প্যান্ডেল হচ্ছে।

অবনী অবশ্য মাঝে মাঝে আসে। দেখাশোনা করে হাসপাতালের কাজ। সে দেখাতে চায় অপরকে যে এই সব মহৎ কাজে তার অবদানও কম নয়। তাই প্রকাশ্যে এখানে আসে, প্যান্ডেল ইত্যাদির তদারক করে ভবতোষবাবুদের সঙ্গে আলোচনাও করে।

ওদিকে স্কুলে নতুন কমিটি তৈরী হয়েছে।

এবার কড়াকড়ি শুরু হয়েছে হাজিরার ব্যাপারেও।

এতদিন শীতল মাস্টার আরও কয়েকজন শিক্ষক সকালে সন্ধ্যায় কোচিং ক্লাস করেছে একেবারে স্কুলের মত করেই।

সকালে তাদের তাই স্কুলে আসতে দেরী হয়। এগারোটা—প্রায় বারোটা নাগাদ আসে তারা স্কুলে কোচিং ক্লাশ সেরে।

নরেশবাবু বলেন—শীতলবাবু নন্দবাবু আপনাদের ফার্স্ট পিরিয়ড—সেকেন্ড পিরিয়ডে ক্লাশ নিতে হবে।

অর্থাৎ দশটায় আসতে হবে স্কুলে। শীতল বলে—

—কাজ থাকে।

—কাজ মানে কোচিং ক্লাশ তো? স্কুলে মোটা মাইনে নেবেন এখানে ডিউটি ফাঁকি দিয়ে ক্লাশ করবেন এটা কি ঠিক? কাল থেকে ফার্স্ট পিরিয়ডেই আসবেন আর পাঁচটা অবধি লাস্ট পিরিয়ডে দরকার হলে ক্লাশ নিতে হবে।

চুপ করে থাকে শীতলবাবু। বেশ বুঝেছে নতুন কমিটি হয়েই এবার আইন বদলাচ্ছে।

শীতলবাবু, নন্দবাবু ভূধর, আর একজন শিক্ষক মিলে কোচিন ক্লাশ এতদিন ভালোই চালিয়েছেন অবনীবাবু স্কুলের প্রেসিডেন্ট থাকার সময়।

সকালের দিকে বেলা বারোটায় স্কুলে এসে দুতিনটে ক্লাশ কোন মতে নিয়েই আর টিচার্স রুমে খোস গল্প করে বা রোজ বেরতো চারটা নাগাদ।

সাড়ে চারটা থেকে আবার এদিকে ক্লাশ সুরু হতো রাত্রি প্রায় আটটা অবধি।

আমদানীও ভালোই হতো তার। কোচিং ক্লাশে সাজেশন দিত ওরা—অবশ্য গোপনে তাদের ছেলেদের মধ্যেই। কোনমতে সেটা আউট হতো না।

দেখা যেত সেইসব প্রশ্নই এসেছে স্কুলের পরীক্ষায়।

ক্লাশে তারা ভাল নম্বর পেতো—আর কোচিং-এর সুনামও হতো, মায় টেস্টে সাজেশন থাকতো সেই মতই।

শীতলবাবুদের সেই সাজেশন এবার কি করে বের হয়ে আসে খোদ ভবতোষ বাবুর হাতে সেখান থেকে নরেশবাবুর কাছে আর অ্যানুয়েল পরীক্ষায় দেখা যায় অঙ্কের টিচার নন্দবাবুর প্রশ্নও তাই এসেছে।

সেদিন নরেশই ডাকায় নন্দবাবুকে তার ঘরে, স্কুলের কেশ্চেন আর তার কোচিংএর সাজেশনের কপিটা দিয়ে বলে।

—এসব কি নন্দবাবু? এভাবে আগেই কোচিংএর ছাত্রদের কাছে প্রশ্নপত্রের কপি চলে যায়?

নন্দবাবুও এবার হাতে নাতে ধরা পড়ে চমকে গেছে। এসব করতে হয় তাদের শীতলবাবুর চাপে, কোচিং স্কুলের মালিক সেইই। ওরা মাসে থোক টাকা পায় মাত্র।

নরেশবাবু বলে— কমিটির কাছে এটা প্লেস করলে আপনারই বিপদ হবে, চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

নন্দবাবু তা জানে।

বলে—আর হবে না নরেশবাবু।

নরেশ বলে, স্কুলে আটহাজারেরও বেশী মাইনে পান বাড়ির খেয়ে। কোনদিন এটা আশা করেছিলেন? তবে হাজার দেড় হাজার টাকার জন্য এসব অসাধুতা! ছাত্রদের কাছে অসৎ কেন হবেন?

নন্দলালবাবু তারপরই কোচিংক্লাশ ছেড়ে দিল। শীতলবাবুও বিপদে পড়ে। অংক আর পদার্থবিদ্যা পড়াতো নন্দবাবু তার মত একজন চলে যেতে কোচিং ক্লাশের বেশ ছাত্র কমে যায়। আর বেশীক্ষণ ধরে কোচিং ক্লাশও করা যাচ্ছে না। ফলে ওরা মনে মনে বেশ রেগেই উঠেছে।

পরীক্ষাতেও কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। শিক্ষকদেরও সিলেবাস কমপ্লিট করতে হচ্ছে, ক্লাশে ঘুরে রিপোর্ট নেন নরেশবাবু।

নির্মলবাবুও রিটায়ার করার পর অবনীবাবুর আমলে, স্কুলে দুএকবার এসেছেন। শীতলবাবুর দল বলে আড়ালে।

—বুড়োর যেন বাপের জমিদারী!

নির্মলবাবু নিজের হাতে এই স্কুল গড়েছেন। ওসব কথা শোনার পর আর আসেন নি।

কিন্তু নরেশই তাকে বলে,

—আসবেন স্যার, দু একটা ক্লাশও নেবেন।

নির্মলবাবু আসেন, ছাত্রদের পড়ান, ওরাও দেখে শীতলবাবুর পড়ানো আর নির্মলবাবুর পড়ানোর মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক। একজনের ক্লাশে ছাত্ররা ভিড় করে, নির্মলবাবুর ক্লাসে ছেলেরা মন দিয়ে পড়াশোনা করে, জানতে চায়।

শীতলবাবুর কান থাকে ঘণ্টার দিকে, কখন পিরিয়ড শেষ হবে। ছেলেরাও হাই তোলে। কেউ পিছনের বেঞ্চে হাল্কা দিবানিদ্রাই সেরে নেয়।

প্রমোশনের সময়েও এবার খুবই কড়াকড়ি হয়।

একটা সাবজেকটে ফেল করলে তাকে আটকানো হচ্ছে। আর এবার শীতলের কোচিং ক্লাশের ছেলেদের ফল খুবই খারাপ হয়েছে। স্কুলে শীতলবাবুর সাবজেক্ট ইংরাজি, অন্য টিচারদের অঙ্ক—বিজ্ঞান এসবে ফল মোটেই ভালো হয়নি।

শীতলবাবু আর তারই দলের শিক্ষক কজন যেন স্কুলে পড়ান নি, নরেশবাবু তাদের ডাকিয়ে বলেন।

—আপনাদের সাবজেক্টেই এমনি খারাপ রেজাল্ট হয়েছে। এর জন্য আপনারা কি বলবেন? যদি বলি অসহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন?

ভূধরবাবু বলে, ওরা পড়ে না স্যার।

—পড়াতে পারেন না। ঠিক মত ওদের মধ্যে পড়ার পরিবেশ তৈরী করতে পারেননি। ছাত্র ফেল করলে পুরো দোষই ছাত্রের ঘাড়ে চাপান—কিন্তু শিক্ষকদেরও দায়িত্ব কিছুটা থেকে যায় ভূধরবাবু।

শেষ বারের মত আপনাদের অনুরোধ করছি নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেবেন না।

ভবিষ্যৎ কোনদিন আপনাদের ক্ষমা করবেন না।

এদিকে জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার আর এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে। উপর থেকে নির্দেশ এসেছে সারা দেশের মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলতে হবে।

নিরক্ষরতা মানুষের কাছে অভিশাপ। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকার চেষ্টা করছেন দেশের সব মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলতে।

অবনীবাবু এবার নাকের বদলে নরুণ পেয়েছে।

গোপেনও খুশী। এই সাক্ষরতার কর্মসূচী নিয়ে এর মধ্যে জেলার মাতব্বররা পঞ্চায়েত অফিসে এসে আলোচনা করে গেছেন।

তার জন্য বেশ মোটা টাকারও বরাদ্দ হয়েছে। বইপত্র শ্লেট, হ্যারিকেন সতরঞ্চি ইত্যাদি দেওয়া হবে। প্রতি গ্রামের নারী, পুরুষ, বৌ যারা স্কুলে যেতে পারে না তাদের সন্ধ্যার পর পড়ানো হবে।

গ্রামের ছেলেরাই পড়ানোর কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দেবে। তারজন্যও কিছু অর্থও থাকবে।

গোপেন দেখে এখানে মধুর সন্ধান আছে। সেও তাই বলে।

—কাকা! এসবে ইস্কুল টিস্কুল লাগবে না। ফি গ্রামে পাঠশালায় কারো বাড়িতে পড়ানো হবে।

কর্মীদের বলে গোপেন,—ভাববেন না স্যার। গাঁকে গাঁ সাক্ষর করে দেবো রাতারাতি।

অ-ম্মা কেন এ বি সি ডি-ও শিখে যাবে বিলকুল।

অবনীও এবার নতুন উদ্যমে জাতির মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করে। গোপেনও নেমে পড়েছে শিক্ষাদান ব্রতে।

এর মধ্যে বইপত্র শ্লেট হ্যারিকেন সতরঞ্জি কেনা বাবদ লাখ খানেক টাকা থেকে হাজার চল্লিশ তার পকেটে গেছে প্রাথমিক পর্যায়েই।

গ্রামে গ্রামে নিজেদের ঘরোয়া লোকদের বাড়িতে গাঁয়ের মুনিষ, মাহিন্দার, বাগালদের, তাদের ঘরের মেয়ে বউদের জড় করে বই শ্লেটও কিছু দেওয়া হয়েছে। দু-চারজন ছাত্র আসে। তামাক খায়, গালগল্প করে হ্যারিকেনের আলোয় তারপর যে যার বাড়ি চলে যায়। সদরে রিপোর্ট যায় দারুণ গতিতে লেখাপড়ার কাজ চলছে—সবাই হামলে পড়েছে সাক্ষর হবার জন্য। আরও শিক্ষাকেন্দ্র

খোলা দরকার। আরও টাকা চাই।

টাকাও আসে। সেটা অবনীবাবুর হাত হয়ে কোন অন্ধকারে বিলীন হয় তার হিসাব মেলেনা। সাক্ষরতার কর্মযজ্ঞ কাগজে কলমে দারুন ভাবেই চলছে তাই দেখা যায়।

অমল এই প্রথম কলকাতা থেকে গ্রামে আসছে। ছোট্ট স্টেশনে গাড়িটা থেমেছে। নামে সে।

একবারে নীচু প্লাটফর্ম—দু'একটি গাছ ছায়া মেলে রেখেছে। গ্রামীন লোক—মহিলা পুটুলি নিয়ে নামালো। গাড়িটা যেন অনিচ্ছা সত্বেই এখানে দাঁড়ায় তাই দাঁড়িয়েই আবার সিটি দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে চলতে শুরু করে।

গাড়িটা চলে যেতে দেখা যায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা দোকান ঘর, টিনের শেড দেওয়া ওয়েটিং রুম বাইরে একটা গাছতলায়, কয়েকখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি রয়েছে। একটা সাইকেল রিক্সাও দেখা যায়।

বর্ষার শেষ, ধান মাঠের সবুজের গালিচা পাতা দু চারটে তাল গাছের নীচে দিয়ে একটা কর্দমাক্ত মাটির সড়ক চলে গেছে। এপাশে গেছে মোরামের একটা রাস্তা।

অমলও ডাক্তারী পাশ করে চেয়েছিল গ্রামের দিকেই কোথাও প্রাকটিশ করবে। হঠাৎ সরকারী চাকরীটা পেতে খুশীই হয়। গ্রামেই যেতে হবে কোন নতুন হাসপাতাল হয়েছে সেখানে।

বন্ধুরা বলে—গ্রামেই যাবি? সহরে থেকে যা, প্রাকটিশ জমে গেলে ভাবনা থাকবে না।

অমলের বাড়ির অবস্থা বেশ ভালই, টাকার অভাব তার নাই। পৈত্রিক ব্যবসা চার আনার অংশীদার। দাদারাই সেই বিরাট ব্যবসা—কারখানা এসব সামলায়। তাই অমলও মাকে বলে,—একজন ডাক্তার তৈরী করতে দেশের লোকের বহু টাকা ব্যয় হয় তাদের কাছে প্রতিটি ডাক্তারই কম বেশী ঋণী। সেই ঋণ শোধ করা নিশ্চয়ই উচিত মা। তাই আমাকে গ্রামে যেতেই হবে।

মা সুধাময়ীও ছেলেকে বলেন, কর তোর যা খুশী।

—অন্যায় তো কিছুই করছি না মা।

তাই মাও রাজী হন। বৌদিরা বলেন,

যাচ্ছো যাও, সেখানে কোন নারী ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়োনা। শুনেছি এখন গ্রামের মেয়েরাও সাইকেল চড়ে, কাগজ পড়ে, সহরের মেয়েদের কান কাটে।

অমল বলে—ওসব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বৌদি। এ শর্মা মেয়েদের ধারে কাছেও ঘেঁসছে না।

মেজবৌদি বলে—সে কলকাতায় আমাদের জন্যে। দূর গ্রামে একা থাকবে তাই ভাবনা হয়। শেষে হাতছাড়া না হয়ে যাও।

হাসে অমল—সে ভয় নাই বৌদি।

মা বলে, ফোন করিস।

অমল বলে—ফোন কতদূরে থাকবে জানিনা। তবে চিঠি দেব মা।

অমল এসে ধরে রিক্সাওয়ালাকে।

চিঠি দিয়েছে সে গ্রামে আজ এই ট্রেনে নামবে। ভেবেছিল নিশ্চয়ই স্টেশনে কেউ এসে তার খোঁজ খবর করবে কিন্তু কাউকেই দেখে না।

তাই রিক্সাওয়ালাকেই ধরে

—গোঁসাইগঞ্জ যাবে ভাই?

রিক্সাওয়ালা বলে, ওদিকে তো এখন যেতে পারবো না। আপনি বরং গরুর গাড়িতে করে সদর রাস্তায় যান।

—গরুর গাড়িতে। চমকে ওঠে অমল।

জীবনে গরুর গাড়িতে সে বসেনি, বলে।

—তুমিই চলো ভাই, যা লাগে দেব।

ছেলেটা কি ভেবে বলে—ঠিক আছে উঠুন, তবে অনেক পথ। বাস কখন পাবেন বড় রাস্তায়, আর যা ভিড় তাতে বাসের ছাদে উঠতেও পারবেননা মালপত্র নিয়ে—

—বাসের ছাদে উঠতে হবে?

—এখানে নীচে জায়গা থাকে না। বাইরের যাত্রীরা ছাদেই ওঠে।

—ওসবের দরকার নাই, তুমিই পৌঁছে দেবে—

—পনেরো টাকা লাগবে. অনেক পথ।

অমল বলে—তাই দেব।

রিক্সাওয়ালা মোরামে ঢালা পথে নাচতে নাচতে চলে। অমল প্রথম যাত্রাতেই বুঝেছে গ্রামের পথে চলতে গেলে দেহটাকে মজবুত করতে হবে।

তবু রক্ষে কিছুদূর এসে ওরা পিচ রাস্তায় উঠলো, বড় রাস্তা ধরে কিছুটা এসে তারপর একটা অপেক্ষাকৃত সরু পিচ রাস্তা চলে গেছে গোঁসাই গঞ্জের দিকে।

পথের ধারে পাশে দু' একটা গ্রামও পড়ে। দূর দিগন্তে যেন নীল আকাশ মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। একটা নদীর ওপর ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছে তারা—নদীর ধারে যেন সবুজ ধান খেতের পাশে কাশ ফুলের মেলা বসেছে। সাদা উত্তরী হাওয়ায় কাঁপে।

অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবছে সুন্দর এই পৃথিবীকে, কলকাতায় প্রকৃতির এই রূপ দেখেনি। এ যেন এক স্বপ্নময় জগৎ, পাখীর ডাক শোনা যায়।

ওদিকে দেখা যায় বড় গ্রাম—দু' একটা বাস চলেছে আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে।

ছাদেও প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। ওই ভাবেই এরা যাতায়াত করে।

গাড়িটা বিপজ্জনক ভাবে ছুটে চলেছে।

বড় রাস্তা থেকে এবার গ্রামের দিকে চলেছে, পথের ধারে ঘরবাড়ি হঠাৎ দেখা যায়। ছিম ছাম পাকা বাড়ির পাশে মাটির দোতলা, খড়ের চাল।

হঠাৎ একটা আওয়াজ করেই রিক্সাটা থেমে গেল।

—কি হল?

রিক্সাওয়ালা বলে—একটা চাকা ফেটে গেছে স্যার? গাড়ি তো আর যাবে না। তবে গোসাইগঞ্জ এসে গেছি।

কিন্তু যেতে হবে হাসপাতালে—

হঠাৎ একটি তরুণ এগিয়ে আসে।

—হাসপাতালে যাবেন?

চাইল অমল ওর দিকে। ছেলেটি বলে—

—ওখানে কেন?

—আমি নতুন ডাক্তার। এখানে প্রথম আসছি—

ছেলেটি যেন খুশীতে উথ্‌লে ওঠে—আরে বলবেন তো আপনিই নতুন ডাক্তারবাবু। শুনেছিলাম কলকাতা থেকে আসবেন! তা আগে পত্র দিলে যেতাম ইস্টিশানে। আসতে অসুবিধা হলো।

—আপনি? অমল শুধোয়।

আপনি আজ্ঞে করলে লজ্জা পাবো স্যার। আমি অতুল—অতুল ঘোষ। এই বলে—

সুটকেশ ব্যাগটা নিজেই ঘাড়ে নিতে অমল অপ্রস্তুত হয়।

—আপনি?

অতুলের হাতে একটা ছোট জেরিক্যান। অতুল সেইটাই ডাক্তারবাবুকে দেয়—তেল নিতে এসেছিলাম। হেসাকের তেল, বরং এটাই ধরেন এগুলো আমি নিচ্ছি। চলুন—কাছেই বাসা।

অমল রিক্সাওয়ালাকে পয়সা দিয়ে অতুলকে নিয়ে চলেছে।

একটু এসেই দেখা যায়—গ্রামের একদিকে হাসপাতাল বিল্ডিং—সামনে প্যান্ডেল। আর এপাশে রবি ডাক্তারের বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়তে বের হয়ে আসে চন্দনা।

—অতুলদা।

সঙ্গে জেরিক্যান ভর্তি নীল কেরোসিন তেল হাতে প্যান্ট সার্ট পরা একটি তরুণকে দেখে চাইল। শুধোয় চন্দনা।

—উনি?

অতুল বলে—বার বাড়ির চাবিটা নে এসো চন্দনাদি।

ইনিই নতুন ডাক্তারবাবু কলকাতা থেকে আসছেন।

—অ্যাঁ। হাতে কেরাসিন নে কলকাতা থেকে? চন্দনা হেসে ফেলে।

অতুল বলে।

—না-না। ওটা আমাদের হেসাকের জন্য। আমিই তেল আনতে গে দেখি রিক্সার চাকা ফেটে গেছে ওর।

চন্দনা বলে—গাঁয়ে আসতে না আসতেই ফাটাফাটি সুরু হয়ে গেল। চলো চাবি নিয়ে যাচ্ছি।

অমল দেখছে ওই মেয়েটিকে। বেশ চটপটে, কথার ধারও কম নয়।

অতুল ওদিকে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে।

—ডাক্তারবাবুর মেয়ে চন্দনা। কলেজে পড়ে। খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

অমল জবাব দিল না।

ততক্ষণে বার বাড়ির ঘরও খুলেছে চন্দনা।

অতুল ওকে বাইরের ঘর—শোবার ঘর, ওদিকে রান্নাঘর বাথরুম এসব দেখিয়ে বলে।

—আপনার কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে। ক'মাস লাগবে। ততদিন এখানেই থাকবেন।

চন্দনা বলে—কলকাতার লোক। এখানে তো লাইট কখন থাকে কখন যায় তার ঠিক ঠিকানা নাই। পাখাও চলবে না। ফ্রিজও আমাদের নাই। অসুবিধা হবে।

অমল বলে—না, না। পাড়াগাঁয়ে কখনও আসিনি। তবে এসে মনে হচ্ছে কোন অসুবিধাই হবে না।

অতুল বলে—হবে। এখানের ব্যাপার যতই বুঝবেন ততই দেখবেন এখানের মানুষ বেঁচে আছে কি করে। সহরের দিকেই সবাই চায় ডাক্তারবাবু, গাঁয়ের মানুষদের দিকে সহরের লোকেরা ভুলেও চেয়েও দেখে না।

ওদিকে একটা ইন্দারা। মাঝখানে দুই বাড়ির দেওয়াল। ইন্দারাটা কাজে লাগাতে পারে দুই বাড়ির লোকই।

অতুল বলে—আপনার কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য আমি ন্যাপাকে ঠিক করেছি! ওই-ই রান্নাবান্না বাজার হাট কাজকর্ম সব করে দেবে।

চন্দনা বলে—গেঁজেল ন্যাপা?

এমন সময় ঢোকে কুসুম। বলে সে।

—কবিয়ালের বন্ধু গোঁজল ছাড়া আর কে হবে বলো দিদি।

ও মা—ইনি!

অতুল বলে—একটু রেখে ঢেকে কথা বলো কুসুম। ইনি নতুন ডাক্তারবাবু কলকাতার লোক।

কুসুম বলে—বলবে তো। মালপত্র রাখেন। ঘরদোর সাফ করছি। ন্যাপাকে ডেকে আনো জল টল তুলে দিক।

কুসুম কাজে লেগে যায়। অমল দেখছে ওদের কর্মব্যস্ততা।

নিন, চা এনেছি।

অমল ওদিকে একটা চেয়ারে বসে। জানলার বাইরে মাঠ, ওদিকে একটা মস্ত বটগাছকে দেখছে। হাসপাতালের ওদিকে মাটির কর্দমাক্ত রাস্তাটা চলে গেছে গাছটার দিকে। ওপাশেই শুরু হয়েছে দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত।

অমল দেখে চন্দনা চা এনেছে।

অমল শুধোয়—ওই বটগাছটা তো বিশাল!

চন্দনা বলে—ওটা বহুদিনের পুরোনো গাছ। ওর নীচেই গ্রামের রুদ্রপাল শিবের মন্দিরও রয়েছে।

—গ্রামটা বেশ বড়, না?

চন্দনা বলে—তা বলতে পারেন। এখন সহরের ছোঁয়া লেগে এর বাইরেটা বদলেছে। তবে ভিতরে সেই গ্রাম্য রাজনীতি, দলাদলি—এক শ্রেণীর দাপট সবই রয়েছে।

—এই যে এসে গেছ তাহলে? তুমি বলে ফেললাম—কিছু মনে করো নি তো?

ঘরে ঢুকেছে শীর্ণকায় লম্বা একটি ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচা পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, পায়ে কেডস, ধুতি পাঞ্জাবীর সঙ্গে ওই কেডস কেমন গ্রাম্য ছাপই এনেছে।

অমল দেখছে বয়স্ক ভদ্রলোককে।

ততক্ষণে অতুল বেঁটেখাটো ন্যাপাকে নিয়ে ফিরেছে।

বলে অতুল—ডাক্তারবাবু ইনি গগনবাবু—মস্ত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। হাটতলায় এঁর চেম্বার। উনিই আপনার জন্য এই বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছেন।

অমল বয়স্ক ভদ্রলোকের গলায় পৈতাও দেখে। কি ভেবে প্রণামই করে। গগন ডাক্তার খুশীতে গদগদ্ হয়ে বলে।

—আরে এসব কি। আাঁ, কলকাতার ছেলেরা শুনি পেন্নাম টেন্নামের ধার ধারে না। তুমি দেখছি এসব মানো—বাঃ।

না। তোমার হবে। বিদ্যাং দদাতি বিনয়ম। আসুরিক চিকিৎসা শিখেও অসুর হওনি হে—তুমি দেখছি এখনও মানুষ আছো।

হাসে অমল। ডাক্তার বলে।

—ওসব আসুরিক বিদ্যা হে। এ চন্দনা—এটি আমার মেয়ে।

অমল বলে—অতুলবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

গগনবাবু বলে—তোমার নামটা?

নাম বলে অমল। গগন ডাক্তার বলে।

—যতদিন রান্নার ব্যবস্থা না হয়, আমার ওখানেই ডাল ভাত চারটি খাবে। ভালোই হলো—স্বজাতি, ব্রাহ্মণ।

অমল বলে—আবার আপনাদের অসুবিধায় ফেলবো।

ওই লোকটিই যা হোক করে দেবে—

গগন ডাক্তার দেখছে ন্যাপাকে। বলে—

—ন্যাপা করবে রান্না আর তুমি খাবে? দুদিনেই তাহলে ভবতোষ বাবুদের নতুন ডাক্তারের খোঁজ করতে হবে।

ও হাসপাতালেই থাকবে—আমি দেখছি অন্য কাউকে যদি মেলে।

অতুল বলে—ততদিন এখানে অন্য কাজগুলো করবে।

—তা করুক। তবে গাঁজার গন্ধ পেলে আউট করে দেব ব্যাটাকে।

হোমিওপ্যাথি ওষুধের সব গুণ ওই গাঁজার ধোয়ায় ফিনিশ হয়ে যায়। খুব হুঁসিয়ার ন্যাপা। গাঁজা খেতে হয় ওই রুদ্রপাল তলায় গে টেনে আসবি।

অমল, তুমি স্নান টান করে নাও। এতটা পথ এলে, খেয়ে দেয়ে একটু রেস্ট নাও। ওবেলাতেই ওরা সব আসবে।

বেশ ঘটা করেই হাসপাতালের উদ্বোধন হয়ে গেল। জেলা সদর থেকে ডি. এম, ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার, কলকাতা থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে এসেছিলেন। জেলার নেতারাও এসেছেন।

অবনীবাবুও সকাল থেকেই রয়েছে এখানে। নানা কাজে তদারক করছে। উপদেশ দিচ্ছে। কোনমতে সে হাসপাতাল হওয়ার কাজে বাধা দিতে পারেনি। গোপনে অনেক চেষ্টাই করেছিল সে আর মুকুন্দরাম শেঠ। সঙ্গে নিবারণ ডাক্তারও ছিল।

ওই হাতুড়ে ডাক্তারদের মধ্যে নিবারণের প্রাকটিসই বেশী। এই দিকে গ্রামাঞ্চলে সে ঘোড়ায় চড়ে যায়। সঙ্গে ওষুধের বাক্স নিয়ে দৌড়ায় একজন। অবশ্য দৌড়তে হয় না, কারণ নিবারণ ডাক্তারের ঘোড়া নাকি ঝিমুতে ঝিমুতে চলে। ওই নিবারণ ডাক্তার স্রেফ নাড়ি ধরে নিদান হাঁকতে পারে। সে যদি জবাব দেয় জানতে হবে এ রোগ সারাবার সাধ্য শিবেরও নাই।

সেই নিবারণ ডাক্তারও চেষ্টা করেছিল যাতে এসব না হয়। কিন্তু গ্রামের মাটিতে অবনীর একটা বিরুদ্ধ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তারাই সব ক্ষেত্রে অবনীর এতদিনের প্রাধান্যকে খর্ব করতে চায়।

অবনী আপাততঃ হার মেনেছে। কিন্তু সে জানে সরকারী হাসপাতাল গুলোর হাল। কোনটার শুধু বাড়িটাই টিকে আছে। কোনটা টিম টিম করছে মাত্র।

এলাকার কিছু স্বার্থপর মানুষ আর কিছু নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ কর্মীদের অবহেলায় আন্দোলনে আর অপকর্মের জন্যই গ্রামীণ হাসপাতালগুলোর প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। ওষুধও থাকে না। খাতায়কলমে ওষুধ আসে আবার ভ্যানিশ হয়ে যায় কোন যাদুমন্ত্র বলে।

রোগীদের খাবারও জোটে না। সে সবও উধাও হয়ে যায়। হাসপাতালও ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যায়। সকালেও ওষুধ ডাক্তার কিছুই থাকে না। মানুষ ছোটে স্থানীয় ডাক্তারদের কাছে। যাদের পয়সা আছে তারা যায় নার্সিং হোমে। সেখানে কি করে রোগীকে মেরে দিয়ে পয়সা আদায় করা হয় সেটা অবনী এর মধ্যেই ভালো করেই শিখে গেছে।

তাই অবনী জানে কি ভাবে হাসপাতালকে ডকে তুলবে সে। তবু প্রকাশ্যে সেও মহা উৎসাহে পরোপকারের বাত বলছে। অমল এর মধ্যে তার সহকারী ডাক্তার বিনোদবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। ভদ্রলোক এর আগে বর্ধমানের কাছে কোন গ্রামীন হাসপাতালে ছিলেন। অমল এম ডি করেছে, তাই পদমর্যাদায় সেইই উপরে। তবে অভিজ্ঞতায় বিনোদবাবুই বড়। অমলও বলে— আপনি যে ভাবে বলবেন সেই ভাবেই কাজ হবে। গ্রামীন হাসপাতাল কেন গ্রাম সম্বন্ধেই আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

বিনোদবাবু বলে, তা বুঝেছি তবে চিকিৎসা ঠিকমত করাটাই বড় কাজ। তাছাড়া এই গ্রামের মানুষদের হাসপাতালের উপর বিশ্বাসকে আরও মজবুত করতে হবে।

অমল বুঝেছে সেটা।

ভবতোষ বাবু, নরেশবাবু, নির্মলবাবুরাও রয়েছেন। সরকারী কর্তারাও হাসপাতালে সম্ভব মত সব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যান।

সেইদিন ঘটা করে কিছু রোগীও দেখা হলো।

কয়েকজন রেগীকে ভর্তি করানো হোল।

অবনীবাবু জেলার কর্তাদের পেয়ে এই সুযোগে তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এর কাজ যে দারুণ সার্থকতার সঙ্গে এখানে চলছে সেটাও দেখাবার ব্যবস্থা করে।

গোপেন—শীতলবাবু অনাদের অনেকেই গ্রামের একটা পাঠশালার ঘরে ঘরে তখন দেশ থেকে নিরক্ষতার অন্ধকার দূরীকরণের গ্রাম্য কাজে ব্যাস্ত।

গ্রামের সেদিন কোন রাখাল-বাগালের দল গরু চরাতে যায়নি। বেশ কিছু দিন মজুর, মাঠে খাটার কামিন আর

বাউরী পাড়ার ছেলেমেয়েদের এনে এক এক ঘরে বই সেলেট দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

এই বয়স্কদের মধ্যে ফনীও রয়েছে। ন্যূব্জ দেহ লাঠিটা পাশে রেখে ফনী বইটাকে উলটো করে ধরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

বোর্ডে তখন গোপেন নিজেই অ-আ লিখে তারস্বরে চীৎকার করছে।

ওপাশের ঘরে শীতল মাস্টার তখন তন্ময় হয়ে গেছে শিক্ষাদানের কাজে।

ডি-এম সাহেব, জেলার নেতারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন।

কে বলেন—না, সত্যিই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে অবনীবাবুর অঞ্চল অনেক এগিয়েছে।

অবনীবাবু বলে, দেশের, সমাজের মানুষের ভালোর জন্য এটুকু যদি না করি তাহলে যে অন্যায় হবে স্যার।

ডি-এম সাহেব বলেন অন্য অঞ্চলের প্রধানদের আপনার আদর্শ অনুসরণ করতে বলবো। চালিয়ে যান এই কাজ।

ওরা অবনীর বাগান বাড়িতে গিয়ে কফি কাজু বিস্কিট আর বাজারের নসু ময়রার দোকানের উৎকৃষ্ট সন্দেশ সহযোগে জলযোগ সেরে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেই এদের শিক্ষার প্রহসনও শেষ হয়।

গোপেন অবশ্য এসব লোককে এমনিই বশ করেনি।

বাচ্চাদের লজেন্স বিস্কুট আর বড়দের আধবেলার মজুরিও দেওয়া হলো। গোপেন বলে।

মাঝে মাঝে ক্লাশে আসবি। আমাদের বৈঠকখানায় তামাক টামাক খাবি—

ফনী এবার লাঠির ভরে ন্যূব্জ দেহটাকে তুলে বলে, ওসব তামাক-টামাকের টাকা না হয় একটা পাঁইট দেবা বলেছিলা পাঠশালে গেলে সিটার খরচ পনেরো কথা থাক পুরোপুরী চাঁট ফাঁট সমেত কুড়ি টাকাই ধরে দাও।

গোপেন বলে—ছাত্র হয়ে শেষে মদ খাবি ফনী?

ফনী বলে—ম্যাস্টার হয়ে যদি ধাপ্পা দিতে পারো, চুরি করতে পারো তাহলে ছাত্র হয়ে মদ খেতে দোষটা কুথায় বলো দিকি? আমি কি লেখাপড়া শিখতে এসেছি?

ওইটার জন্যেই আসা। দাও তো—

গোপেন ওকে আর ঘাঁটায় না! পনেরো টাকা দিয়ে বলে—আর নেই। এসব নিজের পকেট থেকেই দিতে হলো।

অবশ্য গোপেন জানে এমাসে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে বেশ কিছু টাকাই এসেছে কাকার হাতে।

অমল এখানে এসে ক'দিনে গ্রামখানাকে চিনেছে। প্রথম প্রথম এসে কেমন বারবার কলকাতার কথা মনে পড়তো। সকালে উঠেছে। ন্যাপা রাতে তার ঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকে। মশার জন্য হাতে পায়ে কেরোসিন তেল মাখছে রাতে।

অমল অবাক হয়—ও কি মাখছ হাতে পায়ে নেপাল ?

ওটা ন্যাপার আসল নাম। গাঁয়ের মানুষ ওটাকে সংক্ষেপে ন্যাপাতে পরিণত করেছে।

ন্যাপা বলে—আজ্ঞে কেরাচিন তেল ! গায়ে মাখলে মশায় কাটবে না।

—মশারি টাঙ্গাওনা কেন ?

অমলের কথায় ন্যাপা বলে—ওরে বাবা, অনেক দাম। আর ওই মশারির মধ্যে থাকলি খ্যাপলা জালে আটকে পড়া মাছের মত উঁড় মুড়ি লাগে গো।

অমল বলে—না না, মশারির ব্যবস্থাই করছি।

মশারিও পেয়ে যায় ন্যাপা একটা। ফলে ন্যাপার ঘুম ভাঙতেই চায় না। সেদিন সকালে অমল নিজেই চা করছে। চন্দনা আসে চা নিয়ে।

—তুমি ! তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে ?

কদিনেই চন্দনার সঙ্গে অমলের পরিচয় হয়েছে। মেয়েটিই রান্না করছিল কদিন তার জন্য।

গগন ডাক্তার খেতে আসে বেলা দেড়টায়। অমলেরও হাসপাতালের আউটডোর সারতে প্রায় দুটো বেজে যায়। এখন ক্রমশঃ দূর দূরান্তের গ্রাম থেকেও রোগীরা আসছে।

আর বিনোদবাবু, অমল দুজনেই মন দিয়ে রোগী দেখে ! অতুলও থাকে সকালে। এখন সেইই কমপাউন্ডার নবীনবাবুর সঙ্গে হাত লাগায়। ছেলেটা খুবই কাজের। সেও অমলের এখন প্রিয় পাত্র। অতুলও মন দিয়ে কমপাউন্ডারী শিখছে।

ফলে অবশ্য নবু কমপাউন্ডারের অসুবিধাই কিঞ্চিৎ হয়। কারণ নবু রোগীদের প্রেসক্রিপসন মত ওষুধ দেবার সময় কিঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করে থাকে ফাঁক পেলেই।

রোগীরাও দেখে ওষুধে কাজ হচ্ছে। তাই তারাও কিছু দিতে কার্পণ্য করে না। অতুল বলে

—এটা ঠিক নয় নবুদা।

নবু বলে—তুই চুপ করে থাকতো। তোকেও দেব। দিনে দশটাকা অন্ততঃ পাবি অতলো। আর কাজ শিখে নে। ডাক্তারবাবুকে বলে কয়ে রোগের লক্ষণগুলো দ্যাখ—কোন রোগে কি ওষুধ, ট্যাবলেট লাগবে শিখে নে। তারপর নিজেই ডাক্তার হয়ে বসবি।

অতুল বলে—ওই মানুষ মারা বিদ্যে শিখে গোবদ্যি হয়ে কাজ নাই তার চেয়ে বাপের দুধের ব্যবসাই দেখবো। তুমি ওসব করবা না

নবু বিপদেই পড়ে।

হাসপাতাল ভালোই চলছে। রোগীও বাড়ছে।

অমল কিছুদিনের মধ্যে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। অবশ্য এরজন্য চন্দনার অবদান কম নয়। সেই সহর থেকে ভালো পর্দার কাপড়, ম্যাচ করা চাদর এনেছে! অমল বলে—এসবের কি দরকার?

চন্দনা বলে—ডাক্তার মানুষ। লোকজন আসে, একটু ছিমছাম থাকবেন তো।

অমল প্রতিবাদ করে না। দেখেছে এখানে আসার পর থেকে চন্দনা তারজন্য অনেক করেছে। দুপুর অবধি খাবার নিয়ে বসে থাকে ছুটির দিন গুলোয়। অন্যদিন সে কলেজে চলে যায়, ন্যাপাকে পই পই করে কি কি করতে হবে সবই বলে যায়। অবশ্য ন্যাপা তার অর্ধেক করে আর অর্ধেক ভুলে যায়।

চন্দনা এসে বকে তবু সে নির্বিকার।

অমল বলে—ওকে বকে কোন লাভ নেই। একটু আগেই ওই রুদ্রপালতলা থেকে ফিরেছে।

—অর্থাৎ গাঁজা টেনে এসেছে।

ন্যাপার তখন শিবনেত্র। চন্দনাই নিজে সব গোছাতে থাকে। বলে, —আজ বাবার এক পেসেন্ট পুকুরের বড় মাছ পাঠিয়েছে। ওখানেই খাবেন!

অমল বলে—আবার ঝামেলায় ফেলবো আপনাদের? সন্ধ্যার দুটো লেবার কেস আছে।

—তা থাক! বাবা বলেছেন!

ওই গগনবাবুর ডাক্তারখানাও দেখেচে অমল। এর মধ্যে হাটতলাতেও গেছে। দেখেছে গ্রামের হাট। লোকজন প্রচুর আসে। গরুর গাড়িতে করে আনাজপত্র আসে। ওদিকের দোকানবাজারেও খদ্দেরের ভিড় জমে।

আর দেখেছে নিবারণ ডাক্তারকেও। তার দরবারে রোগীদের ভিড়। ডাক্তারবাবু তখন সবে কল থেকে ফিরছে। টিং টিং-এ ঘোড়ার পিঠে পুরু চটের বস্তা আর লাগামটাও জরাজীর্ণ।

দাওয়ায় পা রেখে সামনে অমল ডাক্তারকে দেখে মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে যায় নিবারণের। অমলই বলে—নমস্কার। হাটে এলাম।

নিবারণ বলে—হুঁ!

ছোকরা কয়েকদিনের মধ্যেই নাম করেছে। শুধু এম-বি বি-এস নয়। তার উপরেও তার ডিগ্রী রয়েছে। এম-ডি। নিবারণের ওসব বালাই নেই।

মনে হয় ডাক্তার যেন নিবারণের রুগী ভাঙাতে এসেছে।

বলে নিবারণ—এদিকে?

—এমনিই। রুগী দেখুন, চলি।

অমলও বুঝেছে নিবারণবাবু তাকে এড়াতে চান। অকারণেই গণেশ ডাক্তার তখন ইয়া গুণ ছুঁচের মত ছুঁচ দিয়ে কোন রোগীকে ইনজেকশন দিতে ব্যস্ত।

অমল এদিকের হ্যানিম্যান হোমিও হলের সামনে আসতে গগন ডাক্তার বলে—এদিকে যে? এসো—

অমল ওর ওখানেই উঠলো! ওদিকে সতরঞ্চি পাতা। তাতে দু'একজন ভদ্রলোক, বাকী ইতিজন দাওয়ার নীচে বসে। গগন ডাক্তার কোন রোগীকে তখন জেরা করছে—কোনদিকে বেদনা? ডাইনে না বাঁয়ে?

রোগী কি জবাব দেয় মিন মিন করে। ডাক্তার বলে,

—কি ভালো লাগে? ঠাণ্ডা না গরম? তারপর বলে অমলকে, বুঝলে ডাক্তার, এতো আর আসুরিক এলোপ্যাথী নয়। দ্যাখোগে ওদিকে নিবারণ ছুরি মারছে—গণেশ ছুঁচ বেঁধাচ্ছে আবার। এ একেবারে অ্যাটমিক রীতিতে চিকিৎসা, এক হাজার ওয়ান থাউজেন্ড ডোজ তিনটে ডোজ। ব্যাস--

অমল কদিনেই ওই লোকটিকে চিনেছে। নিঃস্বার্থ-পরোপকারী লোক। রোগীদের কাছে দাবী নাই। হ্যানিমানই তার দেবতা।

অমল বলে—তা সত্যি।

—তবে? গগন ডাক্তারের ওর কথা মনঃপুত হয়। বলে রোগীদের—শোন, কলকাতার বড় ডাক্তার কি বলে!

অমল বলে—চলি। হাসপাতালে যেতে হবে। একটু বাজার করতে এসেছিলাম।

কোনমতে বের হয়ে পড়ে অমল। কারণ কোনমতে মুখ ফসকে হ্যানিমান বিরোধী কোন কথা বের হয়ে পড়লে বিপদ হবে।

ওদিকে বড় রাস্তার কাছেই তিনতলা ঝকঝকে বাড়িটাতে অবনীবাবুদের নার্সিংহোম। ওখানে শহরের দুচারজন ডাক্তারও আসেন। তবে গিরিধারী ডাক্তারই থাকে সব সময়।

শুনেছে অমল এখানের লোকদের কাছে ওদের চার্জের কথা। সাধারণ লেবার কেস গেলে চেষ্টা করে সিজারিয়ান করার। তাতে বেশ আয় হয়। নাহলেও যা চার্জ করে তাও কম নয়।

—নমস্তে ডাক্তার সাব।

অমল আসছে হঠাৎ মোটা গোলগাল অবাঙালী ভদ্রলোককে দেখে চাইল। সেও নমস্কার করে।

ভদ্রলোক বলে—আমি মুকুন্দরাম শেঠ—

অমল ওর নাম শুনেছে। ও নাকি এই নার্সিংহোম—ধানকল, ফ্যাক্টরী এসবের পার্টনার। অবনীবাবুর কাছের লোক।

মুকুন্দরাম দেখায় ওদিকের মাঠের ধারে বেশ উঁচু পাচীল ঘেরা ফটকওগালা

দোতলা বড় বাড়ি।

—উ হামার মকান। আসুন—পায়ের ধুলো দিবেন।

অমল বলে—হাসপাতালে যেতে হবে। জানেন তো ডাক্তারদের অবস্থা

হাসে শেঠজী—খুব আচ্ছাসে জানে। হামার লেড়কা গিরিধারী ভি ডাক্তার, উতো দিনরাত নার্সিংহোমেই রয়েছে।

অমল বলে—পরে একদিন আসবো।

—হ্যাঁ, আসবেন। বার্তাচিত ভি হোবে। নমস্তে।

লোকটা ওকে দেখছে কুত কুতে চোখ মেলে। দেখে অমল, নার্সিংহোমে রোগীদের আনাগোনা কিছু রয়েছে। গ্রাম অঞ্চলে বেশ জমিয়েই বসেছেন এরা।

হাটবারের দিন অমল বিকালের দিকেও ঘণ্টা তিনেক হাসপাতালের আউট ডোর চালু করেছে। বিনোদ বাবু বলেন—এটা করছেন কেন?

বিনোদবাবু ডাক্তারী করছে বেশীদিন ধরে। সে এখানে এসে এর মধ্যে দুচারটে বাড়িতেও রুগী দেখা শুরু করেছে। সেটা অমল ঠিক পছন্দ করে না। বলে

—হাসপাতালেই আসতে দিন ওদের। আর হাটবারে লোকজন বেশী আসে দুপুরের সময়। ওরাও এখানে আসতে পারবে।

ভবতোষবাবুও বলেন—ভালোই করেছো ডাক্তার। হাটের কাজও হবে রোগী দেখানোও হবে।

রোগীদের ভিড়ও বাড়ছে।

চন্দনার ক'দিন থেকে শরীরটা ভালো নেই।

এখনও বৃষ্টির রোখ যায় নি। কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে। বাস রাস্তা থেকে বাড়ি অবধি আসতে ভিজে যায় সর্বাঙ্গ। তারপর থেকেই জ্বর। অমলও দেখেছে।

গগন ডাক্তারই বলে—তিনডোজ রাসটাক্স থার্টি—আর নাক্সভমিকা থার্টি খেয়ে নে। এই ছপুরিয়া, বুঝলে ডাক্তার একেবারে জ্বর ভ্যানিস।

অমল চুপ করেই থাকে। চন্দনা বাবার ওষুধই খায়।

...সেদিন সন্ধ্যা নেমেছে। ওদিকে মাঠের দিকে গেছে অমল। গ্রামের কিছু মানুষকে দেখেছে ওরা যেন তাকে দেখে খুশী নয়।

গোপেনকে দেখেছে। অবনীবাবুর ভাইপো। একটা মটরবাইক হাঁকিয়ে যাতায়াত করে। গোপেনই একদিন বলে—ডাক্তারবাবু, বেশ আছেন মাইরী। থাকুন!

অমল শুধোয়—কিছু বলছেন ?

— না দেখাহলো তাই নমস্কার করলাম। চলি !

মটরবাইক হাঁকিয়ে চলে যায় সে। অমল দেখেছে ওই শেঠজীকে।

অবনীবাবু অবশ্য অন্যধাতের মানুষ। সেদিন নিজেই আসে আউটডোরে। দেখে রোগীদের ভীড়। গরুরগাড়ী, রিক্সাতে দূর গ্রাম থেকে রোগীরা আসছে অবনী দেখে শুনে বলে—তাহলে রোগীরা আসছে ?

অমল বলে—আসছে বৈকি।

—তা ভালো। সেবাহি ধর্ম ! আর্তজনের সেবা। করো মন দিয়ে।

অমল দেখছে এরা যেন ঠিক খুশি নয়।

এসব প্রশ্ন এড়িয়ে সে নিজের কাজই করে। ক্রমশই দেখছে সাধারণ মানুষ অনেকেই তাকে চেনে। পথে যেতে যেতে চাষীবাসীরাও বলে-প্রণাম গো ডাক্তার-বাবু।

•

রুদ্রপালতলায় আগে আসেনি অমল। সন্ধ্যা, ছাড়িয়ে রাত নেমেছে, এদিকটা নির্জন। বিশাল বটগাছটা অসংখ্য ঝুরি নামিয়ে মাঠের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। তলায় থমথমে অন্ধকার। এদিকে গাছের গোড়াটা বাঁধানো। ওখানেই বোধহয় কোন অতীত থেকে একখণ্ড পাথরকে তেল সিন্দুর মাখিয়ে পুজো করা হয়। পরিবেশটা কেমন ভীতিপ্রদ !

হঠাৎ কিসের শব্দে চাইল অমল। অন্ধকার গাছটা। মোটা গুঁড়ির আড়ালে কে যেন লুকিয়ে গেল। ভূত প্রেত নয় তো ! গ্রামের দিকে এমনি প্রাচীন বটগাছে নাকি অনেক ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য থাকে।

কিন্তু এসবে বিশ্বাস করে না অমল। টর্চের আলোয় চারিদিক দেখছে, চট করে কি যেন একটা ওপাশের গুঁড়ির আড়ালে সরে গেল।

অমল টর্চটা নিভিয়ে ওপাশেই এগিয়ে যায় অন্ধকারে।

হঠাৎ কার সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই তার হাতটা ধরে ফেলে টর্চের জোরালো আলো ফেলে চমকে উঠে।

—তুই !

কুসুমও ভাবেনি এই ভাবে ধরা পড়ে যাবে সে। কুসুম বলে—হিঃ গো ডাক্তারবাবু !

—এখানে কি করছিস ? লোককে ভয় দেখাবার জন্য ভূত পেত্নী সেজে এখানে আছিস ? বলছি সবাইকে

কুসুম এবার কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে,

—না গো !

—তবে ? বল কেন আসিস এই অন্ধকারে এখানে ? কেন ?

কুসুম বলে— টাকা পয়সা রাখতে।

অবাক হয় অমল টাকা পয়সা রাখিস এখানে?

—হ্যাঁ গো ডাক্তারবাবু. বাপটা চোট খেয়ে অথব্ব হয়ে গেল, তবু মদের লিশা তার যায় নি। দিনরাত ওই নিয়েই আছে। রোজকার নাই আমাকে মারবে পয়সার জন্যে। মদের পয়সা যেখান থেকে হোক খুঁজে নে পালাবে। তাই বাড়িতে নিজের কামাই এর টাকা রাখতে পারিনা। এই গাছকোটরে রাখি কেউ ওই খানে হাত দেয় না।

অমল দেখছে কুসুমকে। চন্দনার ওখানেই দেখেছে। বলে—তোর বাবার কি হয়েছে?

কুসুমের খুব সাধ ওর বাপকে বড় ডাক্তার দেখাবে। বলে, ওকে নিয়ে যাবো বাবু, একটুন দেখে দিবেন। যদি বাপটো ভালো হয়। উ ছাড়া আমার আর কেউ নাইগ। উ বড় ভালো লুক গো-—শুধু লিশাতেই গেল।

ইয়ার কুন ওষুধ নাই ডাক্তার বাবু? উ ভালো হবে নাই?

অমল বলে, আনিস। দেখবো তোর বাবাকে। আর শোন, রাতের অন্ধকারে এখানে আসিসনা সাপ খোপের কামড়ে মরবি কোনদিন।

হাসে কুসুম রাতের আঁধার কেনে গো, দিন দুপুরে গাঁয়ে সাপের চেয়ে ও শয়তান মানুষরা ঘুরে বেড়ায়, তাই সাপকে ভয় করি না।

চন্দনাই বলে অমলকে—আপনার সাহস তো কম নয়?

অমল চাইল। চন্দনার শরীর ভালো নাই। জ্বর ছাড়েনি, কমছে আবার বাড়ছে। আর গগন ডাক্তার তাকে ওই গুলি খাইয়ে চলেছে। অমল বলে—জ্বর নিয়ে উঠে এসেছো?

—রাত অবধি মাঠে ওই রুদ্রপালতলার বনে ঘুরে বেড়ান। সাপ খোপের ভয়ও নাই? তাছাড়া এ গাঁয়ে আপনার বিরুদ্ধে কিছু লোক আছে। তাদের থেকেও সাবধানে থাকবেন তো।

অমলও তা ক্রমশঃ জেনেছে, অমল বলে, রুদ্রপালতলায় গেছলাম কে বললে?

—বলার লোক আছে। বসুন, খাবার পাঠাচ্ছি।

অমল বলে— খেতে পারি একটা সর্তে।

চাইল চন্দনা—সর্তে!

- হ্যাঁ। তুমি আমার ওষুধ খাবে? ক'দিন থেকেই দেখছি ইনফ্লুয়েঞ্জায় কষ্ট পাচ্ছ। তোমার বাবার ওষুধে কাজ হচ্ছে না। শুধু শুধু ভুগছ আমারও ভালো লাগছেনা। ওষুধ খাবে। নাহলে অন্য কোন কিছুতে টার্ন করতে পারে। বলো খাবে? চন্দনাও জানে বাবার ওষুধে কাজে হচ্ছে না। তার পড়া—কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। ভুগতেও ভালো লাগেনা। সেইই বলতো কথাটা। তবু অমলকে নিজে থেকে বলতে দেখে মনে মনে খুশীই হয়।

বলে—ঠিক আছে।

অমল বলে—এখুনিই ওষুধ আনছি আজ সন্ধে থেকেই খেতে সুরু করো।

চন্দনাও তাই চায়। জানে বাবাকে গোপন করেই ওই ওষুধ খেতে হবে তবু এই প্রথম যেন চন্দনা একটা মধুর পর্শ পায় অমলের ব্যবহারে।

তারজন্য আর একজনও ভাবছে এই ভাবনাটাই তার মনকে কি এক মাধুর্যে ভরে তোলে।

নিবারণ ডাক্তার, গণেশের দল এবার ক্রমশঃ তাদের বিপদের কথাটা বুঝতে পারে। এতদিন ধরে নিবারণ এই এলাকায় চুটিয়ে ডাক্তারী করেছে। গ্রাম অঞ্চলে পথ ঘাট নাই। তাই রুগী দেখতে য্যবার জন্য একটা ঘোড়াও আছে তার।

তবে ঘোড়া না বলে তাকে খচ্চরই বলা যেতে পারে। নিরীহ ভারবাহী প্রাণীমাত্র, শান্ত শিষ্ট বলে মাঠের পথে নিবারণকে নিয়ে টুক টুক করে চলে।

আর বাকী সময় নিবারণের সহিস কাম ওষুধের বাক্সবাহী লোকটা ঘোড়ার সামনের পা দুটো বেঁধে ওকে দিঘীর ধারে ছেড়ে দেয়। তিন পায়ে লেংচে লেংচে ঘাস-জলার ধারের দল শেওলা ইত্যাদি খায়।

ইদানীং অন্যদিন এমনকি হাটবারেও রোগীদের ভিড় কমছে, গণেশ ডাক্তারের গাছতলায় জমায়েত রোগীদের সেই সমারোহ দেখা যায় না।

পকেটের টাকা দিয়ে, ঘরের ধান চাল বিক্রি করে এতদিন তারা এখানেই চিকিৎসা করিয়েছে। এখন ওদের দেখাই নাই।

নিবারণকে আর ক'দিন কলেও যেতে হয় নি, ঘোড়াটাও জিরুচ্ছে। গণেশ ডাক্তার এর আগে নিবারণকে এড়িয়ে যেতো।

কারণ রাস্তার এদিকে নিবারণ—ওদিকে গণেশের ডাক্তারখানা, দু একবার রোগী টানাটানি নিয়ে গোলমালও হয়েছে।

সেবার নিবারণ রতনপুরের হরেকেষ্টার দাঁত তোলার জন্য সাঁড়াশি লাগিয়েছে, বেশ কায়দা করে ধরে টেনে দাঁত ওপড়াতে যাবে এমন সময় তার এদিক থেকে ইছাই শেখকে গণেশ ডাক্তার ডাকছে—এদিকে এসো। আমার ওষুধের ধক্টা দ্যাখো। দুদিনে জ্বর যদি না সারে দাম ফেরৎ। না হয় পরেই দাম দেবে। ওর রোগীকে ভাঙ্গাচ্ছে। নিবারণ সাঁড়াশী হাতেই লাফ দিয়ে এসে আসরে অবতীর্ণ হয়ে গর্জে ওঠে—

—ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার রুগী ভাঙ্গাবে? এই খবরদার! ভালো হবে না গণশা!

গণেশ তখন কব্জা করে ফেলেছে ইছাই সেখকে। টেনে তার কোর্টে নিয়ে গেছে। নিবারণও সাঁড়াশী তোলে।

—মাথা ফাটিয়ে দেব। ছাড় আমার রুগী। দুদিনের দাম বাকী আছে।

ইছাই শেখও বিপদ বুঝে বলে—ওগো, ছেড়ে দ্যান আমারে, আপনাদের টানাটানিতে আমার জ্বর ভাল হইছে গো।

অবশ্য সশস্ত্র নিবারণ রোগীকে উদ্ধার করে আনে গণেশের হাত থেকে। এদিকে দাঁতের ব্যথায় তখন কেষ্ট হরেকেষ্টর নাম জপ করছে। নিবারণ আবার তার দাঁতে সাঁড়াশী লাগাতে গেলে সে বলে—আর ওই সাঁড়াশী লাগাবেন না গো মরে যাবো।

—চোপ!

নিবারণ এবার তার আক্কেল দন্ত উৎপাটন করার কাজ শুরু করে। হাট-তলায় হরেকেষ্টর আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। নিবারণ যে অপারেশনও করে সেইটাই যেন প্রকাশ্যে ঘোষিত হচ্ছে ওই আর্তনাদে।

বদ্যিনাথ কবরেজের দোকানেও কিছু লোক আসতো। বাকীতেও চিকিৎসা করে সে। ঘরে গিয়ে ধান চাল কলা মুলো দিলেও চলে। পুরোনো রুগীও তার কিছু ছিল। গড়ুরবাদ গ্রামের মুসলমানদের সে ছিল একমাত্র চিকিৎসক। জরি বুটি-গাছের শিকড়-ছাল দিয়ে আসব অরিষ্ট না হয় বটিকা বানায়।

এই ভাবেই চলছিল। এবার বদ্যিনাথও বিপদে পড়েছে।

এই হাসপাতাল হবার পর থেকেই তাদের কাছে রোগীরা আর আসে না। এখন তারা ভিড় জমাচ্ছে হাসপাতালে।

বদ্যিনাথ তবু আশা করেছিল তার ভাই গৌর হাসপাতালের চাকরীটা পাবে। মাস মাইনে ছাড়া উপরিও আসবে কিছু। নিবারণও এর মধ্যে গৌরকে বলেছিল, হাসপাতাল থেকে ওষুধপত্র যা আনবি আমি নগদ দাম দিয়ে কিনে নেব। বদ্যিনাথ ভেবেছিল হাসপাতাল হলে দিন বদলাবে, বদলেছেও, তবে ভালোর দিকে নয়। মন্দের দিকেই। গৌরের চাকরী হয় নি, এদিকে রোগীও নাই বদ্যিনাথের।

সেদিন নিবারণ গেছে হাসপাতালের দিকে। এখন হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেছে। সামনে ফুলের গাছগুলো মাথা তুলছে। একটা মাঝারি বটগাছ ছিল তার নীচে চাতাল বাঁধানো।

বাইরে অন্ততঃ আট দশ খানা গরুরগাড়ির, রিক্সার ভিড়, ছাতিমতলায় মতিলালের ঝুপড়ির বিস্কুট খায়, পাঁউরুটি কলার দোকান দিয়েছে সেখানে।

আর হরেকেষ্ট, শ্যামপুরের যদুপতি, ইছাই সেখদের দেখে অবাক হয় নিবারণ।

—তোরা এখানে?

হরেকেষ্ট বলে—আজ্ঞে দাঁত তোলার পর ঘা হয়ে গেছল, ইখানের ডাক্তাবাবুর ওষুধে ভাল আছি এখন।

ইছাই বলে -বিবির জন্য অত ওষুধ করলেন, কিছুই হয়নি, এইখানে র ওষুধে ভালো আছে। বড় ডাক্তার গো। ওষুধেরও দাম লাগে না, ভিজিটও নাই।

—তাই এখানে এসেছিস? নিবারণ শাসায়, এক মাঘে জাড় পালায় না ইছাই, ঠিক আছে। হাসপাতাল যেদিন থাকবেনা সেদিন কোথায় যাও দেখবো।

আর, হরেকেষ্ট, তোর সাতটাকা বাকী।

হরেকেষ্ট বলে -দাঁতই সারেনি টাকা দিব কেনে?

নিবারণ চলে আসে বেশ রাগত ভাবেই। হাসপাতাল হয়ে তাদের সর্বনাশ হবে তা ভাবেনি। এখন কোন উপায় না করতে পারলে বিপদই হবে।

অবনীবাবু, মুকুন্দরাম শেঠও ভাবনায় পড়েছে, তাদের নার্সিং হোমই ছিল এই অঞ্চলে অগতির গতি। যাদের পয়সা আছে তারা তো আসতই আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও তাদের রোগীদের আনতো এখানে, যে ভাবে হোক ধান চাল-ফসল বেচে না হয় গহনা বন্ধক দিয়ে, জমি বেচেও চিকিৎসা করাতো।

প্রথম দিকে হাসপাতালে যেতো না অনেকে। ওখানে যাওয়া যেন মধ্যবিত্তের পক্ষে ছিল সম্মান হানিকর। কিন্তু ক্রমশঃ অমল ডাক্তারের ব্যবহার, রোগীদের প্রতি যত্ন, তার চিকিৎসার খ্যাতি রটতে এবার সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থরাও হাসপাতালে যেতে সুরু করেছে। লেবার কেস এর জন্য ওখানে মেয়েদের আলাদা একটা তলাই নির্দিষ্ট করেছে, নার্সও চারজন আছে।

তারাও বেশ ভদ্র, তাই ভদ্রলোকেরাও এখন যাচ্ছে। লেবার কেসও কমে গেছে নার্সিহোমে। সিজারিয়ানের ভয়েই মেয়েরাও ওখানে যেতে চায় না। হাসপাতালেই যাচ্ছে।

তাই অবনী মকুন্দরামও এবার বিপদে পড়েছে।

সেদিন ওদের এই নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে এমন সময় নিবারণ, গণেশ ডাক্তার আর বদ্যিনাথ কবরেজকে আসতে দেখে চাইল অবনী। নিস্পৃহকণ্ঠে শুধোয়,

—কি ব্যাপার?

নিবারণ বলে—একটা পরামর্শের জন্যে এসেছিলাম।

চাইল অবনী। গণেশ বলে—এতকাল এখানে করেকম্মে খাচ্ছিলাম অবনীবাবু। ডাক্তারিও চলছিল ভালোই। এখন হাসপাতাল হয়ে আমাদের ভাতে হাত পড়লো।

নিবারণ বলে—রুগীরা সব বিনা পয়সায় ওষুধ পাচ্ছে, বড় ডাক্তার পাচ্ছে বিনাভিজিটে, আমাদের কাছে কে আসবে?

—এখন আমাদের কি হবে?

অবনী মুকুন্দরাম নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করে। এই সমস্যা

তাদেরও। তাদের নার্সিংহোমও লোকসানে চলবে এইবার। অর্ধেক আয় কমে গেছে। তারাও এই সমস্যার কথাই আলোচনা করছিল।

এবার ওদের দলে নিবারণ-গণেশ মায় বদি কবরেজকেও আসতে দেখে খুশিই হয়।

অবনী বলে—তোমাদের প্রাকটিস কমেছে বুঝলাম। তা কই হ্যানিমান গগন ডাক্তারকে দেখছি না। ওর গুলি ফোটার কারবার তাহলে ভালোই চলছে?

বদি কবরেজ বলে—ওর কথা ছেড়ে দিন। ওই ডাক্তার তো এখন ওর বাড়িতেই থাকে। শুনি জামাই আদরে চোব্যচোষ্য খাচ্ছে।

গগন ডাক্তারের রোগী যা জোটে তাই সই। আর বোধহয় ডাক্তার থাকা ঠাকার জন্যে ভালো টাকাই দেয়, তাই ও আসেনি।

অবশ্য গগন ডাক্তারকে বিশ্বাস করা যায় না। পেট আল্গা পাগলা লোকটা কখন কি বলে বসে তার ঠিক নাই। ডাক্তারকে রেখেছে বাড়িতে, ওদের দলেই চলে গেছে গগন।

অবনী সবই শোনে। মুকুন্দরামও ভাবছে কি করা যায়। অবনী বলে—এবার বুঝেছ তাহলে কেন হাসপাতালের কাজে বাধা দিয়েছিলাম? তোমাদের মুখ চেয়েই। তখন তো আমার নামে ওই অতলো গোয়ালাও কবি গান বাঁধলো। বোঝো এবার।

নিবারণ বলে—একটা কিছু করুন নাহলে ব্যবসা লাটে উঠবে।

অবনী বলে—মাঝে মাঝে এসো। আমিও ভাবছি। দেখা যাক কি করা যায়। সকলের মঙ্গলের জন্যই ভাবি হে, লোকে ভুল বোঝে। সবই বরাত।

গণেশ বলে—আমাদের ভুল ভেঙেছে প্রধান মশাই। খাল কেটে আমরাই কুমীর এনে এবার বিপদে পড়েছি।

এবার ওই শীতল মাস্টার, নন্দবাবুর দল সামান্য একটা কারণেই স্কুলে ধর্মঘট করিয়ে দিয়েছে।

ক্লাশ প্রমোশন-এর কড়াকড়ি করতে কিছু গার্জেন এসে অনুরোধ করে! কিন্তু নরেশবাবুর স্কুলের রেজাল্টও দুবছর থেকে জেলার মধ্যে অনেকেরই চোখে পড়ছে।

গতবছর প্রায় নব্বুই শতাংশ পাশ করেছে। এবার মাধ্যমিকে সব ছাত্রই পাশ করবে, দুচারটে ছেলে লেটার পাবে।

তাই এবার টেস্টে এবং ক্লাশ প্রমোশনে নরেশবাবু কড়াকড়ি করতে শীতলবাবুই অভিভাবক আর ফেলকরা ছাত্রদের নিয়ে গোপনে মিটিং করে। অবনীবাবু নরেশবাবুদের নতুন স্কুল কমিটিকে সহ্য করতে পারছে না।

তার কোন কথাই থাকছে না। দু জন বিজ্ঞানের টিচারও নেওয়া হয়েছে। অবনীবাবুর আমলে এদের দর ছিল আশি হাজার টাকা করে। তারমধ্যে পঞ্চাশ

হাজার যেতো স্কুল ফান্ডে বাকীটা এদিক ওদিক করে নিজের পকেটেই আসতো।

এবার ইনটারভিউ নিয়ে মার্কসিট দেখে যোগ্যতার ভিত্তিতেই টিচার নেওয়া হয়েছে। অবনীবাবুর এতগুলো টাকা চলে গেল।

রাগটা ছিল অবনীবাবুর। তাই শীতলদের সেও গোপনে সমর্থন করে।

আর সেই বখাটে ফেলকরা ছেলের দল স্কুল গেটে গেড়ে বসেছে। শ্লোগান দিচ্ছে

—স্বৈরাচারী শিক্ষক নরেশবাবু মুর্দাবাদ

ডিকটেটরশিপ্—চলবে না, চলবে না।

শীতলবাবু, নন্দবাবুরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য ছাত্ররা এসেছে স্কুলে ঢুকতে যাবে, এবার ওই বিপক্ষের ছাত্রদল ওদের বলে—খবরদার ঢুকবি না। স্কুলে ধর্মঘট চলছে। আমাদের পাশ না করানো অবধি ধর্মঘট চলছে—চলবে!

জোরে জোরে শ্লোগান ওঠে।

সারা গ্রামে, আশপাশের গ্রামেও খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের শান্ত সবুজ পরিবেশে এবার কিছু লোক নিজের স্বার্থে এই সর্বনাশা ধর্মঘট করে এর শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে।

নরেশবাবু অন্য শিক্ষকরাও খবর পেয়ে এসে পড়েন। ভবতোষবাবুও এসেছেন, রিটায়ার্ড প্রধান শিক্ষক নির্মলবাবুও। তিনিও এ সম্বন্ধে সব খবরই রাখেন।

এসবের মূলে কারা তাও জানেন, কিন্তু ছাত্রদের মাঝে এই অন্যায় প্রতিবাদের আগুন জ্বলাটাকে তিনিও সহ্য করতে পারেন না।

বলেন ছাত্রদের—এসব বন্ধ, করো নিজেদের দোষটা দ্যাখো, পড়াশোনা করবে না কি ভাবে প্রমোশন পাবে? মাধ্যমিক দিতে গিয়ে বাবা দাদার কিছু টাকা জলে দিয়ে ফেল করে আসবে, সেটার চেয়ে এবছর মন দিয়ে পড়ো, এ সব ছাড়ো।

ছেলেরা শীতলবাবু, নন্দবাবুদের দম খেয়ে বলে—আমাদের এলাউ করতে হবে টেস্টে নাহলে—ধর্মঘট চলছে, চলবে।

সেদিন স্কুল বন্ধ রইল।

নরেশবাবু বলেন—আজ কমিটির জরুরী মিটিং ডাকা হোক, গ্রামের লোকও ছেলেদের এই অন্যায় জুলুম মানতে রাজী নয়, তারাই সংখ্যায় বেশী।

তাদের ছেলেদের পড়তে বাধা দেবে, এ সইবেনা। নরেশবাবু বলেন—মিটিং হোক, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

শীতলবাবুরাও খুশী।

তাদের দাবী এই স্কুল কমিটিকে বাতিল করতে হবে।

কেউ আবার পোস্টারও মারে—নরেশবাবুর জমিদারী চলবে না।

তাঁর অন্যায় কুবুদ্ধি বন্ধ করতে হবে।

এই নিয়ে ধর্মঘটী ছাত্ররা মিছিলও করে গ্রামের পথে। যতদিন না তাদের পাশ করানো হবে স্কুল খুলতে তারা দেবে না।

সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

ক্লাশ হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে বহু ছেলে অনিচ্ছা সত্বেও শীতলবাবুদের কোচিং ক্লাশেই আসছে। গার্জেনরাও ক্ষুব্ধ। প্রচুর টাকা লোকসান দিয়ে ছেলেদের এখানে পাঠাতে হচ্ছে।

তারাও অধৈর্য হয়ে উঠছে।

আর শীতলবাবুদের রোজকারও বেড়ে চলেছে। তারা চায় স্কুল বন্ধই থাকুক। এর জন্য ধর্মঘটী ছাত্রদের স্কুল আগলে বসে থাকার সময় চা পাউরুটির যোগান দিচ্ছে তারা।

গ্রামে এ-এক নতুন ব্যাপার। সহরে এসব হয়। আন্দোলন-ধর্মঘট এখানে হতো না। শীতল মাস্টারের দল এবার নিজেদের স্বার্থেই ছেলেদেরও সেই শিক্ষা দিতে সুরু করেছে।

অবনী হঠাৎ একটা যেন পথ পেয়ে যায়। শীতলবাবুরা স্কুল অচল করে দিয়েছে প্রায়, এবার তারাই দাবী তুলেছে এই কমিটি অযোগ্য এদের বাতিল করে নতুন স্কুল কমিটি করা হোক।

তাতে অবনীবাবুই আবার সদল বলে ফিরে তাদের প্রতিষ্ঠাই কায়েম করবে।

একটা হারানো রাজ্য ফিরে পাবে অবনীবাবু, তাই শীতল, নন্দদের সেও গোপনে মদত দিয়ে চলেছে এতে অংশ নিয়ে।

এবার হাসপাতালেরও এমনি একটা ব্যবস্থা করতে পারলে হাসপাতালও অচল হয়ে যাবে, তাহলে তাদের নার্সিংহোম, নিবারণ গনেশ বদ্যিনাথদের প্রাকটিশ আবার চলবে। তারাও গোপনে এবার আঁতাত করেছে।

মুকুন্দরাম শেঠও বসে নেই।

গ্রামের বুকে নানা ঘটনাকেই দেখছে অমল। আস্তে আস্তে গ্রামের সবুজেও স্বার্থপর মানুষদের থাবা পড়ছে।

সেদিন অমল হাসপাতাল যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে হঠাৎ সেদিনের দেখা শেঠ মুকুন্দরামকে তার ঘরে আসতে দেখে অবাক হয় অমল। বাড়িটা সম্পূর্ণ আলাদাই। সামনে পথ—তার এদিকে হাসপাতাল। সকাল থেকেই দূর দূরান্তের রোগীরা গরুর গাড়িতে, রিক্সায় আসতে শুরু করে। তাদেরও সমাগম হচ্ছে।

—আসতে পারি ডাক্তারবাবু? নমস্তে। মুকুন্দরাম পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে। চাইল অমল—আসুন, আসুন, নমস্কার শেঠজী। বসুন।

শেঠ ঘরটার চারিপাশে ভালো করে দেখে নেয়। একটা পোর্টেবল টিভি, কিছু বইপত্র রয়েছে। বেশ ছিমছাম করে ঘরটা সাজানো। ফুলদানিতে কিছু গোলাপ ফুলও রয়েছে। বাড়ির এদিকে দেখেছে গোলাপ, রজনীগন্ধা, জবা ইত্যাদি ফুলের গাছও রয়েছে।

—হঠাৎ এখানে? অমল প্রশ্ন করে।

শেঠজী গোলমুখে হাসির আবেশ এনে বলে,

—এসে গেলাম ডাক্তারসাব।

আরও অবাক হয় এর মধ্যে চন্দনাকে দুকাপ চা বিস্কুট নিয়ে ঢুকতে দেখে।

অমল বলে—চা নিন শেঠজী।

শেঠ দেখছে চন্দনাকে। বেশ স্মার্ট চেহারা। অমলই বলে,

—আমার আশ্রয়দাতা গগনবাবুর মেয়ে চন্দনা।

শেঠজীর অবাক হবার কারণটা অন্য। তাই সে বলে,

—ওকে হামি চেনে। কলেজে পড়ে তো?

চন্দনা চা দিয়ে চলে যায়। ও-ই লোকটাকে এখানের সবাই চেনে। টাকার লোভে, স্বার্থের জন্য—ছেলের বিয়ে দিয়ে চন্দ্রাকে ওই এখানে এনেছে। চন্দ্রা কলেজে পড়তে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ওরাই মেয়েটাকে কলেজে যেতে দেয়নি।

লোকটা নাকি ওর সর্বস্ব লিখিয়ে নিতে চায়। চন্দ্রার ওখানে দুএকবার গেছে চন্দনা। কিন্তু ওই শেঠ—তার মোটকা বউ যেভাবে নজরদারী করতো তাদের উপর তারপর আর যেতে মন চায়নি। ওরা এসবের জন্য চন্দ্রার উপরই অত্যাচার করতো।

চন্দ্রার চোখে জল। ও বলতো,

—এ শ্বশুরাল নয়—যমপুরী।

—তোমার স্বামী কিছু বলে না? চন্দনাও শুধোতো চন্দ্রাকে।

শেঠজীর পুত্রবধূ বলতো,

—ওদের ছেলে একটা ভেঁড়ুয়া। বাবা মায়ের শত অন্যায়ের উপর কথা বলে না। জিন্দেগীতে এতবড় ভুল হয়ে যাবে আমার তা কখনও ভাবিনি। এরা শয়তানের জাত।

চন্দনা ওই শেঠজীকে ভালো করেই চেনে। চা দিয়ে চলে যায় সে। তবু চন্দনা বুঝেছে কোন মতলব নিয়েই এসেছে লোকটা। অমলকে হয়তো কোন তালে ফাঁসাতে চায়। তাই বাইরে থেকে কান পেতে থাকে চন্দনা।

শেঠজী চা খেতে খেতে বলে,

—একঠো বাত পুছবো ডাক্তারসাব?

—বলুন।

—সরকার কত্তো তলব দেয় আপনাকে? আট হাজার রুপেয়া—

অমল বলে—সরকারী কাজে তো বাঁধা মাইনে।

—হ্যাঁ। ওহি তো বাত। আপনার মত এতো বড়া ডাক্তার স্রিফ আট হাজার সে খুশ্ থাকবে কেন, বলেন?

অমল বলে—চলে তো যাচ্ছে।

—না-না। আপনার কিস্মৎ বহুত জ্যাদা সাব। এত্না বড়া ডাকদার। সারা মুলুক এর মধ্যে আপনাকে প্যার করে। ই মামুলী ডাক্তারখানায় কেন থাকবেন? আমার নার্সিংহোমে আস্নে মাসে পনেরো হাজার রুপেয়া দিবে। ভালো বাসা ভি পাবেন, চাইকি গাড়ি ভি। আউর বোনাস ভি দেবে।

অমল দেখছে শেঠজীকে। শেঠজীও দেখছে অমলকে।

ডবল মাইনে, গাড়ি-বাড়ি-বোনাস নিশ্চয়ই ডাক্তার টোপ গিলবে। ওর ভাবান্তরটা লক্ষ্য করছে শেঠজী।

অমল বলে—শেঠজী, আটটা বেজে গেল। হাসপাতালে যেতে হবে। অর্থাৎ বিদায়ই করতে চায় তাকে।

শেঠজী কিছুটা অবাক হয়। বলে—লেকিন হামার কথার জবাব তো দিলেন না ডাক্তার সাব।

অমল বলে—ভেবে দেখি—

—হ্যাঁ, জরুর ভাবুন। ধ্যানসে ভাবুন। পরে আসবো। অব চলে, নমস্তে।

চলে যায় শেঠজী।

—আপনি নাম্বার ওয়ান বোকারাম!

চাইল অমল। চন্দনা ঘরে ঢুকেছে। ওর কথায় চাইল অমল।

চন্দনা বলে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না। এতগুলো টাকা—গাড়ি, ভালো বাড়ি—

অমল বলে—তাহলে তো কলকাতাতেই থাকতাম। ও-সবই পেতাম সেখানে।

—তবে এখানে এলেন কেন? এই অজ পল্লীগ্রামে? চন্দনা শুধোয়।

অমল বলে—গ্রামের মানুষদের জন্য, আর—

—আর? চন্দনা শুধোয়।

অমল বলে—ইস, দেরী হয়ে গেল, চলি।

চলে যায় অমল।

চন্দনা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কার হাসির শব্দে চাইল চন্দনা। কুসুম ঢুকেছে। হাসছে সে।

—তুই! এত দেরী?

কুসুম কাজ করার জন্য গাছ কোমর করে ঝাঁটাটা নিতে নিতে বলে,

—আগে এসে তোমাদের আলাপে বাধা দিই কেনে? দুজনের মনের কথা হচ্ছে।

—এক থাপ্পড় খাবি। খুব বেড়েছিস না মুখপুড়ি?

চন্দনার কথায় কুসুম বলে,

—শাক দে মাছ ঢেকোনি বাপু। তোমার ভাবগতিক ভালো বুঝছি না।

—অতুল কবিয়াল কি বলে রে? এইসব মন বোঝার শিক্ষাই দেয় নাকি তোকে? মনের কথাই হয় ওর সঙ্গে?

কুসুম বলে—মনই নাই তার মনের কথা। ও নিজের তালেই রয়েছে। অবশ্য পুরুষগুলানই তাই। তুমি এত ভাবো, এতো করো ডাক্তারবাবুর জন্যে, ও ভাবে?

—থাম্ তো!

এই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে—তোর বাবাকে নিয়ে গেছলি ডাক্তারবাবুর কাছে?

কুসুম বলে—ভাবছি। তবে তোমার বাবার ওষুধ খাচ্ছে—আবার ওকে নে যাবো ডাক্তারবাবুর কাছে?

—কেন? তাতে কি হয়েছে? রোগ ভালো হওয়া নিয়ে কথা। তাতে যে ডাক্তার ভালো করতে পারবে তার কাছেই যাবি।

এমন সময় ওবাড়ি থেকে বাবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাক শুনে কুসুম বলে—ডাক্তার-বাবু চেঁচাচ্ছে কেন গো দিদি?

চন্দনাও শুনেছে। বলে—কে জানে! ওর মেজাজই অমনি।

গগন-এর ডাক্তারীতেও ভাটা পড়েছে। অবশ্য ওঁর রোগীদের কাছে পয়সা তেমন আদায় হয় না। আর গগনের পয়সার খাইও কম। জমিজায়গার আয়পয় পুকুরের মাছের থেকেই যা আমদানী হয় তা দুজনের পক্ষে যথেষ্ট।

তবু রোগী এলে মনটা ভালো থাকে।

কিন্তু তার পুরোনো রোগীদের অনেকেই এখন হাসপাতালে যাচ্ছে ওই অমলের কাছে। ছোকরার কথাবার্তা ভালো, হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেনি কোনদিন।

বরং বলে, ঠিকমত লক্ষণ দেখে প্রয়োগ করতে পারলে হোমিওপ্যাথী মন্ত্রের মত কাজ করে অনেক কেসে।

গগন বলে—শোন শোন চন্দনা অমল কি বলছে। বলবে না? বলতেই হবে। লেখাপড়া জানা ছেলে। ওই নিবারণ, গণেশ কি জানে ডাক্তারীর? হ্যামার ব্রান্ড ডাক্তার। হাতুড়ে ওরা তাই হোমিওর নিন্দে করে।

তারপর খুশী হয়ে বলে,

—ডাক্তার, আজ পুকুরের বাটা আর মৌরলা দিয়ে গেছে নলে কৈবর্ত। এখানেই খাবে।

আড়ালে বলে চন্দনাকে—একা থাকে। ন্যাপা কি ছাইপাঁশ রান্না করে, ভালোমন্দ হলে অমলকে দিবি।

চন্দনা তা দেয়। তবু বাবার কথায় ওই অমলের উপর বিতৃষ্ণা দেখাবার

জন্যাই বলে—সহরের নাকতোলা সাহেবের এসব গাঁয়ের পায়েস নাড়ু কি পছন্দ হবে? তাই দিই না!

গগন ফুঁসে ওঠে—ওই তোর দোষ। মানুষটা একা পড়ে আছে দেখবি না? কি খেল না খেল খবরও নিবি না! একেবারে হার্টলেস ক্রিচার হয়ে যাবি?

গগন ডাক্তার রেগে গেলে দুচারটে ইংরাজী বুলিও ছাড়ে। এহেন ডাক্তার ক'দিন থেকেই দেখেছে চন্দনার জ্বর ছেড়ে গেছে। সর্দিও আর নাই। গগন ডাক্তার বলে,—দেখলি রাসট্রক্স আর নাক্স থার্টির গুণ। আরে এ হল হোমিও প্যাথী। এর ক্ষমতাই আলাদা। একেবারে অ্যাটমিক্ ব্যাপার—এক কণা। বাস তাতেই বাজীমাৎ।

হ্যাঁ—এবার দিনে এক ডোজ করে বেলেডোনা হানড্রেড।

হঠাৎ আজ সকালে চন্দনার ঘরে ঢুকে একটা হোমিওপ্যাথি বই খুঁজতে খুঁজতে আবিস্কার করে গগন ডাক্তার চন্দনার বই-এর নীচে অমলের প্রেসক্রিপশন —দুরকম ট্যাবলেট কয়েকটা। কিছু খেয়েছে বাকীটা রয়েছে আর দেরাজের মধ্যে এক শিশি তীব্র গন্ধওয়ালা এলোপ্যাথিক মিক্সশ্চার।

কয়েক দাগ খেয়েছে চন্দনা বাকীটা রয়েছে।

দেখেই এবার গগন ডাক্তারের মাথাতে রক্ত উঠে গেছে। এমনিতে ক'দিন থেকে মেজাজ ভালো নাই। রোগীরা হোমিওপ্যাথী ছেড়ে ওই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে।

আজ ঘরের মধ্যে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পেয়ে চমকে ওঠে গগন ডাক্তার। তার নিজের মেয়ে তারই ঘরে আজ তার আরাধ্য দেবতা মহাত্মা হ্যানিম্যানের ওষুধ পুরিয়া ছোঁয় নি। তার সব ওষুধই মজুত রয়েছে আর খেয়েছে অমলের ওষুধ।

চন্দনা ঘরে ঢুকে শুধোয়—কি হলো? সাত সকালে চেঁচাচ্ছ কেন?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে গগন ডাক্তার।

—কি বললি? চেল্লাচ্ছি কেন? হোয়াট ইজ দিস্? ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার সঙ্গে? আমার ওষুধ পড়ে রইল আর গিললি ওই আসুরিক ডাক্তারের বিশ্রী তেতো—এইসব বিষ। গণ্ডা গণ্ডা ট্যাবলেট খেয়ে মরবি?

এবার বুঝেছে চন্দনা ব্যাপারটা। বলে সে,

—মরিনি তো। তোমার ওষুধ খেয়ে জ্বর তো কমেই নি উল্টে বাড়ছিল। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন—এভাবে চললে টাইফয়েডে পরিণত হবে।

—কি জানে ও? রসটক্সের সিমটম্ ওই—বাড়ায়। তারপর সব বিষ নির্মূল করে দেবে। নাক্স থার্টি দিয়েছি কেন ও জানে? কচু জানে? আর আমার কেস আমাকে না জানিয়ে কেন ও নেবে? হোয়াই?

চন্দনা বলে—সেরে উঠলাম, তার জন্য ওকে ধন্যবাদ দেবে তা নয় ধমকাচ্ছো? কি অন্যায় করেছে সে?

—আলবৎ করেছে। আমার পেসেন্ট—আমাকে জানাবে না চিকিৎসা করবে?

—বেলা হয়ে গেছে, আজ হাটবার। রোগীরা বসে থাকবে। চন্দনার কথায় খেয়াল হয় গগন ডাক্তারের। বলে

—ঠিক আছে। এখন যাচ্ছি। পরে বিহিত করবো। আর শোন—ওই অমল ছোকরাকে ভেবেছিলাম গুড বয়, এখন দেখছি মোটেই তা নয়।

আজ লাউ-এর পায়েস করছিস তো ?

—হ্যাঁ।

—বেশ জমিয়ে করবি। আর ওই বাজে ডাক্তারকে একদম দিবি না। বাইরে পড়ে আছে, ওখানেই থাকুক। নো কানেকশন। বুঝলি ?

ছাতা ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে যায় গগন ডাক্তার হন হন করে। কুসুম এসেছে এ বাড়িতে।

এবার সে বলে—লুকিয়ে ওষুধ খেয়েই এই। তাহলে প্রেম পীরিত করলে কি হবে গো ?

চন্দনা বুঝেছে একটা গোলমাল না বাধায় বাবা।

দেখেছে চন্দনা অমলকে, শেঠজী কি প্রস্তাব দিয়ে গেছে। যদি চলে যায়—হয়তো হাসপাতালও অচল হবে। আর শূন্য হয়ে যাবে চন্দনার অন্তরও।

তার অজানতেই চন্দনাও কেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কুসুমের কথায় জবাব দিল না।

কুসুম বাসনগুলো মাজছে আর নিজের মনেই বকে চলেছে। অতুল ক'দিন এদিকে আসেনি। কুসুমের সঙ্গে দেখাও হয়নি। কুসুমের মন মেজাজ তাই ভালো নাই।

শেঠ মুকুন্দরাম ভেবেছিল ওই অমল ডাক্তার টোপটা গিলে ফেলবে। অবশ্য ওর মতলবটা ছিল অন্যরকম। মাস চার ছয় হাসপাতাল থেকে অমলকে সরিয়ে আনতে পারলেই হাসপাতাল কানা হয়ে যাবে।

এর মধ্যে হাসপাতালের দু'একজন নার্স—স্বাস্থ্যকর্মীকে হাতে এনেছে নবু কমপাউন্ডার। নেহাৎ অতুল ওখানের স্টোরে বসে। তাই এখনও ঠিক মত মালপত্র সরাতে পারছে না। অতুলকেও সরাতে পারলে মাসখানেকের মধ্যেই স্টক ফাঁক করে দেবে তারা।

হাসপাতালও অচল হয়ে যাবে। তাদের নার্সিং হোম আবার জমে উঠবে, তারপরই অমল ডাক্তারকে বিদায় করবে।

অমল ডাক্তার নিশ্চয়ই টোপটা গিলবে।

তাই দু তিন দিন অপেক্ষাও করে শেঠজী ভেবেছিল, অমল ডাক্তারই অমন লোভনীয় প্রস্তাবের জন্য তার কাছেই আসবে।

কিন্তু আসেনি।

অবনীও খুশী হয়েছে শেঠজীর বুদ্ধির বহর দেখে। বলে,

—জব্বর চাল দিয়েছেন শেঠজী। ব্যাটা টোপ গিলবেই। ব্যস। ও গেলে হাসপাতালও উঠিয়ে দেব যেমন তেমন করে।

শেঠজী বলে—তারপর ওকেও তাড়াবো।

অবনী স্বপ্ন দেখছে হাসপাতাল নাই। আর স্কুলে যা কলকাঠি নেড়েছে তাতে কমিটিতে সেইই আবার আসবে দলবল নিয়ে এটাও পাকা হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে যায়।

স্কুল কদিন ধরে বন্ধ। আন্দোলন ধর্মঘট চলছে। নরেশবাবুরাও বিপন্ন। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাছাড়া ক্লাশ না হলে ছাত্রদেরও ক্ষতি হচ্ছে।

অতুলও দেখেছে ব্যাপারটা। এর মধ্যে গ্রামের এবং আশপাশের গ্রামের মানুষজন হাসপাতালে আসে। সেখানের কাজে তারা খুশী। অতুলের উপরও তাদের বিশ্বাস আছে।

অতুলই বলে—গ্রামের ভালো হোক তা অনেকেই চায়না। ওই স্কুলকেও বন্ধ করেছে শীতল বাবু, অবনীবাবুর দল। ওদের কর্তৃত্ব সেখানে নাই বলে। এই হাসপাতালও তুলে দিতে চায়।

ওদিকে কত লোকের সর্বনাশই করছে ওরা।

লোকজনও এবার বুঝেছে ব্যাপারটা। স্কুলের ব্যাপারেও এবার তারাই তৈরী হয়েছে গোপনে। আর তার প্রকাশ ঘটে সেই দিনই।

ছেলেরা স্কুলে ঢুকতে যাবে। তাদের দাবী ক্লাশ করতে দিতে হবে। ওই ফেল করা ধর্মঘটীরা জানে পিছনে শীতল স্যারের দল মায় প্রধান অবনীবাবুও আছে।

তারাও নড়বে না। স্কুলে ঢুকতে দেবে না। এই নিয়ে তর্ক-ঝগড়া। ধর্মঘটীরা দু' একজন ছেলেকে মারধোর করতেই এবার জনতাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বলে,

—অনেক সয়েছি, তোদের আবদার আর সইবো না। পড়বে না—পাশ করাতে হবে? ডাক তোদের কোচিং মাস্টার ওই শেতলকে—

ছাত্ররাও ফুঁসে ওঠে।

জনতাই তাদের জামার কলার চুলের মুঠি ধরে তুলে দেয়। শাসায়, ভেঙে দেব, ফের ধর্মঘট করতে এলে ঘাড় আছড়ে ভেঙ্গে দেব। তোদের মাথাও।

মার ব্যাটাদের—

ধর্মঘটী ছাত্রের দল এবার বুঝেছে জনতা তাদের এবার মারধোরই করবে। কে বলে—ওঠ। তোরা পড়বি, না হয় পড়বি না। তাই বলে সারা দেশের ছেলেদের পড়া নষ্ট করবি? খবরদার—

ছাত্রের দল মারধোর খেয়ে পালায়, বাকী ছাত্ররা হুড়মুড় করে স্কুলে ঢোকে। আর শীতল স্যার সেদিন মেয়ের বাড়ি গেছে সে-ই অনুপস্থিত হয়ে যায়। যথারীতি ক্লাশ শুরু হয়।

অবনীবাবুর কাছে খবরটা পৌঁছে যেতে সে অবাক হয়। গোপেনও ছিল স্কুলে। জনতার ওই রুদ্ধরোষ দেখে গোপেন আগেই সটকে গিয়ে কাকাকে সুখবরটা দেয়।

—ধর্মঘট পাবলিক ভেঙ্গে দিয়েছে কাকা। ক্লাশে সব ছাত্ররা ঢুকেছে।

—আর ধর্মঘটী ছাত্ররা?

—তারা ল্যাজ তুলে পালিয়েছে।

—শীতল কোথায়? অবনী শুধোয়, সে কি করছিল?

—সে তো নাই। মেয়ের বাড়িতে।

অবনী গর্জে ওঠে—যমের বাড়িতেই পাঠাবে আমাদের। লোকে কি বলছে?

গোপেন চুপ করে থাকে। ওই জনতার মুখের ভাষাগুলো ঠিক কাকা-বাবুকে বলা যায় না।

তাই গোপেন এক কথায় বলে—গালাগাল দিচ্ছিল গো।

অবনীবাবু অবাক হয়—গালাগাল দিচ্ছিল? আমাকে? তারপরই প্রশ্ন করে—কে কে ছিল বল?

গোপেন তাদের সকলকে চিনতে পারেনি। নামও ঠিক জানে না, মুখ চেনে মাত্র। তাই চেনা দু চারজনের নামই বলে।

অবনীও বুঝেছে স্কুলের প্রাধান্য আর কোনদিনই ফিরে পাবে না। ওই শীতল নরুদের জন্যই অবনীও অপদস্ত হয়েছে। এখন ভবিষ্যতে এই প্রতিবাদ যদি পঞ্চায়েতের ভোটের বাক্সে পৌঁছে যায় তারই বিপদ হবে।

এদিকে স্কুলের প্রাধান্য গেল, ওদিকে খোদ অঞ্চল প্রধানের পদ নিয়েও ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে, আর ঘাড়ের উপর হাসপাতাল এসে পড়ে সেখানেও ইজ্জতের প্রশ্ন এসে গেছে শেঠজীর কাছে।

এদিকে প্রকাশ্যেও কিছু করার উপায় নাই। যা করতে হবে গোপনে গোপনে। এবার যেন পরাজয়ের কালো ছায়াটাই সামনে আসছে করাল রূপ ধরে এক একটা করে। এতদিন এই ভয়টা তার ছিলনা। এখন হয়েছে।

তাই মন মেজাজ বিষিয়ে আছে।

ওদিকে শেঠজী এসেছে।

শেঠজী অমল ডাক্তারের কাছ থেকে কোন খবর না পেয়েই গিয়েছিল একদিন হাসপাতালে। দেখে লাইনবন্দী রোগীদের ভিড়।

অমল বলে—এখন কথা বলার সময় নাই শেঠজী। আউটডোর সেরে

ইনডোর তারপরও দুটো অপারেশন করতে হবে। খুব ব্যস্ত।

শেঠজীও তা দেখেছে। সারা এলাকার মেয়ে পুরুষ এসে এখানে ধীর ভাবে অপেক্ষা করছে। কোন শব্দ নাই।

শেঠজী এক নজরে ইনডোর বিলডিংটাকেও দেখেছে। দোতলা বড় বিলডিং, অতুল লোকজনদের নিয়ে সাফ করাচ্ছে, মালীও রয়েছে দুজন। এর মধ্যে বাইরে সুন্দর লন, কিছু ফুলের গাছও করেছে। দু চারটে আগেকার গাছও সযত্নে বাড়ছে।

ঘরের মেঝেগুলো ঝকঝকে। বেডের চাদরগুলো সাফ সুতরো। নার্স কজনকে দেখা যায় ঠিকমত ওষুধপত্র দিতে।

নরুর সঙ্গে আর একজন সহকারী রয়েছে, আউটডোরে ওষুধও ঠিক ঠিক দিচ্ছে আর তার দামও নেই।

শেঠজী দেখে চারদিকে একটা কঠিন শৃঙ্খলা রয়েছে। অফিসঘরে বসে ভবতোষ বাবু হিসাবপত্র দেখছেন, বিকেলেও যান তিনি। রোগীদের খাবার, দুধও ঠিকমত দেওয়া হয়।

শেঠজী দেখছে তার নার্সিং হোমে কেন যায় না আর অনেকে। তার মনে হয় ওই অমল ডাক্তারকে সরাতে পারলেই এদের ইমারত ধ্বসে পড়বে।

স্বপ্ন দেখে সে ওই বাগান ছাড়াগরুতে খেয়ে শেষ করেছে, সেখানে গজাচ্ছে শুধু ঘাস আর আগাছা। এতবড় জনবহুল চত্বর যেন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। দরজা জানলাগুলো খুলে নিয়ে গেছে কারা।

এসব উঠে গেছে।

রমরমিয়ে চলছে তাদের নার্সিং হোম।

চমক ভাঙ্গে অতুলের ডাকে। ও শেঠজীকে এখানে দেখে একটু অবাক হয়। চেনে ওই মানুষটিকে হাড়ে হাড়ে। তাই এখানে দেখে শুধোয়—কি ব্যাপার শেঠজী ?

শেঠজী বলে—আরে অতুল যে। কেমন আছো ?

অতুলের জন্য যেন সত্যই সে খুব ভাবিত। অতুল বলে

—ভালোই আছি। আপনি এখানে ?

শেঠজী বলে—এসেছিলাম তোমাদের ডাক্তারবাবুর কাছে। শুনলো কলকাতার ডাক্তার। পেটের গোলমাল চলেছে, তাই শোচলো একবার দেখাবে।

অতুল দেখছে ওকে। লোকটার নার্সিং হোমেও অনেক বড় ডাক্তার আছে। এখানে কেন আসবে বুঝতে পারে না। শেঠজী বলে।

—বহুৎ ভিড়, পিছু আসবে—

অতুল বলে—বসুন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফিরে যাবেন কেন ?

শেঠজী ওকে এড়াবার জন্যে বলে—আজ জরুরী কোন আসার কোথা,

বোম্বাই সে। হম চলে। পিছু আসবে।

কোনমতে চলে গেল শেঠজী। অতুল কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই সেবার কাজটা তার ভালো লাগে। সে তাই রয়ে গেছে এখানে। তবে শেঠজীর ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না সে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলেছে, অমল হাসপাতালের কাজ সেরে ফিরেছে বাসায়। ন্যাপা তখন রান্না বান্না সেরে নিজে একবার ভরপেট মুড়ি খেয়ে ঘুমুচ্ছে। অমলকে দেখে এবার উঠে বসে। তারও খিদে পেয়েছে।

অমলকে বলে—অবেলা হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে নিন—খাবার দিই।

খেয়ে দেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম নিতে যাবে এমন সময় গগন ডাক্তারকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে চাইল অমল।

—বসুন!

গগন ডাক্তারের হাতে তার দেওয়া পুরিয়া ওষুধ, আর অন্যহাতে অমলের দেওয়া চন্দনার ওষুধ ট্যাবলেট। সেগুলো টেবিলে নামিয়ে বলে—প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি গুড বয়, এখন দেখছি ভেরি ব্যাড বয়। বিশ্বাসঘাতক। আমারই বাড়িতে থেকে আমারই বিশ্বাসঘাতকতা করবে? হোয়াট ইজ দিস?

অমল অবাক। বলে সে—কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছ না? ওই চন্দনাকে কেন ট্রিটমেন্ট করলে? ও আমার মেয়েই নয়—আমার পেসেন্ট। ওকে এই সব পয়েজন গেলাচ্ছো? ডাক্তারি ফলাচ্ছো? কি জানো হে ছোকরা হোমিওপ্যাথীর?

নাক্সভমিকা, আর্সেনিক রসটক্সের, অ্যাকশন ডোজ—এসব বোঝো?

এবার অমল হাসি চেপে বলে—আজ্ঞে না।

—তবে কেন এই সব হ্যানিমানের ওষুধের ওপরে নিজের ওষুধ দিতে যাও?

—নাহলে বুকে সর্দি বসে নিউমোনিয়াও হতে পারতো মেয়েটার!

—হতো না। নাক্সভমিকা রসটক্স দিয়েছি। যমে ছোঁবে না জানো?

এসে পড়েছে চীৎকার শুনে চন্দনা।

দেখে বাবা শীর্ণ দেহ নিয়ে লাফাচ্ছে আর এক মহৌষধের গুণ বর্ণনা করে শাসাচ্ছে অমলকে। গগন বলে,

—আমার পেসেন্ট ভাঙ্গাবে? ওই নিবারণ, গণশা মায় বদ্দিকবরেজের পেসেন্ট ভাঙ্গাচ্ছো অবজেকশন করিনি! ওরা গোবদ্যি, ভাঙ্গাও ওদের পেসেন্ট। কিন্তু লাস্ট টাইম তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম এরপর হোমিওপ্যাথীর ওপর এলোপাথাড়ি—

—এলোপ্যাথী।

—ওই হোল! ওই আসুরিক চিকিৎসা করলে আমিও এবার তোমার

ব্যবস্থা করে দেব। সব কানেকশান কাট্—

আমার বাড়িতে এলোপ্যাথীর ঠাঁই হবে না।

—বাবা। কি বলছ? চন্দনা প্রতিবাদ করতে গর্জে ওঠে রবি ডাক্তার

—সায়লেণ্ট। এই আমার লাস্ট ওয়ার্নিং—

গটগট করে শীর্ণ দেহ নিয়ে যেন নৃত্যছন্দে চলে গেল গগন।

চন্দনা বলে—কিছু মনে করবেন না, বাবার ওই স্বভাব। হোমিওপ্যাথীর নামে কিছু বলা যাবে না।

অমল গম্ভীর ভাবে বলে—না, ঠিকই বলেছেন উনি। ওর মেয়ে, ওর পেসেন্ট, তার চিকিৎসা করা ঠিক হয়নি।

—ওর জন্য ভুগতে হবে আমাকে? অন্যায় তো করেননি? চন্দনার কথায় অমল বলে,

—উনি তো বললেন ঘোরতর অন্যায় করেছি। এরপর কোনদিন আবার কি হবে, তার চেয়ে ভাবছি চলেই যাবো এখান থেকে।

চন্দনা চমকে ওঠে। ও চলে গেলে তারও অনেক কিছু শূন্য, ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওই বেদনাটা আগে সে অনুভব করতো না, ক্রমশঃ অজানতেই যেন অমলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে। সেই অমল চলে যাবে! চন্দনা অস্ফুট কণ্ঠে বলে,

—চলে যাবেন?

—নয়তো কি! শেঠজীরা এমন একটা লোভনীয় অফার দিয়েছেন তাই ভাবছি চলেই যাবো। নাহলে তোমার বাবা হঠাৎ কোনদিন ঘাড় ধরেই বের করে দেবেন।

চন্দনার চোখে জল আসে। সে উদ্গত অশ্রু চেপে বলে

—তা যাবেন বই কি! কলকাতার লোকরা এমনিই হয়। টাকার লোভ গাড়ি বাড়ি। যান—যান যেখানে খুশী আমি বাধা দেবার কে? শেষে ওখানেও ঘাড় ধাক্কা খাবেন তাও বলে রাখছি।

কোন মতে নিজেকে সামলে বের হয়ে যায় চন্দনা।

কুসুম ঢুকছিল বিকালের বাসনপত্র মাজার জন্য। সে দেখে দিদিমণি বের হয়ে গিয়ে ওপাশের ফুলগাছের নীচে যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ঘরে ঢুকে দেখে অমল ডাক্তারবাবু যেন মিটি মিটি হাসছে।

কুসুম বলে—হাসছেন যে ডাক্তারবাবু, দিদিমণিকে কি বলেছেন, কানছে

অমল জবাব দিল না। বিছানায় ছড়ানো মেডিক্যাল জার্নালগুলো দেখতে থাকে। কুসুম বাসন মাজতে মাজতে বলে।

—বাবাকে কাল নিয়ে যাবো ডাক্তারবাবু?

অমল বলে—এখন কে দেখছে ওকে?

—কেন ? আমাদের হোমিওপ্যাথিক বাবু—ওই দিদিমণির বাবা।

এবার চমকে ওঠে অমল।

—ওই দুর্বাশা মুনি ! ওরে বাবা ! আগে ওর অনুমতি নিবি তবেই তার বাপকে দেখাতে আনবি, নাহলে ওই দুর্বাশা মুনি আমারই বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।

কুসুম বলে—না গো—শিবতুল্যি লোক ডাক্তারবাবু।

—হ্যাঁ। প্রলয় নাচন নেচে ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসবে। ওই ব্যাপারে আমি নাই।

চন্দনা বাবাকেও যেন ক্ষমা করতে পারে না। লোকটা ওই হোমিওপ্যাথী করেই মাকে মেরেছে। নাহলে হয়তো তার মা সারতো।

এবার তাকে নিয়ে পড়েছে। ওর ওষুধই খেতে হবে। আর অমল চলে যাবে। পড়াতেও মন বসে না। সন্ধ্যার পর কুসুম আসে। সে লক্ষ্য করেছে চন্দনাদির পরিবর্তনটা। চুপচাপ বসে আছে। ওদিকে ডাক্তারবাবুর ঘরেও টিভিটা বন্ধ। কুসুম চন্দনা গিয়ে বসে সিনেমা থাকলে।

আজ যায়নি। কুসুম বলে

—কি হয়েছে গো দিদি ? ডাক্তারবাবুর ওখানে যাবেনা ? আজ সিনেমা—

—থাম তো ! পড়াশোনা করতে হয় কর। নাহলে যা। খুব সিনেমা ভক্ত হয়েছিস, এবার কোনদিন বলবি সিনেমায় নামবো !

কুসুম পর্দায় সিনেমা দেখে এখন নিজেকেও ওই নায়িকাদের মতই ভাবে। বলে সে—আমিও পারি গো। এসব ছলা কলা—চন্দনার আজ ওসব ভালো লাগে না। বলে

—চুপ কর তো ! ময়দাটা মাখ—রুটি করতে হবে।

মনটা একদম ভালো নাই চন্দনার। রাতে ভালো ঘুমও হয় না। মনে হয় ওর, সুর—মানুষের পায়ের শব্দ, হাসি সব থেমে গেছে। বার বাড়িটা যেমন নির্জন পড়েছিল তেমনি নির্জন হয়ে গেছে। চলে গেছে অমল।

তার জীবনের সব আশা-স্বপ্ন-সুরও মিলিয়ে গেছে।

অমলও চন্দনার ব্যবহারটাকে লক্ষ্য করেছে। ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ অমলেরও ভালো লাগে চন্দনাকে। সহরের মেয়েদের মত উগ্র প্রসাধন নেই, স্নিগ্ধ শ্যামল তৃণভূমির মত সতেজ। চোখ দুটোয় দূর আকাশের বিস্তার। হাসিটা যেন সবুজের মাঝে কাশফুলের শ্বেত শুভ্র বিন্দু। প্রথমে চোখের তারা উলসে ওঠে আর সেই দ্যুতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে মুখে কি ঔজ্জ্বল্য নিয়ে।

অমলের মনে হয় চন্দনা না থাকলে ও এই গ্রামে থাকতেই পারতো না।

তার জামা প্যাণ্টের হিসাব, সময়মত কাচানো—ঘর দোর ঠিক রাখা, সংসার চালানো এসব তার দ্বারা হতো না। পুরোপুরি হাসপাতালের কাজে মন দিতেও পারতো না।

একদিক থেকে অমলও চন্দনার সঙ্গে নিজেকে তার অজানতেই জড়িয়ে ফেলেছে। তাই চলে যাবার কথা ভাবতে তারও খারাপ লাগে। মনের অতলে কি যেন একটা বিষাদের সুরও ধ্বনিত হয়।

সকালে বের হবার আগেই আজ শেঠজী এসেছে।

—কই নার্সিং হোমে যাবার কি করলেন ডাক্‌দার সাব্‌?

ইখানে কি ফায়দা পাবেন? পনেরো হাজার টাকা দিব ফি মাহিনা—ই মাটির ঘরে কি থাকবেন? চলেন—

অমল তার কর্তব্য স্থির করেই নিয়েছে। জানে সে ওকে তারা হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে চায় এই হাসপাতালকে শেষ করার জন্যই, যাতে তাদের ওই গলাকাটা চিকিৎসা ব্যবসা ভালোই চলে।

অমল দেখেছে এই অঞ্চলেয় অসহায় আর্ত মানুষদের। তাদের অকুণ্ঠ প্রীতি তার কাছে অনেক মূল্যবান। তাদের আর্ত মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই সে অনেক পায়। টাকার অভাব তার নেই। তাই বলে অমল।

—আমাকে মাপ্‌ করবেন শেঠজী।

অবাক হয় মুকুন্দরাম। এত টাকা পায়ে ঠেলবে তা ভাবতেই পারেনি।

বলে শেঠ—কি বলছেন বাবুজী? এতনা সারা রুপেয়া—

অমল বলে—টাকার জন্য গ্রামে আসিনি শেঠজী। হাসপাতালে কাজ করে গরীবদের সেবা করার জন্যই কলকাতা থেকে এসেছি।

শেঠজীও গম্ভীর হয়ে যায়।

—তাহলে যাবেন না?

—না।

শেঠ মন্তব্য করে, হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেললেন বাবুজী। খয়েব-মো কিয়া, কিয়া। তবে কাম ভালো করলেন না। চলি—নমস্তে।

যেন নীরব একটু শাসানিই দিয়ে গেলো ওই শেঠ।

মুকুন্দরাম বের হয়ে আসছে, দেখে ওই চন্দনাকে। সে ডাক্তারের চা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। শেঠ এর নজর পড়ে ওর দিকে। কি ভাবছে শেঠজী। অমল ডাক্তার যে তাদের বাসায় যেতে চাইল না, তাদের নার্সিং হোমের চাকরীও নিল না, তার গূঢ় কারণটা যেন আবিষ্কার করেছে সে।

চলে যাচ্ছে শেঠজী। কুসুমও দেখছে শেঠজীকে। বলে সে।

—চলে গেলেন শেঠজী? তা ডাক্তারবাবু এতগুলোন ট্যাকা ছেড়ে দিলে? এমন চাকরী! লুকটার কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেল গো?

শেঠ বলে—তাই শুধুগে তোদের ডাগ্দার সাব্কে !

কথাটা শুধোয় চন্দনাই। সে ব্যাপারটা সব জানে। শেঠজী কতটাকা দেবে বলেছিল তাও শুনেছে।

চন্দনা ঘরে ঢুকেছে। সে শুনেছে বাইরে থেকে অমলের কথাগুলো। মনে মনে খুবই খুশী হয়েছে চন্দনা। তবু বলে অমলকে—একি করলেন? এতগুলো টাকা, সুন্দর বাড়ি-গাড়ি।

অমল দেখছে চন্দনাকে। বলে সে।

—তুমি নিতে বলছ? তুমি বলছ এই হাসপাতাল বন্ধ করে শুধুমাত্র টাকা আর পাকা বাসার জন্য ওখানে চলে যাই?

প্রশ্নটা চন্দনাকেই করেছে অমল। সবকিছু যেন চন্দনার মতামতের উপরই নির্ভর করছে। চন্দনা বলে।

—এটা আপনার ব্যাপার, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন।

অমল বলে—আমি তাই ওদের জবাব দিয়েছি। যাচ্ছিনা ওখানে।

চাইল চন্দনা। মুখে চোখে উচ্ছ্বসিত খুশীর আভা।

—যাচ্ছেন না?

—না চন্দনা! এই মাটির ঘরে থেকেই হাসপাতাল চালাবো। এর জন্যই তো এসেছি এখানে। টাকার জন্য নয়।

চন্দনা দেখছে নতুন এক অমলকে। বলে অমল

—অবশ্য তোমার বাবা যদি এখানে থাকতে দেন। আর কথা দিচ্ছি—হোমিওপ্যাথীর নিন্দা করবো না।

চন্দনা বলে—ওর রোগীকে ভাঙ্গিয়ে নেবেন না তো?

অমল দেখছে চন্দনাকে।

ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়। চন্দনা শিউরে ওঠে বিচিত্র অনুভূতিতে। মনে হয় আজ যেন নিঃসঙ্গ জীবনে এক নির্ভরযোগ্য সঙ্গীই পেয়েছে সে।

অমল বলে—মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়ে আনবো না। তবে অনুমতি দিলে—

চন্দনা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কৃত্রিম কোপে বলে—খুব সাহস বেড়ে গেছে দেখছি।

—তোমার জন্যই। অমল ওকে কাছে টেনে নেয়।

আজ চন্দনার মনে কি বিচিত্র সুর জাগে। সেও যেন আজ সাড়া দিতে চায় ওর ডাকে।

—দিদিমণি! হঠাৎ কুসুমের ডাকে চমকে ওঠে ওরা।

কুসুম সবই দেখেছে, অথচ চতুর মেয়েটা ওসব না দেখার ভাণ করে। বলে

—ও ঘরের বাসনপত্র ধুয়ে ফেলবো—?

চন্দনা বলে—তাই করগে।

আজ সে যেন কুসুমের কাছেও ধরা পড়ে গেছে। ও জেনেছে তাদের মনের নিভৃত কোন সুরের অস্তিত্ব।

নদীর ধারের হিজলতলায় এসে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে কুসুম। সবুজ মাঠ-নদীর বালুচরের পরই জলধারা বয়ে চলেছে, ওদিকে খাড়া মাটির খাদ—এখন শূন্য। বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলে গেরুয়া ধারা। এখন শীত শেষের শূন্যতা জাগে। হাওয়ায় কাঁপে হিজল ঝুরিগুলো।

অতুল শুধোয়—এত হাসছিস কেন? অ্যাই কুসুম।

কুসুম বলে—তোমাদের ডাক্তারবাবুও ফেঁসেছে গো!

—মানে?

—ওই শেঠজী এসেছিল। এতো টাকা দিয়ে ওকে ওদের নার্সিং হোমে নিতে চেয়েছিল।

—সেকি! চমকে ওঠে অতুল—তাহলে হাসপাতালের কি হবে? এত লোকজনের কত উপকার হচ্ছে—তার?

কুসুম বলে—তাই বলে ট্যাকা ছেড়ে দেবে?

অতুলের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ইস্কুলের বাধা দূর হয়েছে। ভেবেছিল এবার হাসপাতাল ভালোভাবে চলবে, সার্জিকাল ওরার্ড'ও হবে। কিন্তু অমলবাবু চলে গেলে সব ভেঙ্গে পড়বে। আর ওই শেঠ অবনীবাবুরা তাই ডাক্তারকেই নিয়ে যেতে চায়।

কুসুম বলে—ডাক্তারবাবু ওদের বলেছেন—উনি যাবেন না। হাসপাতালেই থাকবেন।

—সত্যি! সত্যি বলছিস?

—হ্যাগো। আর তার মূলে কে জানো?

চাইল অতুল, কে?

—থাক! ওসব কথা তোমার শুনে কাজ নাই! কুসুম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, তোমার মত কাঠখোট্টা লোক এসবের কিছুই বুঝবে না।

অতুল কুসুমকে ধরে ফেলে।

বল!

হাসছে কুসুম। বলে—এতকাল তোমার পিছনে ঘুরছি ফিরেও চাওনি। তুমি কি করে বুঝবে প্রেম পীরিতের কথা।

তুমি পারোনি—তোমাদের ডাক্তারবাবু পেরেছেন গো।

ওই চন্দনাদিদিও—

অতুল এবার বুঝেছে। সেও খুশী।

—সত্যি ?

কুসুমকে আজ অতুল কাছে টেনে নেয়। বলে।

—তোকেও ভালোবাসিরে কুসুম।

—কুসুম বলে, থাক। আর খোসামুদিতে কাজ নাই। তাই দেখাও করতে যাও না। নতুন গানও বাঁধনা আর।

অতুল বলে—কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি রে। তবু গান বাঁধি। এবার দেখবি রুদ্রপাল পুজোয় কেমন কবিগান গাই।

—আবার ইটপাটকেল খাবা না তো ?

কুসুমের কণ্ঠে ভয়ের সুর ওঠে। সেদিন ওর রক্তাক্ত মুখখানা মনে পড়ে। বলে অতুল

—ওসবের ভয় করি না রে। তবে ওই যারা সাধারণ মানুষের বিপদই ডেকে আনতে চায় তাদের ছেড়ে দোব না।

কুসুম বলে—জ্বালা-ঝগড়া ছাড়া কি গান নাই গো ?

কত সুন্দর এই পৃথিবী, ফুল ফোটে- সবুজ এক দেশ, মানুষের মনের কথা সুর এসবের গান বাঁধনা কেন ?

অতুল বলে—বাঁধতে তো চাই রে। কিন্তু মানুষের সব সুন্দরকে যারা কালো করে দিতে চায় তাদের জন্যই জ্বালাটা বেশী হয়ে ওঠে। গানগুলোতে তাই সেই কথাই আসে—

কুসুম বলে—দুঃখ, জ্বালা তো আছেই গ কবিয়াল, এর মাঝেই আনন্দকে খুঁজে নিতে হবে। নাহলে বাঁচবে কি করে ?

আমাকে দ্যাখো—বাপটো পঙ্গু, মাতাল। তবু তো বেঁচে আছি ! হেরে যাবো কেনে গ ?

অতুল দেখছে নতুন কুসুমকে।

এতদিন পরে কথাটা ভেবেছে সে। কিন্তু বলতে পারে নি। এখন নিজেও চাকরী করে, জোর করে ভবতোষ বাবুই তাকে হাসপাতালের কাজে বহাল করেছে, ওখানের কোয়ার্টারেই থাকে।

বাবাও মারা গেছে।

আর দাদা বৌদিও চায় না অতুল এসে বিষয় আশয়, বাপের ব্যবসার ভাগীদার হোক। অবশ্য দাদা কিছু টাকা দিতে এসেছিল বলে মাস মাস তোর অংশ বাবদ কিছু পাবি—সেই টাকা অতুল পোস্টাপিসেই জমা দেয়। এখন সে নিঃসঙ্গ, একা।

তাই বলে—কুসুম, তুই আসবি আমার ঘরে ?

কুসুম যেন এই আহ্বানের প্রতীক্ষাতেই ছিল এতদিন। আজ তার মনও

কি খুশীতে ভরে ওঠে।

—কি হল? জবাব দিলি না? অতুল শুধোয়।

কুসুম বলে বাপটোর কথা ভাবি গ। ওকে কে দেখবে কবিয়াল? কটা দিন ভাবতে দাও—বাপটোকে একটু সুস্থ করতে পারলেই—

অতুল বলে—তোমার পথ চেয়েই থাকবো কুসুম। আর বাবাকে আনো হাসপাতালে, বড় ডাক্তারবাবুকে দেখাবো।

ফণী এত সহজে নড়তে রাজী নয়।

বসেবসেই কুসুম তার আহার, মায় মদও যোগায়।

মদের খর্চা তার চাইই। এবার কুসুমের উপর ভরসা তার হয়েছে।

বলে ফণী—এবার তোর বিয়ের সব ঠিক ঠাক করেছি। কুসুম ঘরের কাজ করছিল। বাবার কথায় চাইল। ইদানীং দেখছে কুসুম বাবা বাড়িতেও মদ গেলে। পয়সা কে দেয় সেটাও জেনেছে। ওই আনাজওয়ালা করালীই সেটা যোগায়। মাঝে মাঝে এ বাড়িতেও আসে করালী।

কালই টাটকা ফুলকপি, টম্যাটো আলু এসব এনে বলে—নতুন মাল এলো—আনলাম।

কুসুম দেখছে লোকটাকে। বুনো মোষের মত চেহারা। মিশ কালো বর্ণ। কুসুম বলে, এসব কেন আনো?

করালী বলে—মন চাইল আনলাম কুসুম। তা তোমার বাবা কিছু বলেনি?

—কি বলবে? কুসুম দেখছে লোকটাকে।

করালীই বলে—কথাটা, মানে আমাদের ইয়ে—বিয়ের কথা।

চমকে ওঠে কুসুম। সারা মন বিষিয়ে ওঠে। লোকটা পঙ্গু মানুষটাকে মদের লোভ দেখিয়ে আজ তার দিকেই হাত বাড়াতে চায়।

করালী বলে—আলাদা বাড়িতে থাকবো, রাজরানী করে রাখবো। ছেলেদের সঙ্গে কুণ সমন্ধ থাকবে না বিয়ে হলে। মাইরী—

কুসুম বলে—বাপের খাই না, পরি না। বরং বাপটোকেই নিজের গতর পাত করে খেটে খাওয়াই. পরাই, রোগব্যামোর চিকিৎসে করাই। ওর কথায়, বিয়ে হবে নাই। আর তুমিও ওই আশা নে বাপটাকে মদ গিলিয়ে তিলে তিলে মেরোনা। যাও—যাও এখান থেকে। লিয়ে যাও তোমার ইসব। যাও। করালী ঘাবড়ে যায়—শোনো কুসুম।

—শোনার কিছুই নাই। তুমি যাবে? না—

কুসুম আনাজ কাটা বটিটাই তুলে গর্জায়

—লাজ লজ্জার মাথাও খেয়েছো? মেয়েদের পিছনে ঘোরার রোগ এক

দিনে সারিয়ে দেব তোমার !

করালী বেগতিক দেখে সরে যায়।

ফণী এর মধ্যে ব্যাপারটা সবই জেনেছে।

করালী তাড়া খেয়ে দোকানে ফিরে দেখে ফণী লাঠি রেখে দাওয়ায় বসে পা দোলাচ্ছে। করালীকে সেও এতকাল ধাপ্পাই দিয়ে এসেছে। মেয়েকে ইদানীং ফণীও সমীহ করে। মেয়েটা ইদানীং হাসপাতালে আয়ার কাজও সুরু করেছে।

অমল ডাক্তার চন্দনার মুখে কুসুমের কাহিনী শুনেছে, নিজেও দেখেছে মেয়েটাকে। সেই রাতে রুদ্রপাল তলার গাছের নীচে কিছুটা তার কাহিনীও শুনেছিল।

ওকে হাসপাতালে আয়ার কাজেই লাগিয়েছে। কুসুম এর মধ্যে রমাদির কাছ থেকে কাজকর্মও শিখেছে। প্রসূতি বিভাগের কাজে প্রায়ই ওর ডাক পড়ে, আর কাজ করে ভালোই রোজগার করে সে।

তাই কুসুমকে ফণী বিয়ের কথাটা বলতেও পারেনি।

করালীর সম্বন্ধে তার ধারণাটাও জানে সে। তবু করালীকে স্তোকবাক্য শুনিয়েই মদের ব্যবস্থা করেছিল।

আজ করালীকে দেখে বলে ফণী।

—তোমার জন্যেই বসে আছি। কুসুমও বলেছিল একদিন যেতে। মানে বিয়ের কথাবার্তা বলে কথা, লাখ কথার কমে তো বিয়েই হয় না, তাই—হ্যাঁ, যাবার সময় একটা পাঁট নিয়ে যেতে হবে।

করালী এবার বোম ফাটার মত ফেটে পড়ে।

—তুমি ধাপ্পাবাজ, এতদিন শুধু ধাপ্পা দিয়েই মাল খেয়েছো, দোকানের সরেস আনাজপত্র মাগ্‌না খাইয়েছি, রোজ মাল দিইছি। আর তোমার গুণবতী মেয়ে কিনা বিয়ের কথা বলতে বঁটি নে তাড়া করে? যা তা বলে?

—মানে! অবাক হয় ফণী—কি করেছে কুসুম?

—কি করেছে সেই গুণবতীকেই শুধিয়ো। ওই অতুলোর সঙ্গে ওর পীরিতির কথা জেনেও রাজী ছিলাম, এখন দেখছি ধাপ্পাই দিয়েছো।

ফণী অবাক হয়—শোন করালী। একটা পাঁট আনো—ঠাণ্ডা মাথায় শোন—

—আর পাঁইটেরও দরকার নাই, ঠাণ্ডা মাথায় শোনারও দরকার নাই। ও মেয়েকে ঘরে আনলে কুনদিন শ্লা আমাকেই খা জিং জিং করে বলিদানই না দিয়ে দেয়, ওরে বাবা—যাও তো, ওঠো। আর মাল ফাল হবে না। যাও।

ফণীর ন্যুব্জ দেহটা চনমনিয়ে ওঠে। কুসুম এভাবে একটা পাকা ঘুঁটিকে নষ্ট করে দেবে তা ভাবেনি। বেশ চলছিল করালীকে দোহণ করে। এখন

তাও বন্ধ হয়ে গেল।

বেশ রাগতভাবেই ফণী ঘরে ঢুকে গর্জে ওঠে।

—কি বলেছিলি করালীকে? অ্যাই কুসুম—

কুসুম চাইল বাবার দিকে। এককালের বলিষ্ঠ লোকটা আজ পশুপ্রায়, ন্যুব্জ দেহ। বলে কুসুম

—বাপ হয়ে একটা কসাই এর হাতে শুধু মদের লোভে নিজের মেয়েকে তুলে দিতে তোমার এতটুকু বাধে না? তুমি মানুষ না একটা জানোয়ার?

ফণী দেখছে মেয়েটাকে। তারও এককালে আশা ছিল ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবে। কিন্তু নিজেই এমনি হয়ে গেল।

কুসুম বলে, বিয়ে দিতে না পারো দুঃখ নাই। তবু খেটে খুটে দুবেলা দুমুঠো যোগাচ্ছি। ফের ওই সব বুনো মোষদের কথা যদি বলো—সব ছেড়ে ছুড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। ওই নামোপাড়ার বিধুমুখীর মত বাজারেই গে বসবো শহরে—

—না! আর্তনাদ করে ওঠে ফণী।

কুসুম বলে—তাই যাবো। দেখবো ওই বুনো মোষ কদিন তোমাকে খেতে দেয়। পথে পথে ঘুরতে হবে ত্যাখন।

ফণীও তা জানে, তাই বলে—না রে! বাপ তো, তাই ভাবছিলাম—

কুসুম বলে—আর ভেবে কাজ নাই। আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও। আর শোন! কাল হাসপাতালে যাবে, বড় ডাক্তারকে দেখাবো তোমায়!

—কোন ডাক্তারই কিছু করতে পারবে না রে!

বলে কুসুম—সে দেখা যাবে। আর ঠিক করেছি হাসপাতালের ওদিকে চা পান বিড়ি, পাউরুটি এসবের দোকান করবে বলছিল কবিয়াল, ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে দোকানে বসবে।

—কিন্তু!

কুসুম বলে—সন্ধার পর একটা করে পাঁইট পাবে। তবে দিনের বেলায় দোকানে বসতে হবে।

ফণী মদের গন্ধ পেয়ে খুশী হয়। বলে—ঠিক দিবি তো?

ওদিকে করালীর সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেতে ভাবনায় পড়েছিল এখন সেই সমস্যার সমাধান হতে সেও খুশী হয়। শুধোয়

—ঠিক দিবি তো মাল?

—হ্যাঁ পাবে। আর কালই হাসপাতালে যাবে আমার সঙ্গে। তাতেও রাজী হয় ফণী। তবে একসর্তে—মাল দিতে হবে।

অবনীবাবু সব কথাগুলো শুনে অবাক হয়। শেঠজী অবশ্য একটা দারুণ চাল দিয়েছিল। অমল ডাক্তারকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে আনতে পারলে হাসপাতাল এমনিতেই বন্ধ হয়ে যেতো—কারণ সরকারী ডাক্তার এক হাসপাতাল থেকে চলে গেলে গ্রামীণ হাসপাতালে অন্য ডাক্তার সহজে আসে না।

কমপাউন্ডারই হাসপাতাল চালায়। নরু কমপাউন্ডারও কথাটা শুনে তাই খুশী হয়েছিল। বিনোদ ডাক্তার ছুটিতে গেছে, এই অমলবাবু গেলে সেই হবে সর্বেসর্বা। ওষুধ বিক্রী রোগীদের পথ্য থেকে মারাটাও বেশ জোরসে চালু করবে সে। কিন্তু অমল ডাক্তার নাকি এত টাকার লোভও ছেড়ে দিয়েছে।

আজ অবনীও বলে—তাহলে অমল ডাক্তার টোপ গিলল না?

গোপেন বলে, ব্যাটা বোকা।

শেঠজী বলে—গিলবে কেন? উধার তো বহুৎ মৌজমে হ্যায়। ওই পাগলা হ্যানিম্যান বাবাজীর লেড়কী আছে না?

গোপেন চেনে চন্দনাকে।

ওর দিকে গোপেনের নজরও আছে। বেশ সুশ্রী স্মার্ট মেয়েটা।

গোপেন বলে—হ্যাঁ—হ্যাঁ!

শেঠ বলে—ওর চক্করেই পড়েছে মালুম হোল। ওইসা মৌজ মস্তি ছোড়কে কাঁহা যায়েগা ছোকরা?

অবনীবাবু কি যেন ভাবছে।

শেঠজী বলে—গেলে সুবিস্তা হতো। নাহলে প্রবলেম বাড়তা হ্যায়। এইসা চললে নার্সিং হোম ভি তুলে দিতে হবে অবনীবাবু।

এ যেন অবনীরই পরাজয়।

স্কুল কমিটির থেকে বিতাড়িত সে। সেখানে ধর্মঘট চালু করেও হেরে গেছে জনতার কাছে। স্থানীয় লোকজন মেরে হটিয়েছে সেই বখাটে ছেলেদের। এখন পুরোদমে স্কুল চলছে। অবনীবাবুর ভয় হয় আবার নার্সিং হোম মার খেলে তারই বদনাম হবে।

ওই হাসপাতাল দেখিয়ে নির্মলবাবু, ভবতোষ বাবুরা এবার পঞ্চায়েতের ভোটেও জিতে যাবে। এতদিনকার গদিও চলে যাবে অবনীর। তাই সেও ভাবনায় পড়েছে।

অমল ডাক্তারকে হঠাতেই হবে। তার জন্য যা দরকার তাই করবে।

গোপেনও চন্দনার দিকে নজর রেখেছে।

মেয়েটা কলেজে যায় গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে। ওরা কোন বাসে যায়

তাও জানে গোপেন।

গোপেন ধানকল এর কাজে শহরে প্রায়ই যায়। কারখানার মালপত্র পাঠানো হয় ট্রাকে—ট্রেনেও। তার জন্য তাকে সহরের স্টেশনেও যেতে হয় নানা কাজে।

সেদিন কলেজে গেছে চন্দনা, ক্লাশ করে বাসস্ট্যান্ডে ফেরে। দেখে ওদের দিকের সব বাসই বন্ধ। কোথায় যাত্রীদের সঙ্গে ওই লাইনের কোন কন্ডাক্টারের কি গোলমাল হয়েছে। সেই গোলমাল থেকে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি, মারধোরও হয়েছে। তারই প্রতিবাদে সব কনডাক্টাররা দলবদ্ধ হয়ে বাস ধর্মঘট করেছে। আজ কোন বাসই গোঁসাইগঞ্জ রুটে চলছে না।

যাত্রীরাও বিপদে পড়েছে। বিপদে পড়েছে চন্দনাও।

ওদিকে গোঁসাইগঞ্জের থেকে একটা স্টেশন পড়ে তাও মাইল চারেক দূরে। সেখান থেকে মাঠের মধ্য দিয়ে আলপথ ধরে একটা কাঁদর পার হয়ে কোনমতে গোঁসাইগঞ্জ যাওয়া যায়।

তাও অনেক সময় লাগে। যদি সঙ্গী মেলে ওই স্টেশনে নেমেই বাড়ি ফিরতে হবে, নাহলে কি করবে ভাবতে পারে না চন্দনা। এখানে হয়তো শেষ তক্ কোনও কলেজের বান্ধবীর বাড়িতেই আশ্রয় চাইতে হবে।

স্টেশনের দিকে চলেছে চন্দনা। বিকাল হয়ে গেছে। সন্ধ্যার কোন ট্রেনেও যেতে ভরসা পায় না। অন্ধকারে এতটা পথ ভেঙে যেতে পারবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছে। হঠাৎ পাশেই জিপটা এসে দাঁড়াতে চাইল।

গোপেনই জিপ চালাচ্ছিল। এই বিপন্ন অবস্থার মধ্যে গোপেনকে দেখে চাইল চন্দনা।

গোপেন বলে—বাড়ি ফিরবে কি করে চন্দনা ?

চন্দনা এই অপরিচিত জনতার মাঝে এই বিপদের সময় তাদের গ্রামের গোপেনকে দেখে ভরসা পায়। বলে,

—তাই তো ভাবছি। যদি কোন ট্রেন থাকে অম্বলগ্রামে নেমে মাঠের পথে ফিরবো।

গোপেন বলে—ট্রেন তো রাত সাতটায়—

বিপন্ন বোধ করে চন্দনা। ভাবছে কি করবে। তার বন্ধু গোপাদের বাড়িতেই গিয়ে উঠবে কিনা। গোপেন বলে,

—আমি তো ফিরছি, যদি মনে করো আমার গাড়িতেই ফিরতে পারো। ধানকলে একটু কাজ সেরেই সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরবো।

চন্দনা বলে—তাহলে আপনার গাড়িতেই যাই।

—ওঠো।

গোপেন ওকে পাশেই বসায়।

জিপটা সহর ছাড়িয়ে চলেছে তাদের গ্রামের দিকে। প্রায় কুড়ি বাইশ কিলোমিটার পথ। এদিকটা নির্জনই। বেশ কিছুটা এসে নদীর ধারে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ওদের ধানকল, ওপাশে বড় শেডওয়ালা কারখানা। জলের দরকার, নদী থেকে পাম্প করে জল মেলে তাতেই ওই কারখানা, ধানকল এসব চলে।

প্রাচীর ঘেরা বিশাল এলাকা। এককালে মাঠই ছিল, এখন কারখানা হয়েছে। এদিকে অফিস, ওদিকে বিরাট শান বাঁধানো চত্বরে মেয়েরা কলের সেদ্ধ ধান মেলছে, শুকনো ধান আবার হাতগাড়িতে ভর্তি করে কলে পাঠাচ্ছে চাল বানাবার জন্য। গোপেন ওকে গাড়িতে রেখে অফিসে-কারখানায় কি সব কাজ সারতে গেছে।

এদিকে সন্ধ্যা নামছে।

মুক্ত পশ্চিম আকাশ রাঙ্গিয়ে সূর্য সেদিনের ডিউটি শেষ করে চলে গেল। সন্ধার আকাশ মুখর হয়ে ওঠে ঘরে ফেরা পাখীদের কলরবে।

তখনও গোপেনের দেখা নাই, কি সব কাজে ব্যস্ত। অবশ্য এর মধ্যে একটা লোক এসে গাড়িতেই তাকে চা বিস্কুট দিয়ে গেছে।

ভাবনা হয় চন্দনার।

অন্যদিন এতক্ষণে সে বাড়ি ফিরে যায়। তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে গগন ডাক্তার চা টা খেয়ে তার চেম্বারে যায়।

আজ বাবাও ভাবছে। অবশ্য জানবে বাস বন্ধের কথা। দু'একদিন এমন হয়েছে, সেও গোপাদের বাড়িতে থেকেছে। আজও থাকতো—কিন্তু গোপেনকে দেখে ওর গাড়িতে উঠে এখন বিপদেই পড়েছে।

কারখানার আলোগুলো জ্বলে ওঠে। সন্ধার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

এতক্ষণে গোপেন ফেরে। বলে

–নানা কাজের ঝামেলায় ফেঁসে গেছলাম। সবাই হয়েছে ফাঁকিবাজ দি গ্রেট। ফলে আমার হয়েছে জ্বালা। চলো—দেরী হয়ে গেল।

জিপ নিয়ে আবার পথে ওঠে।

এখনও প্রায় বারো কিলোমিটার পথ। পথের দুদিকে এখন সামাজিক বনসৃজনের নাম করে বেশ কিছু ইউকালিপটাস, সোনাঝুরি—আকাশমণি এসব গাছ লাগানো হয়েছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে পথে। আকাশে দুচারটে তারাও ঝকমকিয়ে ওঠে। ওদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে নদীর ব্রিজটা। এখনও বেশ কিছুটা পথ বাকি। হঠাৎ গাড়িটা থেমে যায়।

—কি হলো? চন্দনা ভীত কণ্ঠে বলে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, এবার এই ধু ধু মাঠে অন্ধকারে গাড়িটা থেমে যেতে সে ভয়ই পায়।

গোপেন বলে—ইঞ্জিনটা গোলমাল করছে, দেখি—

গোপেন নেমে বনেট খুলে এটা সেটা নাড়াচাড়া করছে আর দেখছে চন্দনাকে। এই নির্জন অন্ধকারে বসে আছে চন্দনা গাড়িতে। গোপেন তখনও কি সব নাড়াচাড়া করছে আর মাঝে মাঝে দেখছে তাকে।

—কি হলো? চন্দনা শুধোয়।

—দেখছি, যদি কোনমতে চালু করে ফেরা যায়। নাহলে মাঝ মাঠে কি যে হবে?

গোপেনও যেন ভাবনায় পড়ে।

চন্দনার ওর ভাবগতিক সুবিধের বোধ হয় না। এমনিতে দেখেছে ওকে গ্রামে মস্তানি করে। কুসুমের কাছে গোপেনের নানা গুণের কথাও শুনেছে।

আজ এই নির্জন অন্ধকারে সত্যিই বিপন্ন বোধ করে চন্দনা। গোপেন বনেট খুলে তখনও কি খুট খাট করছে, চন্দনা সিট থেকে নেমে গাড়ির পিছনে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িযে কি ভাবছে। আরও ওপাশে কয়েকটা পলাশ ঝোপের ওদিকেই দাঁড়ায়। দেখে গোপেন তাকে সিটে না দেখে অবাক।

এদিক ওদিকে খুঁজছে। গজগজ করে

—কোথায় গেল মেয়েটা। ও ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে নাকি!

চন্দনা শুনছে ওর কথাগুলো। গোপেন এই নির্জনে গাড়িটা ইচ্ছা করেই বন্ধ করেছে কোন বদ মতলবেই।

হঠাৎ দেখে চন্দনা সহরের দিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা বাস আসছে। বোধহয় ধর্মঘট মিটে গিয়ে গাড়ি চালু হয়েছে। জিপটা রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাসটাও দাঁড়িয়ে পড়ে সেই অবকাশে চন্দনাও বের হয়ে এসে বাসে উঠে পড়ে।

বাসটাও এবার পথ পেয়ে বের হয়ে যায়।

গোপেন বুঝতেই পারে নি যে তার সব মতলব ব্যর্থ করে পাখী এইভাবে উড়ে যাবে।

সে তখনও গাড়ি বন্ধ করে অন্ধকারে খোঁজাখুঁড়ি করছে। ডাকে—চন্দনা, চন্দনা।

কোন সাড়া নেই।

চন্দনা তখন বাসে করে তাদের গ্রামের কাছাকাছি এসে গেছে। আজ জোর বেঁচে এসেছে সে। আর চিনেছে ওই গোপেনকেও।

মনে হয় কুসুম ইট মেরে গোপেনের মাথা ফাটিয়ে ওকে ঠিক শাস্তিই দিয়েছিল। চন্দনাও গোপেনের এই জঘন্য মতলবের জবাব দেবে।

গোপেনও ভাবতে পারেনি যে মেয়েটা তার চোখে ধুলো দিয়ে ওই ভাবে

পালিয়ে আসবে। গোপেনের মেয়েদের উপর নজরটা একটু বেশী।

গ্রামের দু চারজন মেয়ে তার জালে ফাঁসেনি তা নয়। অবশ্য তারা ব্যাপারটাকে গোপন করেই যায় লোকলজ্জার ভয়ে, তাই গোপেনের সাহসও বেড়ে গেছে।

চন্দনার দিকে গোপেনের নজর একটু বেশীই ছিল। এর আগেও পথে ঘাটে গোপেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে চন্দনার। গোপেনই আগ বাড়িয়ে কথা বলেছে। ওর কাছাকাছি যাবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু চন্দনাই কৌশলে এড়িয়ে গেছে।

সেদিন শেঠজীর মুখে চন্দনা আর অমল ডাক্তারের ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে তারও মনটা কেমন বিচলিত হয়, ওই ডাক্তার বাইরে থেকে এসে গোঁসাইগঞ্জের কৃষ্ণের ভোগে ভাগ বসাবে এ হতে দেবে না। চন্দনাকেও এবার সে জানাবে কথাটা।

গোপেন চাকরী বাকরী না করলেও ব্যবসাপত্র দেখে পঞ্চায়েতের ঠিকাদারীর নামে লুটপাট করে যা পায় তাও কম নয়।

আর পালটি ঘর, সুতরাং বিয়ে করতেও বাধা নাই গোপেনের।

চন্দনাকে সেদিন সহরে দেখে ওকে গাড়িতে তুলেছিল, গোপেনের ইচ্ছা ছিল গাড়িটা বিগড়ানোর নাম করে ওকে ওই নির্জন পরিবেশে কিছুক্ষণের জন্য একান্তে পাবে।

তার মনের কথাগুলো জানাবে। কিন্তু চন্দনা তার আগেই ওই ভাবে চলে আসবে তা ভাবেনি। গোপেন পরদিন সকালেই এসেছে।

অমল তখন হাসপাতালে, গগন ডাক্তারও চলে গেছে তার চেম্বারে। বাড়িটা ফাঁকাই। পড়ছিল চন্দনা।

গোপেনকে আসতে দেখে চাইল সে।

—আপনি!

গোপেনও এসময় বাড়িতে কেউ নাই, সে খবর নিয়েই এসেছে। গোপেন বলে।

—কাল ওভাবে চলে এলে?

চন্দনা রেগেই ছিল। বলে—গাড়ি বন্ধ হবার নাটক করছিলেন কেন? পরে তো দেখলাম আপনার গাড়ি ঠিক চলে এলো।

গোপেন বলে—কলকব্জার ব্যাপার তো। কাল একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম চন্দনা, কিছুদিন ধরেই ভেবে ঠিক করেছি, যদি মত দাও তাহলে এগোই।

চন্দনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেখছে গোপেনকে।

গোপেন বলে—তোমাকে বিয়েই করবো ঠিক করলাম।

মানে ব্যবসাপত্র, ঠিকেদারী করছি। রোজগারও মন্দ করি না। গাঁয়ের অনেক মেয়েই রাজী, তবে চন্দনা তোমার জন্যই আমি পথ চেয়ে আছি, যদি মত দাও—

গোপেন আবেগভরে চন্দনার হাতটা ধরে ফেলে।

চমকে ওঠে চন্দনা। তার মাথায় যেন রক্ত উঠে যায়। লোকটার অসভ্য ব্যবহার আর দুঃসাহসের যেন সীমা নেই। কাল যা শয়তানি করেছে তা ক্ষমাহীন। তার জন্য দুঃখ নেই বরং এসেছে তাকে এই ভাবে অপমান করতে।

এক ঝটকায় চন্দনা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—এত অসভ্য আপনি! বাড়ি বয়ে অপমান করতে এসেছেন কালকের শয়তানির পর। কাল আপনি যা করেছেন তাতে আপনাকে ঘৃণা করি। যান—বের হয়ে যান। নাহলে চীৎকার করে লোকজন জড়ো করবো।

গোপেন বলে—শোন চন্দনা।

এগিয়ে যায় সে। চন্দনা এবার ভয়ই পায়। বাড়িতে সে একা।

হঠাৎ গোপেন কপাল ধরে বসে পড়ে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। একটা আধলা ইট কোথা থেকে এসে ওর কপালের সেই আগেকার ক্ষতেই লেগেছে। আরও একটা ঢিল এসে সজোরে ওর পিঠেই পড়ে। গোপেন কি বলতে যাচ্ছিল, আর একটা ঢিল সেই মুহূর্তে লক্ষভ্রষ্ট হয়ে উঠানে পড়তেই এবার বেগতিক দেখে আত্মরক্ষার জন্যই গোপেন কপাল চেপে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে আক্রান্ত হবে ভাবেনি গোপেন। যাবার সময় সে শাসিয়ে যায়।

—ঠিক আছে। ইট মারলে পাটকেল খেতে হয় তা বলে গেলাম। কোন মতে পালায় গোপেন।

চন্দনাও অবাক। হঠাৎ এপাশের দরজা দিয়ে কুসুমকে ঢুকতে দেখে চাইল। কুসুমের শাড়িটা গাছ কোমর করা, হাতে তখনও একটা ইটের টুকরো, গজাচ্ছে সে।

—শালা প্রধানের ভাইপোর এতবড় হিম্মত, না গেলে ওকে ইট মেরে শুইয়ে দিতাম।

চন্দনা দেখছে কুসুমকে। কুসুম বলে—ওদের ওষুধ এই, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

চন্দনার ভয় হয়। বলে—ওরা বাজে লোক। এসব না করলেই পারতিস!

কুসুম বলে—ভয় করলে ওরা মাথায় চেপে বসবে, ওদের আগে থেকেই ঘা দাও, ভয়ে পালাবে। পীরিত জানাতে আসবে বাড়ি বয়ে—আর চুপ করে থাকবে? ঝাটা গাছটা ছিল না? আঁশ বটি?—রুখে দাঁড়াও দিদি। চিরকাল

মেয়েরা মার খেয়েছে—আর নয়।

চন্দনারও মনে হয় জবাবটা তারই দেওয়া উচিত ছিল ওই শয়তানকে।

গোপেন আহত হয়ে ফিরে গিয়ে গজরাচ্ছে।

ওই মেয়েটাকে কাল হাতে পেয়েছিল, কিন্তু কিছু করার আগেই ওইভাবে চলে এসেছিল। আজ গোপেন ওখানে গিয়ে এভাবে অপমানিত, আহত হয়ে আসবে তা ভাবেনি।

এ যেন চোরের মার।

কাকা শুধোয়—কি হলরে? ভাঙ্গা কপাল আবার ভাঙ্গলো কি করে?

গোপেন এড়িয়ে যায়। বলে

—সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে দেওয়ালে, চোট লাগলো। গোপেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টাই করে। কিন্তু মনে মনে ফুঁসছে সে। সুযোগ পেলে এবার উচিত জবাবই দেবে ওই চন্দনাকে। আর মনে হয় এ যেন ওই অমল ডাক্তারেরই কাজ।

নাহলে ধারপাশে কাউকেই দেখেনি, অথচ এমন নিপুণভাবে ইট মেরে বসল কে তাকে? ওই ছোকরা বোধহয় এসব করেছে ওদের ব্যবস্থাই করবে এবার গোপেন।

জানে সে, এই ব্যাপারে শেঠজী, কাকারও সমর্থন পাবে। তবে তার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষাই করতে হবে। আর তাই করবে সে। তার জন্য গোপেন প্রস্তুত হতে থাকে গোপনে।

ফণীকে দেখেছে অমল।

কুসুমের জন্য তার দুঃখ হয়। মেয়েটা এমনিতে দামাল, দজ্জাল, হাসি খুশী। সেইই তাকে হাসপাতালে আবার কাজ দিয়েছে। মেয়েটার অভাব আছে—তাকেই সংসার চালাতে হয়, ওই লোকটার মদের খরচও যোগাতে হয়।

অথচ রোগীরা সকলেই তার কাজে খুশী। যাবার সময় ভালো বকশিসও করে যায় কুসুমকে। রমাদিও ভালোবাসে মেয়েটাকে।

অমল বলে—আর তো করার তেমন কিছু নাই। হাড় ভেঙ্গেছিল সেটা ঠিক করা হয় নি। এখন অপারেশন করলে ঠিক নাও হতে পারে। তাতে যন্ত্রণাই বাড়বে। ওষুধ দিচ্ছি—একটু ভালোভাবে চলা ফেরা করতে পারবে। তবে লিভারের যা অবস্থা মদ না ছাড়লে বাঁচবে না।

ফণী বলে—বেঁচে লাভ কি ডাক্তারবাবু, যে কদিন আছি ওসব মানা করবেন না। তবে বেশী খাবো না।

অতুলই তাকে পথের ধারে চায়ের দোকানের ভার দিয়েছে। কুসুমও আসা

যাবার পথে খবর নেয়। দোকানের ছেলেটাকে ও বলে—নজর রাখবি যেন দোকানে মদ না খায়।

ছেলেটা বলে—না গো। মাঝে মাঝে চায়ের লিকার দিই গেলাসে তাই খায় তুমার বাপ।

অমল অতুলের ব্যাপারটা জানে।

অতুল হাসপাতালের সবদিকে নজর রাখে। এখনও তার ওই গান লেখার সখ যায় নি।

মাঝে মাঝে অমলের ঘরেও আসে।

অমল শুধোয়—কি ব্যাপার অতুল? কোন কাজের কথা আছে?

অতুল বলে—না।

—তবে?

অতুল পকেট থেকে কাগজ বের করে—দুটো গান লিখেছি ডাক্তারবাবু। একটুন দেখে দিতে হবে। সুরও করেছি।

অমল বলে—আরে আমি ডাক্তার মানুষ, গান কবিতার কি বুঝি?

অতুল বলে—তা লয়। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তি আপনি। কলকাতার মানুষ। সেখানে কত বড় বড় কবি আছেন, আমি তো অজ পাড়াগাঁয়ের মুক্ষু মানুষ। শোনেন একটুন।

অতুল এর পরে গেয়ে ওঠে তার স্বরচিত গান

মন মানেনা মানুষ খুঁজি—
মনের মানুষ চাই গো—
এ দুনিযায় সবাই একা—
সঙ্গী কোথাও নাই গো—

সহজ সরল ওই গ্রাম্য তরুণের রচনায় এই মাটির উদাস করা এক বিচিত্র সুরই ফুটে ওঠে।

তার গানের টানে ওদিক থেকে চন্দনাও এসে জোটে।

ওই উদাসকরা নিঃসঙ্গ হৃদয়ের সুর যেন চন্দনাকে বিবাগী অমলের আরও কাছে আনে।

তন্ময় হয়ে শোনে অমল।

আর একজনও শোনে। কুসুম আসছিল কাজে, স্তব্ধতার মাঝে অতুলের সুর যেন তাকে এখানে কি যাদুবলে টেনে আনে।

শুনছে সেও অতুলের ওই মন উদাস করা সুর।

মানুষটা যেন জীবনে শুধু অবহেলা আর দুঃখই পেয়েছে। কারো কাছে ওর কোন দাবী নাই, অভিযোগও নাই। ওই সুরে অন্তরের নীরব বেদনাই

ফুটে ওঠে। কুসুম অবাক হয়ে শোনে ওর গান। ওদের সকলের জীবনের না বলা কোন নীরব ব্যর্থতা বেদনা মুখর হয়ে ওঠে ওর সুরে।

গগন ডাক্তারের হ্যানিম্যান হোমিও হলে এখন রোগীদের ভিড় জমেছে। দুচার জন পুরোনো রুগী আসে। বাকী সময় গগন একটা সাপ লুডোর ছক নিয়ে একা একাই লুডো খেলে। ঘুঁটিটা বেশ চলছে। সাপের ল্যাজের ঘরে পড়লে সাপ ধরে তরতরিয়ে উপরে ওঠা যায়।

কিন্তু ডাক্তারের ঘুঁটি সাপের ল্যাজে নয় পড়ে সাপের মুখেই। ফলে একেবারে নীচে পড়ে যায়। আবার গুটি চালাতে থাকে, এমনি দুর্ভাগ্য যে ঘুঁটি আবার পড়ে সাপের মুখে, ফলে নীচেই নামে। ওর বরাতই যেন অমনি। স্বপ্ন দেখেছিল অনেক কিন্তু কোনোটাই সার্থক হয়নি। নীচেই পড়েছে বার বার।

স্ত্রী মারা গেল। এদিকে প্রাকটিসও জমছে না। চন্দনার বিয়ে থা দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ছেলের বাবা যা দর হাঁকে তা দেবার সামর্থ তার নাই।

চন্দনার ব্যবহারও কেমন বদলে যাচ্ছে।

মনে হয় ওই ছোকরা ডাক্তার আসার পর থেকে শুধু তার জীবনেই নয়, সারা গ্রামের বহু মানুষের জীবনেই একটা কেমন পরিবর্তন এসেছে।

গগন ডাক্তার বাড়ি ফেরে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। অতুলের গান চলেছে ডাক্তারের ঘরে, চন্দনাও তন্ময় হয়ে গান শুনছে।

সে এসেছে তার দিকেও নজর নাই। গগন ডাক্তারের ব্যাপারটা ভালো লাগেনা।

বইপত্র সব খোলা পড়ে আছে। সংসারের কাজও হয়নি। ওদিকে এটো বাসনপত্র ছড়ানো। ডাক্তার এসময় সাধারণত ফেরে না। আজ বাজার করে নিয়ে এসেছে। আর দেখে এ বাড়ি ফাঁকা, ওখানে হাসি গানের আসর চলছে।

গগন ডাক্তার বাজার রেখে বসেছে। ঘামছে—পাখাটাও পায় না। ঢুকছে চন্দনা। গগন ডাক্তারের শীর্ণ শরীর এবার যেন চাপা রাগে ফুসে ওঠে। শুধোয়, পড়াশোনা ছেড়ে বেশ গান বাজনা হয় দেখছি। ঘরের কাজকর্মও পড়ে আছে।

চন্দনা বলে—একটু গেছলাম, অতুল নতুন গান বেঁধেছে—

—ওসব গানের আসর বাড়িতে চলবে না। ভদ্দর লোকের বাড়ি। ওই ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে দেখছি বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছিস। কিছু বুঝিনা আমি?

চন্দনা বাবার কথায় চমকে ওঠে। এমনি অপবাদ দেবে বাবা সে ভাবেনি, তাই প্রতিবাদই করে চন্দনা।

—কি যা তা বলছো ?

গগন ডাক্তারের মন মেজাজ ভালো নাই। আগেও শুনেছে নিবারণ, গণেশ ডাক্তারদের কথা।

—খাল কেটে কুমীর আনলে গগন। পরে বুঝবে !

এখন গগন ডাক্তার সেটা যেন হাতে হাতে বুঝছে। শোনায় সে মেয়েকে।

—জবাব দিতে হবে না। শেষ কথা বলছি, ওখানে আর যাবি না। নো কানেকশন। ছোকরা ডাক্তার এইসব করলে ওকেও আউট করে দেব। খবরদার, লাস্ ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম। রেগে বের হয়ে যায় ডাক্তার।

পথেই পড়ে ফণীর বাড়ি। ফণী তার কাছে যেতো লাঠি ঠুকে ঠুকে। দাওয়ায় বসে থাকতো—গগন ডাক্তারের যেন সে এক বিজ্ঞাপনের পেসেন্ট। নিবারণ, গণেশ সেদিন ওকে জবাবই দিয়েছিল। উঁচু চাল থেকে পড়ে ধুঁকছে। ওরা বলে।

—আমাদের করার কিছু নাই। সহরে হাসপাতালে নিয়ে যা, যদি বাঁচে তবে ত্যামন লক্ষণ দেখছি না।

কুসুমের চোখে জল। কি করবে সে। বলে গগন ডাক্তার,

—দে ওষুধটা খাইয়ে। তারপর দিনে চারবার করে দিবি।

জয় বাবা হ্যানিম্যান, দয়া কর বাবা।

বাবার নাম নিয়ে ওকে হোমিওপ্যাথীই খাওয়াতে থাকে। ভাগ্যের জোরেই বেঁচে ওঠে ফণী, তারপর সে তার বাঁধা পেসেন্ট।

রোজ তখন দেখতে যেত গগন ওকে। পাঁচ গাঁয়ে গগন ডাক্তারের নামও প্রচার হয়—মরা মানুষও বাঁচাতে পারে গগন ডাক্তার।

গগনও বলতো, দেখলি তো ? নিবারণ, গণেশ ডাক্তারের ওই ইনজেকশন—গাদা গাদা ওষুধের মুরোদ। জবাব দে গেল। আর ফণীকে দাঁড় করালো এই হোমিওপ্যাথী।

দু চারজন রোগীও আসতে সুরু হলো ওর চেম্বারে।

সেই ফণী ক'দিন আসেনি তার কাছে। কে জানে ব্যথা ট্যাথা বাড়ল কিনা। তাই গগন ডাক্তার নিজেই ওর বাড়িতে গেছে। দেখে বাড়ি খালি। পাশের ঝুপড়ির নিধু ডোমের ব্যাটা বলে।

—ফণী ল্যাংড়াকে খুঁজছো ? সে তো ওই দুকানে গো, এখন দুকান করেছে ওই হাসপাতালের বাইরে—

অবাক হয় গগন ডাক্তার—দোকান করেছে ? ফণী ?

—হিঃ গো। ইখন দ্যাখগে ক্যামন চালু হইছে ল্যাংড়া।

গগন ডাক্তার অবাক হয়। তার ওষুধেই লোকটা তাহলে চালু হয়ে গেছে।

এসেছে ওর দোকানে গগন।

গাছতলায় টিনের চালার নীচে দোকান, চা-বিস্কুট-ঘুঘনি পাঁউরুটি এসব বিক্রী হয়। রোগীদেরও ভিড় জমে সকাল থেকে দুপুর অবধি। দোকান ভালোই চলছে।

দেখে গগন ডাক্তার ফণী এখন লাঠি ছাড়াই হাঁটা চলা করছে আর দাম নিচ্ছে হিসেব করে। ওকে দেখে বলে—আসুন ডাক্তারবাবু। বসেন চা দিই। নবা, ফাসকেলাস করে ডাক্তারবাবুর জন্যে চা বানিয়ে দে। জলদি…

গগন ডাক্তার দেখে অথর্ব ফণী সত্যিই কিছুটা চালু হয়েছে।

গগন বলে—চা খাবনা। ওই ওষুধপত্র ঠিক মত খাচ্ছিস তো ফণী? ফুরিয়ে গেলে আনবি। ওই লাইকোপডিয়মের গুণ বোঝ এবার। স্রেফ লাইকোপোডিয়াম হানড্রেডের কেরামতি—

ফণী বলে না গো। ওই হাসপাতালের বড় ডাক্তোরবাবুর ওষুধ আর ইনজেকশনে অনেকটা ঠাড়ো হয়েছি বাবু। হ্যাঁ—ডাক্তোর নয় গো ধন্বন্তরি। একেবারে চালু করে দিলেন। তবে বললেন কোমরের ওই হাড় ভেঙেছিল তখন ঠিক হয়নি তাই বাঁকাকেষ্ট হয়েই থাকতে হবে। তবে ওই নে কাজ করছি ডাক্তারবাবুর জন্যে।

এবার গগন ডাক্তার খিঁচিয়ে ওঠে—ব্যাটা বেইমান! ওই অসুর ডাক্তার ছুঁচ ফুটিয়ে তোকে ভাল করেছে? গাড়োল! সূচীভেদ্য যন্ত্রণায় লাইকো-পডিয়ম, ওতেই সারলি। বলে কি ডাক্তোর সারিয়েছে, ঝড়ে কাক মরে ফাঁকরের কেরামতি বাড়ে। ও সারিয়েছে? কি জানে ও হোমিওপ্যাথীর? বর্বর অকাল পক্ক ছোকরা?

ফণী, ডাক্তারকে তড়পাতে দেখে বলে—আজ্ঞে আমার দোষ নাই! কুসুমই নে গেল ডাক্তোরবাবুর কাছে। ওকে খুব স্নেহ করেন কিনা—

গগন গর্জে ওঠে—আর তুই ওর ওষুধ খেলি! আমার এতদিনের পরিশ্রম জলে দিলি! খবরদার—আর আমার ওখানে যাবি না। মলেও তোকে ওষুধ দেব না। দেখছি ওই ডাক্তোরকে।

অবশ্য অমল তখন আউটডোরের রোগীদের নিয়েই ব্যস্ত। গড়ে শত খানেক রুগী আসে দূর থেকে। তাদের এক এক করে দেখে ওষুধপত্র দেয়। গগন ডাক্তার প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি যে এত রোগী আসে। আজ দেখে অবাক হয়। এর কিছু অংশ তাদের কাছে এলে তারা ধন্য হতো। তবু রাগটা পড়ে না।

ডাক্তারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে গগনকে। চন্দনার কেসে রেগেছিল, আজ আবার ওই ফণীকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে ওষুধ দিয়েছে। চন্দনাও প্রায় যাতায়াত করে ওখানে। দুজনে হাসি গল্পও হয়।

এসব এবার অসহ্য ঠেকছে গগন ডাক্তারের কাছে। চেম্বারে গিয়ে গুম হয়ে বসেছে গগন ডাক্তার। হঠাৎ অবনীবাবুর বাড়ির সরকার রামনিধিকে আসতে দেখে চাইল।

—একবার অবনীবাবুর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। ডাকলেন বাবু আপনাকে।

ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না গগন ডাক্তার।

—আমাকে কল দিয়েছেন অবনীবাবু ?

অবনীবাবুদের বাড়ির চিকিৎসার জন্য নিজেদের নার্সিংহোমের ডাক্তার আছে। কখনও অবনীবাবু তাকে ডাক্তার বলে মানেনি। আজ তাই তাকে ডাকতে দেখে অবাক হয়। বলে।

—আমাকে যেতে হবে ওঁর বাড়িতে ?

সরকার বলে—হ্যাঁ।

অবনীবাবু এবার অন্য পথেই এগোতে চায়। ও জানে গগন ডাক্তারের দুর্বলতম জায়গাটা। গোপেনও সেই সকালে চন্দনার বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে বের হয়ে এসে পথ খুঁজছে কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

সে কাকার এই বুদ্ধিতে সায় দেয়।

দারুণ হবে কাকাবাবু।

ওই গগন ডাক্তার এসেছে অবনীর বাড়িতে।

অবনী বলে এস ডাক্তার। কিছুদিন ধরে পেটের গোলমালে ভুগছি, তা গিরিধারী, তোমাদের সহরের ডাক্তার বলে গ্যাসটিক। অপারেশন করাতে হবে। ওই কাটা ছেঁড়াকে খুব ভয় করি হে।

রক্তপাত! ওরে বাবা! ওসব ভাবতেই পারি না। তা গোপেন বললে তুমি নাকি অনেক গ্যাসটিকের রুগীকে হোমিওপ্যাথীতে ভালো করেছো, এবার আমাকে বাঁচাও ডাক্তার!

গগন ডাক্তার যেন খুশীতে এবার আকাশেই উড়ে যাবে। বলে সে—হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাস থাকলে এ ওষুধে কথা বলে অবনীবাবু।

—তাইতো তোমাকে ডেকেছি।

গগন এবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জেরা সুরু করে।

—ঠাণ্ডা না গরম ভালো লাগে? দাঁত কিড় মিড় করে? বেদনা কোন দিকে? ডাইনে না বাঁয়ে।

অবনী যাহোক উত্তর দেয় নিরীহ পেসেন্টের মত।

গগন এবার ওষুধ দিয়ে বলে—দিনে তিনবার। আর ধূমপান নিষেধ। জর্দাও চলবে না।

অবনী পকেট থেকে নগদ কুড়ি টাকা বের করে বলে—আপনার ভিজিট, ওষুধের দাম।

এতটা আশা করেনি গগন। তার ভিজিট চার টাকা। তাও নগদে কতবার পেয়েছে মনে পড়ে না। বলে—এত!

অবনী বলে—ডাক্তারের কড়ি ঠিকমত না দিলে ওষুধেও কাজ হয় না। রাখো এটা। আর কাল পরশু এসে দেখে যাবে। এখন আমাকে ভালো করার দায়িত্ব তোমার ডাক্তার।

গগন ডাক্তার বিগলিত কণ্ঠে বলে—নিশ্চয়ই। আপনি ভাববেন না, দুদিনেই ফল পাবেন। পরশু দেখে যাবো। চলি।

গগন ডাক্তার খুশী মনে বের হয়। এতদিন পর অবনীকেই আসতে হয়েছে তার কাছে। দেখবে এবার হোমিওপ্যাথীর এলেম।

অবশ্য গগন ডাক্তার বের হতে অবনী পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরিয়ে বলে—এই লেবেনচুষের গুলিগুলো তুই খা, মদন। পয়সা দিয়ে কেনা, ফেলে দেবো?

গোপেন বলে—ভয় নাই। ওতে কিছুই হয় না। খেয়ে ফ্যাল মদন।

মদনা ইতিউতি করতে গোপেনই খেয়ে ফেলে। মদনা দেখছে।

গোপেন বলে—ব্যাটাকে তো কিছুই বললে না কাকা, ওই হ্যানিমানের বাচ্চাকে?

অবনী বলে—একটু ধাতে আসুক। প্রথমে কিছু বললে বিগড়ে যেতে পারে। দুচারদিন আসুক—ঘরবশ হোক। তারপর দোব ওকে কড়া হোমিও-প্যাথীর ডোজ। এখন দিলে ভড়কে গিয়ে পালাবে। ক্ষেত্র তৈরী হলে বীজ বোনো, গাছ হবে। বুঝলি?

কাকাবাবুর মাথাটা খুবই উর্বর। তা বুঝেছে গোপেন অবশ্য, না হলে এই এলাকার মানুষদের এতদিন বোকা বানিয়ে নিজের সাম্রাজ্য গড়তে পারত না। এবার ওর চাল ঠিক কার্যকর হবেই তা বুঝেছে গোপেন। আর সেটা হলে সেও হাত বাড়াবে চন্দনার দিকে। ওই মেয়েটার ডাঁট সে ভেঙ্গে দেবে।

শেঠ মুকুন্দরাম ব্যবসা আর নাফা এ দুটো ভালোই বোঝে। তাই ওই হরিয়ানায় গিরিধারীর বিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রার সাথে। কারণ চন্দ্রার বাবার জমি জায়গা দিল্লীর বাড়ি এসব মিলিয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে গিরি-ধারীই। আর চন্দ্রা এই পরিবেশ, গিরিধারী তার বাবা মাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই রোজই অশান্তি বাধে। চন্দ্রাও চায় এখান থেকে চলে যেতে। গিরিধারী প্রথম প্রথম স্ত্রীকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চন্দ্রা

কেমন যেন এড়িয়ে যায় তাকে।

এক ঘরে শোয়। কিন্তু চন্দ্রা একটা চাদর বালিশ নিয়ে নীচেই শোয়। গিরিধারী এগিয়ে আসে—চন্দ্রা!

চন্দ্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—এখানে এনে আমাকে কেন আটকে রেখেছো? অন্যত্র থাকার চেষ্টা করো। তোমার বাবা মাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।

—কিন্তু বাবা মা—তাদের ছেড়ে দেব?

—তাহলে আমাকেই ছেড়ে দাও। একটা মেরুদণ্ডহীন অমানুষ যে তার স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারে না, তার সঙ্গে বাস করতে চাইনা।

চন্দ্রাও প্রতিবাদমুখর হয়ে আরো বলে,

—কেন বিয়ে করেছিলে তা জানি। তোমার বাবা একটা লোভী শকুনি।

—যা তা বলবে না! গিরিধারী ফুঁসে ওঠে।

চন্দ্রা বলে—যা সত্যি তাই বলছি। আমার বিষয় আশয়ের লোভেই তোমার বাবা ওখানে তোমার বিয়ে দিয়েছিল।

গিরিধারীর কাছে চন্দ্রা যেন একটা বিষ কাঁটা হয়ে উঠেছে। তাই ক্রমশঃ চন্দ্রাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে গিরিধারী সেখানে ওই লতিকাকেই বসাতে চায়।

মেয়েটাকে ভালো লাগে তার। তাই অবনীবাবুর বাড়িতে আসে প্রায়ই। আর লতিকার মা লক্ষ্মীও গিরিধারীকে খুব খাতির যত্ন করে। গিরিধারী তাই আসে সন্ধ্যার পর।

বড় বাড়ির দোতলার ওদিকে লতিকার ঘর।

লতিকাও দেখেছে গাঁয়ের ছেলেরা তার ওই বিপুল দেহের জন্য নানা জনে নানা নামে ডাকে। মেয়েরাও হাসাহাসি করে। কিন্তু গিরিধারী আসে—গল্প করে, মুগ্ধ নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকে।

লতিকা তখন চোখ বুজে না দেখার ভান করে কোন প্রেমসঙ্গীত গেয়ে চলেছে। গিরিধারী বোধহয় সুর বোঝে না। সে ওই বিকট দেহটা থেকে নিসৃত বিকট আওয়াজকেই মিষ্টি সুর ভেবে নেয়। শোনে মুগ্ধ শ্রোতার মত।

কোন কোনদিন গিরিধারী বের হয় লতিকাকে নিয়ে গাড়িতে করে। লতিকা আর স্কুলেও যায় না। কারণ অনেকেই টিটকারী দেয়। বাড়িতে শীতল বাবু ওকে যা হয় পড়ায়। আর গিরিধারী মাঝে মাঝে ওকে গাড়িতে নিয়ে সহরে কেনাকাটা করতে আসে। ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিকে। না হয় সিনেমায় যায়।

মুকুন্দরামও এসব খবর জানে। সেও অমত করে না। কারণ শেঠ জানে

লতিকাই অবনীবাবুর ধানকল, কারখানা প্রচুর বিষয় আশয় সহরের বাড়ি সবকিছুর মালিক। তার দামও প্রায় লাখ সত্তর আশি না হয় কোটি খানেক তো হবেই। সেইটাই এবার কৌশলে হাতাবার মতলব আঁটছে মুকুন্দরাম। তাই অবনীকে সেও মদত দেয়।

আর ছেলের এই মেলামেশাতেও বাধা দেয় না।

কিন্তু চন্দ্রা সব খবরই পায়। তার বাড়ির কাজের মেয়েটা গাঁয়েরই মেয়ে। ছিরিও জানে গাঁয়ে কি হচ্ছে। সেই বৌরানীকে খবর দেয়।

—দাদাবাবু এখন তো পেরায় ওই প্রধানের মুটকি হাতি মেয়েটার সঙ্গে গাড়িতে ঘোরে। সাঁঝবেলায় ওর গান শুনতে যায়।

ছিরিই বলে—প্রধানের ম্যালা টাকা, কারখানা গো। ট্যাকার কুমীর। তার একমাত্র মেয়ে। দাদাবাবু জমেছে জোর ওখানে

চন্দ্রা শোনে সবই। ও চেনে এই গিরিধারী, তার বাবা মাকে। মাও তেমনি খান্ডারণী।

গিরিধারী সেদিন বাড়ি ফিরতে চন্দ্রা বলে—অভিসার শেষ হলো? আজ কেমন গান শুনলে ওই মুটকি হাতির?

গিরিধারী চাইল। চন্দ্রা বলে—ওখানে কেন ভিড়েছো তা জানি। অবশ্য এটা তোমার স্বভাব।

—কি বলছো যাতা! গিরিধারী রেগে ওঠে।

চন্দ্রা ধীর কণ্ঠে বলে—ঠিকই বলছি। আমার টাকা বিষয় এর লোভে ওখানে ভিড়ে আমাকে ঠকিয়েছ আবার কাউকে তেমনিভাবেই ঠকাতে চাইছ। ওই লতিকারও সর্বনাশ করতে চাও?

—খবরদার! গিরিধারী গর্জে ওঠে—ওসব কথা বললে ভালো হবে না।

চন্দ্রা বলে—নিছক সত্যি কথা শুনে রেগে উঠছো দেখছি।

গিরিধারী চন্দ্রার দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনেও ভয় হয়।

চন্দ্রা সব জেনে গেছে তার মতলবের কথাটা। ওকে সে এতটুকু বিশ্বাস করে না। আর এও জানে গিরিধারী, চন্দ্রা তার জীবনে শান্তি আনেনি, সে তাই নতুন করে বাঁচার কথা ভাবছে। লতিকা তাকে ঠকাবে না।

কিন্তু তার আগে চন্দ্রাকে সরাতেই হবে। নাহলে চন্দ্রা তার জীবন পদে পদে দুর্বিসহ করে তুলবে।

তবু কথাটা সে প্রকাশ করতে চায় না। বরং চন্দ্রাকে বলে—মিথ্যা কথা-গুলো শুনে কেন মিছেমিছি উত্তেজিত হচ্ছো চন্দ্রা। ছাড়োতো ওসব কথা।

সে চন্দ্রাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে তার মনের রাগটাকে মুছে ফেলতে চায়। দেখাতে চায় চন্দ্রা যা শুনেছে সবই ভুল।

গিরিধারীর বৌ এর কথাগুলো মুকুন্দরামের স্ত্রী শুনেছে। ওই মুটকি-

শেঠিয়ানও চোখ কান খোলা রাখে। বৌ এর উপর সে হাড়ে চটা। তারে বিষয় সম্পত্তিও এসে গেছে ছেলের হাতে সুতরাং বৌ এর মেজাজ সে শুনতে রাজী নয়।

এবার সেও চায় গিরিধারীর অন্য জায়গায় আবার বিয়ে দিয়ে বেশ কিছু মাল কড়ি ঘরে তুলতে। শেঠিয়ান সেদিন কান পেতে শোনে চন্দ্রার ওই কথা গুলো।

শেঠিয়ান বৌকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়না। বাইরের খবরগুলো তাকে কে দিতে পারে? শেঠিয়ান পরদিনই ছিরিকে তার ঘরে ডেকে এনেছে। বেশ বুঝেছে শেঠিয়ান ওই মেয়েটা বৌরানীর সঙ্গে গল্প করে। আর সেইই খবর দেয় বৌকে। ওই লতিকার খবরও।

শেঠিয়ানী বলে—কাল থেকে তোকে কাজে আসতে হবে না।

ছিরি অবাক হয়—কেনে গো? কি করলাম আমি যে জবাব দিচ্ছ?

—কাল থেকে আসবি না।

ছিরিকে তাড়িয়েই দিল ওরা। শেঠিয়ানও বুঝেছে চন্দ্রা এই ব্যাপারটাকে সহজে মেনে নেবে না। তবু এটা তাকে করতেই হবে, তার ভবিষ্যৎ কার্য-সিদ্ধির জন্যই তাকে আট ঘাট বেঁধে চলতে হবে।

ছিরি বলে—তা আসবো না। গতর খাটালেই ভাত মিলবে। তবে বাবু এও বলছি তোমার মতলব আমি বুঝেছি, ছিরি এত বোকা নয়।

—কি বুঝেছিস? শেঠিয়ানী ঝাঁকিয়ে ওঠে।

ছিরি বলে—সেটা পরেই দেখা যাবে। তখনই বলবো শুধু তোমাকেই নয়, সবাইকে।

মেয়েটা বেশ ডাঁট দেখিয়ে গতর দুলিয়ে বের হয়ে আসে চন্দ্রাও শুনেছে খবরটা। মেয়েটাকে ওরা তাড়ালো যাতে চন্দ্রা গ্রামের কোন খবরই জানতে না পারে।

চন্দ্রাও মনে মনে রেগে ওঠে। বেশ বুঝেছে এরা সমবেত ভাবে তাকে এবার কঠিন শাস্তিই দিতে চায়।

গগন ডাক্তারের মেজাজ বেশ চড়ে গেছে। এতদিন ধরে নিবারণ, গণেশ ডাক্তারদের মুখে অবনীবাবুর প্রশংসা শুনে সে বলত—ওটা বাজে লোক। ওর নার্সিংহোম চালাবার জন্যই হাসপাতাল হতে দিচ্ছেনা।

সেদিন চেনেনি ওকে। এবার দেখছে অবনী সত্যিই ভালো লোক। হোমিওপ্যাথীতে ওর এখন দারুণ বিশ্বাস হয়েছে। একদিনের ওষুধেই নাকি ওর পেটের ব্যথা সেরে গেছে।

গগন বলে—না বাবাজী। ওটা সাময়িক; তবে ওষুধে ধরেছে। তুমি

চালিয়ে যাও একমাস। ব্যাধি একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। আবার ওষুধ দেয়। অবনীও যথারীতি কুড়ি টাকা দিয়ে বলে—বাঁচালেন আমায়। হোমিওপ্যাথীর এত শক্তি তা জানা ছিলনা। আমার মনে হয় হাসপাতাল ফাসপাতাল তুলে দিয়ে গ্রামে হোমিওপ্যাথীর হাসপাতাল খোলাই উচিত। কম পয়সায় গরীবদের সুচিকিৎসা হবে। সরকারকে তাই লিখছি।

গগন ডাক্তার গদগদ হয়ে ওঠে—এতদিন এটা কেউ বোঝেনি এখানের লোক—আমি বুঝেছি ডাক্তারবাবু। ওই আসুরিক চিকিৎসার দরকার নাই।

তারপরই অবনী বলে—ওই ছোকরা ডাক্তারকে শুনি আপনি আশ্রয় দিয়েছেন আর ওখানে ওটা নাকি গান বাজনা করে, মেয়েদের নিয়ে হৈ চৈ করে।

তারপরই গলা নামিয়ে বলে—নার্সরাও নাকি যাতায়াত করে ওখানে? আপনার বাড়ির আবহাওয়াও নষ্ট হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু, সুনামও। আপনার মেয়েও রয়েছে।

গগন ডাক্তার এবার অবনীর কথাগুলো বিশ্বাস করে। মনে হয় কথাগুলো সত্যিই। কুসুমও আসে, চন্দনাও যায় গানের আসরে আর কে আসে কে জানে!

অবনী দেখছে গগনকে। ও কি ভাবছে।

অবনীর মনে হয় তার ওষুধও ধরেছে ডাক্তারকে। তাই আরও এক ডোজ দেয় অবনী—মেয়ের বিয়ে থা দিতে হবে, যদি তার নামে ওসব বদনাম রটে কি হবে বলুন তো? একটা আইবুড়ো ছেলে—আজ আছে, কাল নাই, যদি কিছু অঘটন ঘটিয়ে চলে যায় কি সর্বনাশ হবে!

অবশ্য হবেই তা বলছি না ডাক্তারবাবু, তবে সংসারী মানুষ এসব ভাবনা চিন্তা করতে হয় তো। আর আপনাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি, আমার এতবড় উপকার করলেন, তাই সাবধান করা কর্তব্য বলেই করছি।

গগন বলে—না, না। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি অনেক বেশী বাবাজী। ঠিকই বলছো।

ওই ডাক্তার ছোকরা এসে আমার ওখানে থেকে আমারই রোগী ভাঙ্গাবে। ওই ফণীতো মরেই গেছল, হ্যানিম্যানের আশীর্বাদে হোমিওপ্যাথীতে ওকে বাঁচালাম তাতো জানো?

গোপেন বলে—হ্যাঁ, ওতো সবাই জানে ডাক্তারবাবু। আপনিই ওকে বাঁচালেন।

—আর ওই ফণী এখন ছোকরা ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে বলে—ওই ওষুধেই খাড়া হয়ে দোকান করছি।

অবনী অবাক হয়—তাই নাকি। বুঝলেন ধর্ম—কৃতজ্ঞতা এবার আর

নাই। মানুষের মন থেকে ওসব মুছে গেছে। তাই এত অশান্তি, অনাচার। গ্রামেও এসব এনেছে বাইরের ওই ছোকরা।

গগন ডাক্তার এবার গভীরভাবেই ভাবছে কথাটা। তার মগজে একবার যেটা সেঁধিয়ে যায় সেটা আর বের হয় না। হোমিওপ্যাথীটা ওর মাথায় ঢুকে শিকড় গজিয়েছে, তেমনি এবার ছোকরা ডাক্তারের কাজগুলোকেও সে এবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছে।

আর অবনীর কথাগুলোর গুরুত্ব ততই বেশী অনুভব করছে। একটা বিহিতই করা দরকার। আর আজই করবে সে।

অমল বিকালে হাসপাতাল থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করছে। চন্দনা কলেজে। তখনও ফেরেনি।

গগন ডাক্তার এবার এসে হাজির হয় অমলের ওখানে। আজ সারা দুপুর ধরে সে ভেবেছে। মায় ফণীর কথাগুলোও তাকে তাতিয়ে রেখেছিল এর পর অবনীবাবুর ওই সব উপদেশ শুনে তৈরী হয়েই এসেছে গগন ডাক্তার।

—আসুন। ডাক্তারবাবু। অমল উঠে বসে। চেয়ার এগিয়ে দেয়।

—বসুন।

—থাক। গগন ডাক্তারের ওই কণ্ঠস্বরে চাইল অমল।

—কি ব্যাপার?

এবার গগন ডাক্তারের শীর্ণ দেহ জগমুক্ত ধনুকের মত সোজা হয়ে ওঠে। বলে সে।

—ন্যাকা! কলকাতার ন্যাকা ভদ্রতা রাখো তো হে ছোকরা!

—মানে? অমল ততই অবাক হয়।

গগন ডাক্তার আজ গর্জে ওঠে—আমার রোগী ভাঙ্গালে সইলাম, ওই ফণীকে বাঁচালাম, ওকে ওষুধ দিয়ে চলেছো। ব্যাটা বেইমান বলে—আমি নই, তুমিই ওকে সারালে?

—আপনি এ নিয়ে রাগ করছেন? ওর হাড়টা সেট হয়নি—বরাত জোরে বেঁচে উঠেছে।

—না, আমার হোমিওপ্যাথীতে, বুঝলে ছোকরা! আমার বাড়িতে থেকে গান টান গাওয়াচ্ছো, মেয়েরাও নাকি আসে, বলি গাঁয়ে বসে এসব অনাচার করবে—আর সইবো?

অমল এবার গম্ভীর ভাবে বলে—এসব কি বাজে কথা বলছেন?

—স্বচক্ষে দেখেছি! ইন ওন আই। জবাব দেয় গগন।

—কি দেখেছেন বলুন। অতুল গান গাইছে—এই তো?

এর বেশী কিছু 'ওন আই' এ দেখেনি সে। তাই গগন ডাক্তার বলে

—ওসব জানিনা। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে। আমারও ফ্যামেলি প্রেসটিজ আছে। তাই আজ বলছি তোমার সঙ্গে নো কানেকশন। এ বাড়ি থেকে এবার চলে যেতেই হবে তোমাকে। এসব সইবো না।

অমল বলে—বেশ তাই হবে। আপনার ফ্যামিলি প্রেস্টিজ নিশ্চয়ই বজায় থাকবে। আমি আজই চলে যাচ্ছি এ বাড়ি থেকে। আমিও চাইনা আমার সম্মানে কেউ কোন কটাক্ষ করুক।

গগন ডাক্তার ভাবতে পারেনি যে অমল এক কথাতেই এখান থেকে চলে যাবে। সেও তা চায় নি। হঠাৎ কি হয়ে গেল মাথার মধ্যে ওদের কথা শুনে তাই তেতে পুড়ে দুটো কড়া কথা শোনাতে চেয়েছিল, এভাবে চলে যেতে বলেনি।

এবার অমলের গম্ভীর মূর্তি দেখে ঘাবড়ে যায় গগন ডাক্তার। বলে—না, তা নয়। মানে

অমল তার বইপত্র, কাপড় চোপড় গোছাচ্ছে। হাসপাতালের ওদিকে তার একটা নিজস্ব ঘর, লাগোয়া বাথরুম আছে। একা মানুষ সেখানেই চলে যাবে। বলে সে।

—মানে খুবই স্পষ্ট গগনবাবু, এখানে আপনার আশ্রয়ে থাকা আর সঙ্গত নয়। তাই চলে যাচ্ছি।

গগন ডাক্তার চুপ করে থাকে।

এর মধ্যে অমল গোছগাছ সারা করে ন্যাপাকে ডাকে।

ন্যাপা ভাবেনি যে তার চাকরী এইভাবে অতর্কিতে খতম হয়ে যাবে। এখানে বেশ জমিয়ে বসেছিল সে। এখানের বাসা এক ঝড়ে ভেঙ্গে পড়বে কাকের বাসার মত তা ভাবেনি।

অমল বলে—হাসপাতালে আমার ওদিকের ঘরে এসব মালপত্র নিয়ে যা। এবার থেকে ওখানেই থাকবো।

ন্যাপা বলে—এ বাড়ি ছেড়ে দেবেন ?

—হ্যাঁ। চল। একটা ভ্যান রিক্সা ডেকে আন। চলি গগনবাবু, অন্যায় করে থাকলে মাপ করবেন। নমস্কার।

ওর সামনে দিয়ে বের হয়ে গেল অমল। গগন ডাক্তার নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় তার ওষুধ প্রয়োগ একেবারে 'ওভার ডোজ' হয়ে গেছে। কিন্তু করার কিছুই নাই। যা হবার তা হয়ে গেছে।

চন্দনা বাড়ি ফিরেছে কলেজ থেকে। ওদিকে উঠোনের কুয়োতলায় কুসুম মুখ বুজে বাসন মেজে চলেছে। বাড়ির পরিবেশ কেমন থমথমে। বাবা তখন চেম্বারে বের হয়ে গেছে, যেন চন্দনাকে এড়াবার জন্যই আজ একটু

আগেই বের হয়ে গেছে।

চন্দনা বইপত্র রেখে হাত মুখ ধুয়ে বলে কুসুমকে—চা কর।

কুসুম অবশ্য আগেই চা চাপিয়েছে। এসময় চন্দনা দুকাপ চা নিয়ে বার বাড়িতে গিয়ে অমলকে উঠিয়ে চা দেয়। আজ কুসুমকে এককাপ চা বানাতে দেখে বলে—ডাক্তারবাবুর চা কই?

কুসুম চন্দনাকে কাপটা দিয়ে বলে—উনি চলে গেছেন এখান থেকে।

চন্দনার বুকে যেন আঘাতটা বাজে। আর্তকণ্ঠে বলে—চলে গেছেন?

কুসুম বলে—হ্যাঁ এ বাড়ি থেকে চলে গেছেন।

—কেন? কি হয়েছিল?

কুসুম বলে—বাবু ডাক্তারবাবুকে কি সব বললেন, এখানে নাকি গান বাজনা হয়। মেয়েরা আসে, মৌজমস্তি হয়—

—সেকি!

—হ্যাঁ, বাড়িতে এসব হতে দেবেন না। এসব শুনে ডাক্তারবাবুই চলে গেলেন আজই। হাসপাতালের ওদিকে মাঠের ধারে ওই ঘরটায় উঠেছেন।

চন্দনা কি ভাবছে। বাবা ক'দিন থেকে হঠাৎ অবনীবাবুর খুবই ভক্ত হয়ে পড়েছিল। অবনীবাবুর নাকি দারুণ পেটের রোগ, এত এলোপ্যাথীতে সারেনি, এবার তার চিকিৎসাতেই নির্ভর করে আছে। আর হোমিওপ্যাথীতে কাজও হয়েছে দারুণ।

অবনীবাবুও এবার এই গগন ডাক্তারের কদর বুঝেছে। কুড়ি টাকা ভিজিট ওষুধের দাম দেয় হপ্তায় দু দিন।

এসব যে অবনী বাবুরই চক্রান্ত এটা বুঝেছে চন্দনা। আর বোকা ভালো মানুষটাকে এই ভাবে হাতে এনে এবার সময়মত তার মগজে এইসব বদচিন্তা ঢুকিয়ে ওই অমলবাবুকে তাড়িয়েছে বাড়ি থেকে। এখানেই যে শেষ হবে এর তা নয়, এরপর হাসপাতাল তুলে দেবার জন্য—অমলকে তাড়াবার জন্য অন্য পথও নেবে ওরা।

অমল ডাক্তারের ওই হাসপাতালের ওদিকের ঘরে চলে আসার খবরটা অতুল জানা মাত্র এসে পড়ে। সেই সুইপার দিয়ে ঘরটা সাফ করিয়ে মুছিয়ে দেয়। জিনিষপত্রগুলো গোছগাছ করে রাখে।

অমল চুপ করে বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছে। গ্রামের বাইরে ঘরটা, বেশ নিরিবিলিই। গ্রামটাকে দেখা যায় না, ওটা হাসপাতালের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

এদিকে বিস্তীর্ণ ধান মাঠ, ওপাশে রুদ্রপাল তলার বিশাল প্রাচীন বট-

গাছটা দেখা যায়। সবুজ ধান খেতে প্রকৃতির নীরব প্রশান্তি ফুটে ওঠে।

অতুল বলে—ভালোই হলো ডাক্তারবাবু, নিরিবিলিতে থাকবেন নিজেদের ঘরে। ওই পাগলা ডাক্তারের মাথার ঠিক নেই।

অতুল চা এনে দেয়।

ন্যাপা ওদিকে রান্নাঘর সাফ করছে। এখানে আবার নতুন করে সংসার পাততে হবে। অবশ্য ন্যাপার ভালোই হয়েছে। ওখানে গাঁজা ধরালেই টের পেত গগন ডাক্তার।

—ফের চিমনিতে আগুন দিইছিস?

এখানে ওসব বালাই নেই। প্রেমসে গঞ্জিকা সেবন চলবে তার। এর মধ্যে এক ছিলিম চড়িয়েও নিয়েছে।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

এই মুক্ত প্রকৃতির মাঝে দিন বিদায়ের একটি ধ্যানমগ্ন রূপ আছে। দূরে গ্রামসীমার ঊর্ধাকাশ আবীর রং-এ ভরে উঠে, সূর্য ধীরে ধীরে নেমে আসে অস্তাচলে। ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব শুরু হয়ে যায় আগে থেকেই। ওরাও ঘরের সন্ধান জানে।

হঠাৎ চন্দনাকে আসতে দেখে চাইল অমল।

—তুমি!

চন্দনা বলে—এভাবে না বলে চলে এলেন কে ?

—তোমার বাবাকে তো বলে এসেছি।

অমলের কথায় চন্দনা বলে—বাবা! বাবা যদি একটা মানুষ হতো আমার কপালে এত দুঃখ হতো না। মা গেছে বাবার জেদেই। এবার আমাকেও না যেতে হয়।

ওর চোখে জল। অমল বলে,

—গ্রামের লোক নাকি পাচ জনে পাঁচ কথা বলে। আমার সম্বন্ধে যে যা বলে বলুক। অন্য কেউ নির্দোষ তার সম্বন্ধে কোন কথা বলার সুযোগ যাতে না পায় তাই নিজেই এখানে চলে এলাম চন্দনা।

চন্দনা বলে—ওসব বাজে কথায় কান দিই না।

—কিন্তু সমাজ যে দেয়। তাছাড়া তোমার বাবাও পছন্দ করেন না। এই ভালো আছি।

চন্দনা দেখছে অসীম শূন্যতার মাঝে এই ঘরের আশ্বাস। অমল বলে —আমি বাইরের মানুষ, পরিচয়ও জানা নেই। তাকে ঘরে ঠাঁই না দেওয়াই উচিত। তবু এতদিন রেখেছিলেন এর জন্য আমিও কৃতজ্ঞ. তখন তো এই ঘরখানাও হয়নি, কোথায় যে থাকতাম।

চন্দনা বলে—বাবার উপর রাগ করে চলে এসেছেন, আসলে ওসব কথা

বলতে চায়নি বাবা। ওকে দিয়ে বলানো হয়েছে। আর কারা—কেন সেটা বলিয়েছে তা আপনিও জানেন।

অবশ্য এর মধ্যে ভবতোষবাবু, নির্মল বাবুরাও এসে গেছেন। ওরা বলেন—ভালোই হয়েছে ডাক্তার, এখানেই এসেছো। তা ওর হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে কিছু বলেছিলে নাকি?

অমল বলে—ফণীকে ওষুধ, ইনজেকশন দিয়েছি—

ওঁরা কেন সারা অঞ্চলের লোক দেখেছে ল্যাংড়া হেটমুণ্ড অথর্ব ফণী এখন ঘাড় তুলে চায়ের দোকান চালাচ্ছে আর নেশাও করে না ততো। তখন দিনরাত মদ গিলতো চুরি করে, কুসুমকে মারধোর করে পয়সা নিয়ে।

এখন সেই লোকটা চায়ের দোকান নিয়ে ব্যস্ত।

ভবতোষ বলে—একটা মিরাকল ঘটিয়েছ ডাক্তার। ফণী এখন পাঁচ গাঁয়ের আলোচনার বস্তু।

—ওর হোমিওপ্যাথীতেই এসব হয়েছে, আমি বেইমান।

—ওসব পাগলামি ছাড়োতো!

অমল আসল কথাটা বলতে পারে না গগন ডাক্তারকে। বলতেও চায় না। চন্দনাকে বলে,

—এখানে আসা যাওয়া না করাই ভালো চন্দনা—

—কেন? ওদের ভয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে?

—তা নয়। তবে তোমার বাবার কানে যারা এসব কথা তুলেছে তাদের মতলব মোটেই ভালো নয়। তাই সাবধান থাকাই ভালো। নাইবা এলে।

চন্দনার দুচোখ ছাপিয়ে জল আসে। এক নিমেষে সব পরিচয় ওই কলকাতার মানুষরা ভুলে যেতে পারে। বলে চন্দনা,

—ঠিক আছে। তাই হবে। আপনার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক!

আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেল চন্দনা।

অমল চুপ করে বসে আছে। তারাগুলো জ্বলে উঠেছে। এবার একবার হাসপাতালে ঘুরে আসবে ওয়ার্ডগুলোতে, কাজ কিছু নেই। তবু রোগীদের খবর নেওয়া তো হবে।

অবনী, মুকুন্দরামের দল বসে নেই।

নার্সিংহোম রাখতে গেলে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওদিকে নিবারণ, গণেশ, বদ্যিনাথরাও সুযোগ খুঁজছিল, গগন ডাক্তার এতদিন ওদের দলের বাইরে ছিল, এখন সেও তাদের দলে এসে গেছে।

আজ অবনীবাবুর ওখানে ওরা সবাই এসেছে। গগন ডাক্তারও বীরদর্পে অবনীর বৈঠকখানায় ঢুকে বলে,

—তাড়িয়েছি ওই গোবদ্যিটাকে! দুপাতা ইংরাজী পড়ে আর মড়া কেটে ডাক্তারী করতে এসেছে। কি জানে হোমিওপ্যাথীর? এ সমুদ্র-মহাসমুদ্র। কি অবনী বাবাজী—বলো পেটের কলিক ব্যথা, গ্যাস সব নির্মূল করেছি কিনা?

অবনী বলে—তা সত্যি।

—তেমনি ওই ছোকরাকে বাড়ি থেকে নির্মূল করেছি আজ।

ওই ছোকরা ডাক্তারকে আউট করেছি। নো কানেকশন। যা ব্যাটা মাঠে মাঠে গাঁয়ের বাইরে পড়ে থাকগে।

নিবারণ বলে—বাড়ি থেকে তাড়ালে ভালো, কিন্তু এ গাঁ থেকে তাড়াতে পারলে না?

বদ্যিনাথ বলে—হবে। সে ব্যবস্থা আমিই করছি। গুপীটাকেও বলেছি।

অবনী অবাক হয়—গুপী! ওই যাত্রার দলের বিবেক করে, গলা বেড়ে চীৎকার করে সেই গেজেলটা কি করবে?

বদ্যিনাথ কবিরাজ কবরেজীই করে না। সে কবরেজখানায় বসে লাল খেরোর খাতায় এর মধ্যে তেইশখানা নাটক লিখেছে। তাতে পৌরাণিক, ধর্মমূলক সামাজিক নাটকও আছে। গ্রামের যাত্রার দলের মোশন মাস্টারিও করে। আর লম্বা তেকাঠির মত দেহ নিয়ে যাত্রার আখড়া ঘরে গাঁয়ের রাখাল ছেলেগুলোকে নিজেই কোমর বাঁকিয়ে হেলে দুলে নাচও শেখায়।

বদ্যি কবরেজ একাধারে অনেক কিছুই। অতুল ওর নামে সেবার সং বেঁধেছিল—

ডেকে বদ্যি কবরেজ কয়
গোর করিসনে রে ভয়
গুড়ুরবাদের ভাই সাহেবরা বজায় থাকলে হয়।
টাকায় তিন গণ্ডা বড়ি
ভাঙ্গবো ডাক্তারের জারি জুরি—

সকলেই বেশ উপভোগ করেছিল। অতুল বদ্যিকবরেজের মত লেংচে লেংচে হেঁটে ওরই স্বর ভাবভঙ্গী নকল করে আসর মাৎ করেছিল।

বদ্যি কবরেজের রাগটা তখন থেকেই ছিল অতুলের ওপর। এবার অতুলকেই টেক্কা দিয়ে কবি গান গাইবে সে ওই ছোকরা ডাক্তারের সম্বন্ধে নানা কেচ্ছা করে।

আর ওই গুপীকেও তালিম দিচ্ছে গাঁজার খরচা যুগিয়ে।

ওর মতলবটা শুনে অবনীর মনে হয় একটা কিছু করা যেতে পারে।

এককথায় গগন ডাক্তারের বাড়ি থেকে চলে গেছে অমল। এতে মনে হয়

ছোকরার আত্মসম্মানবোধ প্রবল। সেখানে ঘা দিতে পারলেই ছোকরা অনায়াসেই এই চাকরী ছেড়ে চলে যাবে।

তাহলেই অবনী মুকুন্দরামের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। হাসপাতালও বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই যাবে নার্সিংহোমে আর অন্যরা নিবারণ, গণেশ, বদ্যিনাথদের কাছেই ফিরে যাবে।

গ্রামদেবতা রুদ্রপালের পুজো হয় বেশ ঘটা করে।

গ্রামের বাইরে ওই বিশাল বটগাছের নীচে সারা বছর পড়ে থাকে শিলাখণ্ড। ক'দিন ধরে ওটাকেই ভক্তিভরে তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করা হয় ঢাকঢোল বাজিয়ে। ফাঁকা মাঠে তখন মেলা বসে। দোকান পাটও আসে অনেক।

গ্রামের সর্বজনের পুজো করার অধিকার ওখানে। শূদ্র-নমোশূদ্ররা তিনদিন দিনে উপবাসী থেকে রাতে হবিষ্যান্ন করে সন্ন্যাসী হয়। ক'দিন তারা আর ব্রাত্য নয়।

উৎসবে কবিগান—যাত্রাও হয়। আর বের হয় সং।

সারা অঞ্চলের বিভিন্ন দল ছেলেমেয়ে দেবদেবী সেজে নানা লৌকিক সমস্যা—ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান বাঁধে। সমালোচনামূলক কেচ্ছাও পাওয়া হয়।

এবারও উৎসব বেশ ধুম করেই হবে। তার আয়োজন চলছে। অতুলও তার দলবল নিয়ে ব্যস্ত।

চন্দনার কাছে বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে।

সেই সন্ধ্যায় ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে এসে চন্দনা বাবাকেই বলেছিল কথাটা।

গগন ডাক্তার তখন অবনীবাবুর কথাই ভাবছে।

চন্দনা বলে—ডাক্তারবাবুকে কি বলেছিলে তুমি? একজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে গ্রামে এসে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করছে, ওখানে থাকলে কত পেত, মায় এখানের ওই মুকুন্দ শেঠ ওকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাবার জন্য পনেরো হাজার টাকা মাসে দিতে চেয়েছিল—ও তা যায় নি।

আর সেই লোকটাকে যা তা বলে তাড়ালে বাড়ি থেকে? ডাক্তার বলো নিজেকে? সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত, দরকারী পেশার লোকটাকে এইসব বলে অপমান করে তাড়াতে এতটুকু বাধল না?

গগন ডাক্তার একটু ঘাবড়ে গেছে ওইসব কথা শুনে। সে বলে—তেমন কিছু বলিনি।

—বলনি? কে তোমাকে ওসব কথা বলেছিল বলোতো? নিশ্চয়ই ওই

অবনীবাবু।

—বলো। চুপ করে আছো কেন? বিশ টাকা ফি দিয়ে তোমাকে কিনে নিলো আর ওখানে গিয়ে ল্যাজ নাড়ো।

—ও আমার পেসেন্ট।

—ছাই। ওসব ধাপ্পাই। তোমাকে চিনি না? আজীবন পরের কথায় নেচে নিজের সর্বনাশ করেছো। অবনীবাবু মুকুন্দরাম শেঠ এর নার্সিংহোম তাদের গলাকাটা চিকিৎসার ধান্দা উঠে যাবে—তাই ওরা ডাক্তারের পিছনে লেগেছে তা বোঝ না?

গগন ডাক্তার কি ভাবছে। শুধোয়,

—অমল শেঠজীর এত টাকার চাকরীতে যায় নি?

—না। তাই ওপথে কাজ না হতে অন্যপথই ধরেছে, তোমাকে কাজে লাগিয়েছে মাত্র কুড়ি টাকা ভিজিট দিয়ে। এত টাকার লোভ তোমার?

গগন ডাক্তারের সব ভাবনা চিন্তা ওলট পালট হয়ে যায়।

বলে সে—এমন কিছুই বলিনি। মানে বাড়িতে গানটান হয়, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে।

—কি হয় তা না জেনেই ওসব বললে?

—আমি না হয় বললাম, আসলে যদি মিথ্যেই হয় তাহলে ও চলে গেল কেন রাগ করে? একসঙ্গে থাকতে গেলে এমন হয়, তাই বলে চলে যাবে?

—হ্যাঁ। মান সম্মান যাদের আছে তারা সরেই থাকে নোংরামির থেকে।

চন্দনার কথাগুলো ভাবছে গগন ডাক্তার। এতগুলো টাকা দিতে এসেছিল শেঠজী ছোকরাকে, ও যায় নি। কেমন শ্রদ্ধা বাড়ে অমলের উপর। মনে হয় একটা ভুলই করেছে গগন ওই অমলকে তাড়িয়ে।

গগন পরদিন গেছে অবনীকে দেখতে। বৈঠকখানায় নেই অবনী। ভিতরে আছে। আসবে। গগন ওর ড্রয়ারটা খোলা দেখে চাইল আর অবাক হয় তার এতদিনের দেওয়া সব ওষুধগুলো তেমনিই রয়েছে। একটা গুলিও খায়নি অবনী।

অথচ তারই ওষুধ খেয়ে যে সেরে উঠেছে বারবার এই কথাটাই বলেছে। তাকেও ধাপ্পা দিয়েছে অবনী।

চন্দনার কথাগুলো মনে পড়ে। সেই বলেছিল যে অবনী ওষুধ খাবার ছল করে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েই ডাক্তারকে তাড়িয়েছে গ্রাম থেকে।

এর মধ্যে অবশ্য একদিন রাতে হাসপাতালে চুরি হয়ে যায়। গ্রামে চুরি চামারি বড় একটা হয় না। যদিও বা হয় তা সিটকে চুরি। ঘটি-বাটি-নাহয়

কাপড় চোপড় এই সবের উপর দিয়েই যায়।

এবার চুরি হয়েছে হাসপাতালের স্টোরে। দরজায় তালা লাগানো থাকে; ঘরটা মেন বিলডিং-এর একপাশে। দরজার তালা ভেঙ্গে রাতের বেলায় কারা স্টোরের দামী ওষুধপত্র, ইনজেকশন কম্বল বেশ কয়েক হাজার টাকার মাল নিয়ে গেছে।

সকালে নার্স রমাদি ওদিকে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারে, তারপর অমলও এসে পড়ে। খবর পেয়ে আসেন ভবতোষবাবু, নির্মলবাবু, পরেশ বাবুরাও।

থানাতে খবর দিয়েছে অমল।

দারোগাবাবু আসার আগে অবনীবাবুও এসে পড়ে, পিছু পিছু আসে শেঠজীও।

—একি হয়ে গেল ডাক্‌দার বাবু, আপনি খুদ হাসপাতালে থাকতে চোরি হয়ে গেল।

অমল বলে—আমি কি নাইট গার্ড দেব! হাসপাতালে এর আগে এসব হয়নি।

দারোগাবাবু শুধোয়—আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ডাক্তারবাবু?

অমল বলে—আমি বাইরের লোক, এখানে কারা এইসব পুণ্যকর্ম করে থাকে সেই মহাপুরুষদের দারোগা হয়ে আপনি চেনেন না চিনবো আমি? আমি নাম ঠিকানা সব বলে দেব চোরদের আর তারপর আপনারা ধরে আনবেন?

দারোগাবাবু ঘুঘু লোক। এইসব অভিযোগ শুনে শুনে তার কান পচে গেছে। সে বলে,

—না। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় স্টাফদের সহযোগিতা না থাকলে চুরি করা সম্ভব নয়। এসব ওষুধ চোর বিক্রী করবে কোন দোকানে, নাহয় হাস-পাতালেই ফিরে আসবে আবার।

মুকুন্দরাম বলে—তা হোতে পারে। আমাদের নার্সিংহোমে ভি একবার চোরি ধরলো হামি, এক এস্টাফ কে।

অমল বলে—আমাদের স্টাফরা সন্দেহের উর্ধে। তারা বুক দিয়ে হাস-পাতালকে আগলে রেখেছে, চুরি হয়েছে বাইরে থেকেই, যাতে হাসপাতালের নামে বদনাম দেওয়া যায় তার জন্য।

অবনী বলে—এসব মনগড়া অভিযোগ। ডাক্তারবাবু, কিছু মনে করবেন না, টাকার লোভ বড় লোভ। আপনিও বাদ যান না।

অমল বলে—সকলের কাছে নয় অবনীবাবু, সে লোভ থাকলে হাস-পাতালের এই দিনে একশো পেসেন্ট, এত বেডের রোগীদের ঝামেলা ছেড়ে

আপনার নার্সিংহোমের পনেরো হাজার টাকার মাইনের আয়াসের চাকরীই নিতাম। তা নিইনি, কি শেঠজী বলুন?

মুকুন্দরাম চুপ করে থাকে।

ভবতোষবাবু অবাক হন—সেকি!

অমল বলে—শেঠজীকেই শুধোন। তাতে কাজ না হতে হাসপাতালের ওপর এসব বদনাম দেবার জন্য চুরি করানো হয়েছে তাও হতে পারে।

দারোগাবাবু, কিছু ক্লু আপনাকে দিলাম—তদন্ত করুন। হয়তো চোরের সন্ধান পাবেন।

দারোগাবাবু এবার বিপদে পড়ে। সে অবনীবাবু মুকুন্দ শেঠজীর বশংবদ লোক। একটা মধুর সম্পর্ক ওদের সঙ্গে। সেটা নষ্ট হতে দিতে চায় না।

দারোগা বলে—কি কি চুরি হয়েছে সেসব রিপোর্ট দিন। আমরা জোরদার তদন্ত করবো।

অমল হারানো ওষুধপত্র মাল-কম্বল এসবের লিস্ট আগেই কেরানীবাবু অতুলকে দিয়ে করিয়েছিল। সেই লিস্ট তুলে দেয়।

ভবতোষবাবু বলেন—এখন এসব ওষুধের দরকার। নির্মলদা কিছু টাকা তো চাই। সরকার থেকে ওষুধ আসতে দেরী হবে।

অবনী মুকুন্দরাম চুপ করে সরে যায়। ওরা খুশীই হয়েছে এই সকল চুরিতে।

এবার হাসপাতালকে নিয়ে বেশ বিপদেই পড়েছে অমলও। দু চারদিন অমলরা ওষুধ দিতে পারে না। রোগীদের বেশ কিছু ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। এ নিয়ে জনতার মধ্যে গুঞ্জরণ ওঠে। অনেকেই বলে—সরকারী মাল, দরিয়ামে ডাল, এবার তাই শুরু হয়েছে।

গোপেন এই চালটা দারুণ চেলেছে।

ওর পঞ্চায়েত এম-এল-এ ইলেকসনের ভোটে খাটার জন্য কিছু বিশেষ বাহিনী আছে। তারা এই অঞ্চলের কুখ্যাত লোকই। বাস স্ট্যান্ড, বাজারে তাদের দু চারজন তোলা তোলে। হাটবারে তাদের আয়পয় ভালোই হয়।

ঈশ্বর তাদের অন্যতম।

ছেলেটার জুয়ার ছকে দারুণ হাত চলে। চোখের নিমেষে গুটি পালটে দিয়ে সবটাকা সে জিতে নিতে পারে। ইদানীং বাসে-বাজারে সে মহাজনদের পকেটে, থলিতেও হাত সাফাই-এর খেল দেখিয়ে বেশ ভালোই রোজগার করে।

বোমা বানাতেও পারে। আর তালাচাবির কাজও জানে। তার হাতের ছোঁয়ায় অনেক তালাই সহজে খুলে যায়। ভোটের সময় সে জান লড়িয়ে দেয়। অবনীবাবু ওর জন্যই ভোটে জেতে। ছাপ্পা ভোট—ধাপ্পা ভোট—

জাল ভোট সবই দিতে ঈশ্বর ওস্তাদ। তাই দারোগাও তাকে ধরে না।

গোপেন ঈশ্বরকেই ফিট করে হাসপাতালে; অনেক টাকার ওষুধ আছে। দামী ওষুধ, সাফ করতে হবে। পারবি!

ঈশ্বর বলে—ওসব আমার বাঁ হাতের খেল। কিন্তুক গোপেনবাবু, টাকা কড়ি, গহনা হলে সুবিধা হয়, ওই সব ওষুধ, কম্বল ইনজেকশন নে কি হবে? বিচতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবো। হজম করবো কি করে?

গোপেন বলে—ওসবের জন্য তোকে ভাবতে হবে না। পেটি ভর্তি মাল এনে দিবি আমাকে, আমিই তোকে টাকা দেব, ক্যাশ।

গোপেন জানে ওসব তাদের নার্সিংহোমেই লেগে যাবে। তাই ঈশ্বরও রাজী হয়ে যায়। বেশ গুছিয়ে ওষুধপত্র সব সাফ করে এসেছে ঈশ্বর তার দলবল নিয়ে। মাঝ মাঠে মাল চুরি করে আনতে কোন অসুবিধাই হয়নি।

কাজটা একেবারে নিঃশব্দে ঘটে গেছে।

কুসুম গ্রামের গেজেট। এত বড় কাণ্ডটা ঘটে গেল সে জানতে পারেনি। তাই তার মনে হয় এ নিয়ে কিছু জানা দরকার।

অতুলের মন মেজাজ ভালো নাই। দারোগাবাবু হাসপাতালের স্টাফদের ঘরও দেখেছে। অতুলের ঘরে ঢুকে ঢোলটাই ঘা মেরে ফাঁসিয়ে দেয়। ঢোলটা তার প্রিয়। অবশ্য পায়নি কিছুই দারোগাবাবু। তবু তাদেরই শাসিয়ে গেছে। অমল প্রতিবাদ করে—আমার স্টাফদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবেন না। দেখলেন, এবার দয়া করে অন্যত্র তদন্ত করুন গে।

অতুল রেগেই ছিল।

কুসুম এসেছে। আজ কুসুম বুঝেছে হাসপাতালকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র চলেছে। ডাক্তারবাবুকে তারাই ওখান থেকে তাড়িয়েছে। ওই ডাক্তারবাবুর কাছে সে ঋণী। তার বাবাকে কিছুটা সুস্থ করে তাকে কর্মক্ষম করে তুলেছে। ফণী এখন রাতে এক গেলাস মদ মাত্র খায়। বলে, —এটা ছাড়লে শরীর টিকবে না রে।

তবে মাতলামী করে না আর। দোকান তাকে বদলে দিয়েছে।

অতুল বলে—শেষে চোর বদনাম দেবে সবাই।

কুসুম বলে—চোর নও গো।

—কিন্তু হাসপাতালের বদনাম তো হলো, ডাক্তারবাবুরও।

কুসুম বলে—চোর ঠিক ধরবোই একদিন।

এর মধ্যে রুদ্রপালতলার উৎসব শুরু হয়েছে। এবার জোর সং হবে শোনা যাচ্ছে। যাত্রার আসরও বসবে। মেলাও জমে উঠেছে।

বিরাট আসরে এক একদল তাদের সং দেখাবে। সারা এলাকার মেয়ে

পুরুষ এসেছে। এলাকায় ক্যানেলের জল দেবার নামে ফাঁকি দিয়ে জলকর নেওয়া নিয়েই সং শুরু হয়।

আসরের একদিকে মান্যগণ্য লোকদের জন্য খানকয়েক চেয়ার আনা হয়েছে স্কুল থেকে। বাকী সবাই আসরের চারদিকে ঘিরে বসেছে।

ওদিকে অবনীবাবু, মুকুন্দরাম—এদিকে ভবতোষ বাবুরাও রয়েছে। আর জনতা তাদের পছন্দমত সং পেলেই তাদের উৎসাহিত করছে।

এরপর শুরু হয় বদিকবিরাজের দলের সং।

গুপী এক ডাক্তারবাবু সেজেছে আর যাত্রার দলের ফিমেল পার্ট করে ভোলা, সে সেজেছে একটি আধুনিকা কলেজে পড়া মেয়ে। গ্রামের ডাক্তারবাবু গ্রামে চিকিৎসা করতে এসে রাসলীলা শুরু করেছে ওই মেয়েটির সঙ্গে। তাকে নানা উপহার দেয়—হার গড়িয়ে দিয়েছে হাঁসপাতালের রোগীদের ওষুধ চুরি করে।

বদ্যিনাথের বাধনে নেচে নেচে গাইছে ডাক্তার বেশী গুপী, আর ওই আধুনিকা—

প্রেম করেছি হার পরাবো
ডাক্তারখানার ওষুধে—
চাঁদবদনি ধনি আমার
কাছে থাকবে বঁধু হে—
তুমি হবে প্রাণের সাথী—

হঠাৎ অতুল আর কারা কলরব করে ওঠে এসব কি হচ্ছে? এসব নোংরামি। গান থামাও—

নেচে নেচে গাইছে গুপী

—সত্য কথা বলছি সভায়
রাগ করোনা ভাই
রুদ্রপালের তলায় ও ভাই
রাগ করিতে নাই—

জনতা হৈ হৈ করছে। ভবতোষবাবুরা, অমল ডাক্তার অবাক।

অবনী বলে—সাবাস গুপী।

তারপরেই হঠাৎ আচমকা এক ঢিলে গুপী নাক চেপে বসে পড়ে। রক্ত ঝরছে।

অবনী, গোপেন গর্জে ওঠে, অ্যাই—

তার পরের ঢিলটা নিপুণ লক্ষ্যে বড় ডে লাইটের কাঁচে এসে লেগে নিমেষের মধ্যে চুরমার হয়ে যায়, অন্ধকারে ডুবে যায় আসর।

আরও দু'একটা ইঁট ঢিল পড়তে এবার জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কলরব

ওঠে—কে ? ধর—ধর।

কিন্তু কে কাকে ধরে। জনতা চারিদিকে। কে ঢিল ছুঁড়ে সেই জনতায় মিশে গেছে জানা যায় না। তবে সেই ঢিলে গুপীনাথের নাক ফেটেছে আর বদ্যিকবরেজের টাকে এমন জোর কসেছে যে বদ্যিনাথের বেঁহুস হবার মত অবস্থা। রুদ্রপালতলার মেলায় অমন অঘটন কখনও ঘটেনি।

গতরাতের ওই বিশ্রী সং-এর কথাটা ভুলতে পারেনি অমল। প্রকাশ্য সভায় তাকে লক্ষ্য করে এইভাবে চুরি—চরিত্রহীনতার কথা ওরা প্রচার করতে পারে এভাবে, তা কল্পনাও করেনি সে।

চুপ করে বসে আছে অমল।

ওদিকে হাসপাতালে রোগীদের ভিড় শুরু হয়েছে। একা বিনোদবাবু পারছে না। ভবতোষবাবুও এসেছেন সকালে। কালকের রাতের ওদের ওই বিশ্রী প্রচেষ্টা দেখেছেন তিনি।

অমলকে অন্যদিন দেখেন সে আউটডোরে বসে পড়েছে। আজ সে নেই। ভবতোষ দেখে একটু অবাকই হন। ওদিকে রোগীদের ভিড় জমছে। নানা গুজবও ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে।

কে বলে, বড় ডাক্তারবাবু চলে গেছেন বোধহয়।

—তাহলে কি হবে ? একজন রোগী অসহায় কণ্ঠে বলে। কেউ বলে

—এদিকে তলে তলে এইসব হচ্ছিল ডাক্তারবাবুর।

অন্যজন তাকেই ধমকে ওঠে—চোপ বে। ডাক্তারের নামে একটা কথা বললে মুখ ভেঙ্গে দোব। শালা অবনীর দালাল।

কে বলে—তাহলে হাসপাতাল বন্ধই হবে ? ওদের নার্সিংহোমে যেতে হবে আবার তিনগুণ টাকা দিয়ে। এসব ওদেরই মতলব ! ওই শেঠের বাচ্চা আর অবনীর।

ভবতোষবাবুকে দেখে ওরা এগিয়ে যায়। কে বলে,

—বড় ডাক্তারবাবু নাকি চলে গেছেন ?

ভবতোষও ভাবেনি এসব। অমল চলে যাবে তা ভাবেন নি। বলেন,
—দেখছি আমি।

•

অমল চুপ করে বসে আছে। ভবতোষবাবুকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—আসুন। ভালোই হয়েছে।

ভবতোষবাবু বলেন—আউটডোরে যাওনি। ওদিকে রোগীরা ছটফট করছে।

অমল বলে—এসবের পরও এখানে থাকতে বলেন ? এসেছিলাম গ্রামের

মানুষদের সেবা করতে, তার এমনি প্রতিদান পাবো ভাবিনি। তাই ভাবছি তারা যদি না চায় আমাকে, কলকাতাতেই ফিরে যাবো।

ভবতোষ দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে ওকালতি করার পর জজ-এর কাজও করেছেন। তিনি মানুষ চেনেন। জানেন অমলকে ওই লোকগুলো মিথ্যা বদনামই দিয়েছে। ভবতোষবাবু বলেন,

—না। তুমি যাবে না। আমরা জানি এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর ওই অবনীবাবুদেরই ষড়যন্ত্র। তুমি চলে যাবে ওদের কাছে হার মেনে মুখ লুকিয়ে? ওদের দেওয়া অপবাদটা সত্যই ভাববে সবাই।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়বে আর যা সত্য তা একদিন প্রকাশ পাবেই। এই লড়াই করার সাহস তোমার আছে তা জানি অমল।

অমল কি ভাবছে! ভবতোষের কথায় সেও যেন জোর পায় মনে।

ভবতোষবাবু বলেন—চলো। ওরা অপেক্ষা করছে। ওই রোগীরা তো কোন দোষ করেনি। ওদের সেবার জন্যই যদি এসে থাকো তবে লোকের বাজে কথা শুনে ওদের উপর অবিচার করবে?

অমলও কথাটা ভাবে।

সে তো হেরে পালিয়ে যেতে আসেনি। এর মূলে কারা তা সেও অনুমান করেছে। এসব অগ্রাহ্য করেই সে থাকবে এখানে ওই মানুষদের জন্যই।

অমল এসে আউটডোরে ঢোকে। যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে রোগীদের দেখতে শুরু করে।

অতুল খুশিই হয়। সেও জানে সব ব্যাপারটা। তবু ওদের সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে অমল ডাক্তারকে এসে রোগী দেখতে শুরু করতে দেখে এবার অতুলও রোগীদের টিকিটগুলো পর পর সাজাতে থাকে। উৎকণ্ঠিত রোগীদের বলে,

—লাইন দাও বড় মিঞা, অ খুদু, শান্ত হয়ে বসো। ডাক্তারবাবু সবাইকে দেখবেন গো।

হাসপাতালের ইনডোরেও খবরটা পেঁছে যায়।

মতিবুড়ি বেডে বসে বলে—ছেলে কি মাদের ফেলে চলে যেতে পারে না, বলিনি ও যাবে না। ওই মুখপোড়াদের বিচের বাবা রুদ্রপাল নিজেই করবেন। ধম্মো এখনও আছে। ওদের মুখে পোকা পড়বে।

গগন ডাক্তার কাল রাতে রুদ্রপালতলাতে ছিল। বেশ হৈ চৈ আমোদ আহ্লাদ চলছিল। তারপরই ওই বদিকবরেজের দল গুপীনাথ ভোলাদের নিয়ে বাইরের ওই ডাক্তার আর এখানের কোন মেয়েকে (গগন ডাক্তার কেন, উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারে মেয়েটি তার মেয়ে চন্দনাই, ওরা সং-এ নাম দিয়েছিল

মেয়েটির, আইন বাঁচিয়ে, বন্দনা) জড়িয়ে শুরু করে ওই গান নাচ, তারপরই অবশ্য কারা ঢিল পাটকেল মেরে আসর লণ্ডভণ্ড করে দেয়, চোট করে গুপী-নাথকেও। জনতাও উঠে পড়ে আসর ভেঙ্গে।

কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। এ গ্রামের আশপাশের গ্রামের লোকদের মনেও একটা প্রশ্ন ওঠে। লোকের সুনাম সহজে কেউ মেনে নেয়না। কিন্তু বদনামটা সহজেই মেনে নেয়। তাই চন্দনাকে নিয়েও কিছু প্রশ্ন ওঠে মেয়েমহলে আর সেটা চন্দনার কানেও পৌঁছেছে।

চন্দনাও ভাবতে পারেনি প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুকে জড়িয়ে এমনি খেউর গাইবে কেউ। চন্দনা -- তাদের গ্রামের ছন্দা, জবারাও ছিল। ওরা একত্রে কলেজে যাতায়ত করে।

ছন্দা বলে—কি রে চন্দনা, এইসব চলছিল বুঝি, তাই বোধহয় বুঝতে পেরে তোর বাবা ডাক্তারকে তাড়িয়েছে?

রেবা বলে—ডাক্তার তো নয়, নটবর।

ওরা ফিরছে মেলা থেকে। মেলাতে তখন আবার আলো জ্বলেছে ওপারে। লোকজন আবার ভাঙা আসর জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ততক্ষণে চরম ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

লোকজন বেশীর ভাগই চলে গেছে, ওরাও ফিরছে। চন্দনার চোখে জল আসে। বন্ধুদের কোন কথারই জবাব সে দেয় না।

বাড়ি এসে একাই কি দুঃসহ বেদনায় অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এই বেদনায়, গ্লানিতে সান্ত্বনা দেবারও কেউ নাই। মায়ের ফটোটার দিকে চেয়ে কান্নাভেজা স্বরে বলে,

—বিশ্বাস করো মা, আমি কোন অন্যায়, কোন পাপ করিনি। এসব মিথ্যা, মিথ্যা মা!

চন্দনার মনে হয় বাবা যদি ওই অবনীবাবুদের পাল্লায় না পড়তো, অমল বাবুকে এখান থেকে চলে যেতে না হতো তাহলে এসব কোন কথাই উঠতো না। এসব অবনীবাবুদের চক্রান্ত। নিরীহ ভালোমানুষ লোকটাকে বদ কথা শুনিয়ে তাতিয়ে দিয়ে অমলবাবুকে চন্দনার সঙ্গে জড়িয়ে এই বদনাম দিতে পেরেছে।

চন্দনা জানে অমলবাবুর মত আত্মসম্মানী লোক এইসব জঘন্য অপবাদ শুনে আর এখানে থাকবে না। চলেই যাবে আর অবনীবাবুরাও তাই চান, যাতে জনসাধারণ আর হাসপাতালের সেবা না পায়। ওদের নার্সিং হোমের ব্যবসাই ভালো চলবে।

ভোর হয়ে আসে। চন্দনা যেন স্বপ্ন দেখে কে তাকে ডাকছে। হয়তো অমলবাবু চলে যাবার আগে দেখা করতে এসেছেন।

চন্দনার সব হারিয়ে যাবে। অমলও চলে যাবে, শুধু ক'দিনের বেদনাময় স্মৃতিটুকুই থাকবে।

চমকে উঠে চন্দনা। না। কেউ ডাকেনি।

শেষ রাতে স্তব্ধতার মাঝে কোথায় দু'একটা সদ্য ঘুমভাঙ্গা পাখীর কলরব ভেসে আসে। ঘুম আসে না চন্দনার। ভাবছে আবার ঘটনাটা। আর ততই যেন নিজেকে অমলের কাছে ছোট বলে মনে হয়। তারজন্যই অমলের মত মানুষকে এই বদনাম সইতে হবে।

গগন ডাক্তার ভোরে উঠে একটু ঘুরতে বের হলো। চন্দনা দেখে বিছানা থেকে।

বাবার জন্যই এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বসে আছে। গগন ডাক্তার বেড়িয়ে ফিরেছে। বলে সে, হাসপাতালের লোকদের মুখে শুনলাম অমল নাকি চলে যাবে।

চন্দনা ফুঁসে ওঠে এবার। এতক্ষণ এ নিয়ে বাবার সঙ্গে কোন কথাই বলেনি।

—তুমি খুশী হবে তো?

—মানে?

চন্দনা বলে—এবার বুঝেছো ওই অবনীবাবুরা তোমাকে দিয়েই এই এলাকার মানুষের সর্বনাশটা করালেন। ডাক্তার চলে গেলে হাসপাতাল উঠে যাবে—নিজেদের সুবিধা হবে। কদিন মিথ্যা করে ডেকে কুড়ি টাকা করে বকশিস দিয়ে দিল তোমাকে, আর বাবা হয়ে ওই কটা টাকার লোভে নিজের মেয়ের নামে এত বড় কলঙ্ক দেওয়ার সুযোগ করে দিলে, তাড়ালে অমলবাবুর মত একটা মানুষকে চরম মিথ্যা বদনাম দিয়ে।

গগন ডাক্তার ক্রমশঃ ব্যাপারটা বুঝছে।

সেও দেখেছে কালকের গোপেনদের ব্যাপারটা। ওরা এত নীচে নামবে তা ভাবেনি। দেখেছে অবনীবাবুকে। খুব খুশী সে।

গগন ডাক্তার বলে—তখন এসব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। তুই ঠিক বলেছিস, অবনী আমার ওষুধ এক ডোজও খায়নি। ধাপ্পা দিয়েছে আমাকে।

চন্দনার চোখে জল। কান্নাভেজা স্বরে বলে চন্দনা—এসবের জন্য তুমি, তুমিই দায়ী বাবা। দেবতার মত একটা মানুষকে এভাবে অপমান করার পথ করে দিলে। সারা অঞ্চলের গরীব মানুষ এবার ওই হাতুড়ে গোবদ্যিদের হাতেই মরবে। দেখলে বদিকবরেজের কাণ্ড।

গগন গুম হয়ে বসে ভাবছে।

তার কাছে ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়।

উঠে পড়ে সে। চন্দনা বলে,

—কোথায় চললে ? অবনীবাবু কেমন খুশী হয়েছে তাই দেখতে ?

আর তোমাকে পাত্তাই দেবে না। কাজ হয়ে গেছে তার।

গগন ডাক্তার সাড়া দিল না। বের হয়ে যায়।

কি ব্যাকুলতা নিয়েই আসছে গগন ডাক্তার হাসপাতালের দিকে। হয়তো হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে আজই। দেখে রোগীরা আসছে দূর গ্রাম থেকে।

বাইরে রোগীদের কি আলোচনা চলছে। তখনও আউটডোর চালু হয়নি। এর মধ্যেই গুঞ্জরণ ওঠে। রোগীদের কণ্ঠে কাল রাতের ওইসব নোংরামীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

কে বলে -বোঝনা মামু, এসব ওই অবনীবাবু, শেঠজীদের চাল। ডাক্তারবাবুকে বদনাম দে তাড়াতে চায়।

তারপর গগন ডাক্তারকে ওদিকে যেতে দেখে বলে গলা নামিয়ে—ওই দলের আর একজন যেছেন গো। হানিমুনের বাচ্চা—উনি আবার গুলিবাজ।

গগন ডাক্তার অন্য দিন হলে এসব কথার জবাবে হ্যানিম্যানের হয়ে লড়ে যেতো। আজ সেই মানসিকতা তার নেই। আজ সে অনুতপ্ত। ওদের কথাটা মিথ্যা নয়, না জেনেই সে একটা চরম ক্ষতিই করেছে। তার মেয়ের সম্মানও রাখেনি ওই অবনী, গোপেনের দল। বদিকবরেজকে সেও দেখে নেবে।

তার আগে একটা প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে।

—অমল !

অমল চুপ করে বসে আছে। গগন ডাক্তারকে দেখে চাইল সে।

বৃদ্ধের সেই জ্যামুক্ত ধনুর মত সতেজ ভাব আর নেই। বলে গগন আর্ত কণ্ঠে,

—না জেনে, না বুঝে মহাপাতক করেছি বাবা। তোমার নামে ওই শয়তানদের এসব কথা বলার পথ আমিই করে দিয়েছি। আজ তাই এসব চরম লাঞ্ছনা ভুগতে হচ্ছে ঘরে বাইরে। চন্দনাকে ওরা যা বলে বলুক, জানি এসব মিথ্যে। কিন্তু তুমি এখানে এদের সেবা করতে এসে এভাবে অপমানিত হলে আমার জন্যে।

অমল বলে—এসব কথা ভাবছেন কেন ? আমি তো চলেই যাচ্ছি—

—না। তুমি যাবে না। অন্ততঃ ওদের মিথ্যা কথা শুনে হেরে পালাবে না। তাহলে ওরা ভাববে সব সত্যি। তুমি মাথা উঁচু করে থাকবে এখানে, যেমন করছিলে তেমনি নিজের কাজ করবে। যা সত্যি তা একদিন জানবেই সকলে।

তুমি চলে গেলে অবনী, শেঠজীর কাছে আমরা হেরে যাবো।

ঢুকছে ভবতোষবাবু।

তারপর আবার অমল আউটডোরে বসেছে।

গগন, ভবতোষবাবুও আছেন। ফণী বুড়ো এর মধ্যে তিন কাপ চা করে এনেছে। ও রোজ সকালে নিজে ডাক্তারবাবুকে চা এনে দেয়।

গগন ডাক্তার দেখছে ল্যাংড়া ফণী এখন অনেক সুস্থ। মদের ঘোরও নেই। ফণী বলে,

—পেন্নাম গো ডাক্তারবাবু, চা খেয়ে যান। দ্যাখেন গো জজবাবু, কেমন চা বানাই।

গগন ডাক্তার বলে—ফণে, অ্যাঁ এ যে ফিট হয়ে গেছিস রে?

তা নেশা! ওটা চলে তো!

ফণী বলে—টুকচেন খাই, দুকান বন্ধ করে সেই রাতে। বড় ডাক্তারবাবু সনুমতি দেছেন। তবে বেশী খাইনা।

লিন গো, চা জুড়িয়ে যাবেক।

গগন ডাক্তার বলে—অমল, আমি হেরে গেছি! সত্যিই তুমি একজন ডাক্তারই। দেহই নয় মনের চিকিৎসাও করো তুমি। এদের জন্য এত করছে'—তুচ্ছ বদলোকের কথায় চলে যাবে? না—

হাসে অমল—অতুল, রোগীদের টিকিট দে।

ভবতোষবাবু, গগন ডাক্তার উঠে পড়ে।

গগন ডাক্তার বেশ হাল্কা মনেই ফিরছে। তবে তার মনে হয় ওই অবনী বদ্যিনাথদের এই শয়তানির জবাব সে দেবেই।

কুসুম কিছুটা আঁচ করেছিল যে ওই বদিকধরেজ আর গুপীনাথরা গোপেনের টাকা খেয়ে মেলায় সং এর নামে ওইসব কেচ্ছাই গাইবে। বাগদীদের ছিরি এখন গাঁয়েই আছে। শেঠজীর বাড়িতে কাজ করতো। ওখানে অবনী, গোপেনের ওই শেঠজীর সঙ্গে অনেক গোপন কথাই শুনেছে।

ছিরি এসে কুসুমদিকে সবই বলে।

ছিরিকে কুসুম কয়েকবার গোপেন—দত্তদের মেজবাবু, বাজারের ধনু মিত্তিরের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওরা অনেক মেয়ের সর্বনাশই করেছে। কুসুমকে ওরা এড়িয়ে চলে। মেয়েটা নাকি একটা হাসুয়া নিয়ে ঘোরে। একবার গোপেনের হাতেই কুপিয়েছিল।

সেই ছিরিই খবরটা দিয়েছিল। কুসুমও তাই ওই ভাবে তৈরী হয়েছিল সঙ্গে ছিল ছিরি। প্রায়ান্ধকার রুদ্রপালতলার প্রাচীন গাছটার বিশাল কাণ্ড।

সেই গাছের নীচে কিছুটা বাঁধানো চাতাল, সেখানে বেশ কিছু ছোট বড় পাথর, একটা কোন প্রাচীন শিলালিপির একটা তেল সিন্দুর মাখানো পাথরই দেবতা রূপে পূজিত হয়ে আসছে, ওর পিছনেই বিশাল গুঁড়ি—তারপর অন্ধকার ঝোপ ঝাড়।

ওইখানে গুঁড়ির আড়ালে এরা তৈরী হয়েছিল ইঁট পাথর নিয়ে। ওই খেউর শুরু হতেই ছিরি ইঁট মেরেছে ডেলাইটে, ওটা ভেঙ্গে নিভে যায় আর সেই মুহূর্তে কুসুমের পাথরটা এসে লাগে গুপীর নাকে আর একখানা এসে লেগেছে বদ্যিনাথের কর্ণমূল ঘেঁসে। কেৎরে পড়ে বদিকবরেজ।

তারপরই ওরাও দৌড়ে ভিড়ে মিলিয়ে যায়, আর কেউ কোন পাত্তাই পায় না। ছিরি গিয়ে বসে চুড়ির দোকানে মন দিয়ে চুড়ি পছন্দ করছে আর কুসুম গিয়ে হাজির হয়েছে ঈশ্বর দাসের জুয়োর ছকে।

ঈশ্বর দাসকে গোপেন কম পয়সাতেই মেলায় জুয়ো খেলার অনুমতি দিয়েছে।

ঈশ্বর তখন ভালো বাজিই মারছে। ছকের ছ'টা ঘরের মধ্যে দশ বিশ পঞ্চাশ টাকা করে বাজি পড়ছে। যে ঘরে গুটি উঠবে সে তার ডবল পাবে।

আর দেখা যায় বেশী টাকার ঘরে বাজি পড়ে না, গুটিও যেন শিক্ষিত, যে ঘরে টাকা নাই বা দু দশ টাকা আছে, গুটি পড়ে সেই ঘরেরই।

কুসুমকে দেখে ঈশ্বর বলে—তুইও খেলবি নাকি রে?

কুসুম ব্লাউজের ভিতর থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে তিনের ঘরে দিয়ে বলে, রইল দশ ট্যাকা।

কে বলে—ট্যাকা কেন নিজেকেই বাজির ছকে এড়ে দে কুসুম!

কুসুম বলে ঈশ্বরকে—কি গো! দুব নাকি।

ঈশ্বর কুসুমকে বলে—এমন ভাগ্যি কি আমার হবে মিতেন? তোমাকে জিতে লোব।

কুসুম বলে—তালে এই দশই রইল।

ওর দশ টাকার ঘরেই গুটি পড়ে। কুসুম অবাক হয়—কি গো!

ঈশ্বর বলে—একটুন বসো মিতেন। খুব পওয়া তুমি!

কুসুম বলে—তাহলে খাওয়াতে হবে কিন্তুক। বসলাম। চালাও গুটি।

আবার মেলা জমে ওঠে। ঈশ্বর আজ রাতে বেশ ভালো টাকাই কামায়। ভোর হয়ে আসছে। রাত শেষের ক্লান্তি নামে।

কুসুম বলে—চলি গো।

ছক, লাইট গোছাচ্ছে ঈশ্বর। আজকের মত খেলা শেষ। এবার ঘরে যাবার পালা। ঈশ্বর বলে—চলো, খাবে বললে?

কুসুম বলে—ধ্যাৎ, রাতভোরে খাওয়া যায়?

ঈশ্বর বলে—আজ দুপুরে তাহলে নেমন্তন্ন রইল কুসুম। বাড়িতে মাছ ভাত চাট্টি খাবে।

ঈশ্বরের কথায় কুসুম বলে—তাই যাবো।

ঘুম আসছে কুসুমের। কাল রাতে ওদের গান বন্ধ করেছে কিন্তু লোকের মুখ তো বন্ধ করতে পারেনি। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে কুসুম।

ফণী বলে—রাতভোর মেলায় কি করছিলি?

—গায়েন শুনছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গে সূর্য উঠে গেলে।

কুসুম বের হয়ে এবার আসে চন্দনাদিদির বাড়িতে। কাল ওকে নিয়েই গান হচ্ছিল—ডাক্তারবাবুকে যা তা বলেছে গানে। তবু চন্দনাদিকেই খবরটা দিতে হবে।

চন্দনা চুপ করে বসে আছে দাওয়ায়, কুসুমকে দেখে চাইল।

কুসুম বলে—কাল যা কাণ্ড হল মেলায়।

চন্দনা চুপ করে ছিল। এবার বলে—ঢিল মেরে কি হলো? ডাক্তারবাবু বোধহয় এসব অপমানের পর এখানে থাকবে না। চলেই যাবে।

কুসুম চমকে ওঠে—হেই মা গো!

কুসুম বলে—ইসব তো উদের খচরামি, তাই বলে চলে যাবেন উনি! আমরা কি করলাম! তোমার নামও তো বলেছে উরা—

—আমি আর কোথায় যাবো বল? এই নরকেই পচতে হবে। ওরা কলকাতার লোক, এসব নোংরামির মধ্যে থাকবে কেন?

কুসুম বলে—দ্যাবতার মত মানুষ গো! চলে গেলে হাসপাতালও উঠে যাবে।

—তাই তো তাড়াবে ওকে, ওই অবনীবাবুরা। ওষুধ চুরির বদনামও দিয়েছে, তাতেও হল না। তাই এসব করছে।

কুসুম জানে ওষুধ চুরির কেসটা। ওরা দারোগাবাবুকে বলে অতুলকেই অ্যারেস্ট করাতে চেয়েছিল, পারেনি ডাক্তারবাবুর জন্য। কুসুমের মনে হয় ওরাই চুরি করিয়েছে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু যদি চলে যায়!

এমন সময় ঢুকছে গগন ডাক্তার। চন্দনা চাইল।

কুসুম বলে—কোথায় গেছলেন গো?

গগন ডাক্তার বলে—হাসপাতালে। বুঝলি কুসুম, অমল একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। ফণীকে একেবারে বদলে দিয়েছে রে। হ্যাঁ ডাক্তারির কিছু জানে ও। দেহ নয় মনের চিকিৎসাও জানে।

—কিন্তু তাকে তো তাড়ালে। চন্দনা বলে,

—না রে। অইতো গেছলাম ক্ষমা চাইতে। তা সত্যিই বড় মন রে ওর—সারা অঞ্চলের রোগীদের কথা ভেবেই রয়ে গেল। ও চলে গেলে হাসপাতাল অচল হয়ে যাবে রে।

কুসুম কি ভাবছে, গগন ডাক্তার বলে।

—এত ওষুধ চুরি গেছে। ভবতোষবাবু টাকা তুলছেন, একশো টাকা দেব বলে এলাম। ব্যাটা চোরকে ধরতে পারলে সব বোঝা যেত।

চন্দনা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। অমল থাকছে। তবে মনে হয় অবনীবাবুরা আবার কি চাল দেয় কে জানে। ওরা এত সহজে থামবে না।

কুসুম দুপুরে ঈশ্বরের বাড়িতে এসেছে।

ঈশ্বরও খুশী। তার ঘর শূন্যই রয়ে গেছে। বুড়ি মা টা কোমর নুইয়ে চলে আর গজগজ করে—তোর পিণ্ডির যোগাড় করতে পারবো না।

সবাই বিয়ে থা করে। তুই ওই মদ, জুয়ো আর কুসঙ্গ নিয়েই রইলি মুখপোড়া। কুনদিন জেলে পচে মরবি।

ঈশ্বর বলে—বিয়ের জন্য ভাবছো কেনে? ঈশ্বর মন করলে একগণ্ডা বিয়ে করতে পারে।

—একটা করে দ্যাখা রে আটকুঁড়ির ব্যাটা। বুড়ি খনখনিয়ে ওঠে। তাই সেদিন কুসুমকে আসতে দেখে বুড়ি একটু খুশীই হয়। মেয়েটার ছিরি ছাঁদ আছে। কথাবার্তাও ভালো। তবে ডাকাবুকো। বুড়ির মনে হয় ঈশ্বরের মত হতচ্ছাড়াকে বশ করতে এমনি ডাকাবুকো মেয়েরই দরকার।

—বোস মা। বুড়ি আপ্যায়ণ করে ওকে।

—মিতেকে দেখছি না? কুসুম শুধোয়।

বুড়ি চোখেও কম দেখে। হাতড়ে হাতড়ে কাজ করছে। বলে,

—দোকানে গেল। এসে পড়বে। তা বাছা ঘরে গে বোস না কেনে?

কুসুম এদিকে ওদিকে চাইছে।

মাটির বাড়ি। ওদিকে কোঠায় যাবার সিঁড়িটা, তার নীচে একটা চোর কুঠুরি মত। কপাট একটা নেই। খড় বস্তা এসব দিয়ে বন্ধ করা।

হঠাৎ ওর নজর পড়ে খড়ের নীচে দু চারটে কাগজের বড় বাক্স ঢাকা দেওয়া আছে বস্তা দিয়ে, কিছুটা সরে গেছে ঢাকাটা।

কুসুমের সন্ধানী চোখ পড়ে ওর দিকেই।

হাসপাতালের ওষুধ আসে অমনি বাক্সে। অতুলকে অমনি বাক্স খুলে ওষুধপত্র বের করে আলমারির তাকে সাজিয়ে রাখতে দেখেছে। তার ভুল হয়নি। ঠিকই দেখেছে কুসুম।

কুসুম বলে—অ মাসী, মিতে এখন কাজকর্ম কি করছে গো? শোনলাম

ধানকলে বাঁধা কাজ পাবে।

বুড়ি বলে—অবনীবাবুর ধানকলে ? ওই গোপেনবাবু তো পেরায় আসে। দুজনে কি গুজ গুজ ফুস ফুস হয়। ট্যাকাও দেয়। ওদের ব্যাপার বুঝিনা। রাত বিরেতে কি করে—কুনদিন অপাঘাতে না মরে। কত বলি বিয়ে থা কর, ঘর বাঁধ। কে শোনে কার কথা।

বুড়ি গজগজ করেই চলে। কুসুম আর এখানে থাকতে চায় না। বলে—চলি গো মাসী। বলো—নরেশবাবুর বাড়িতে কাজ আছে। যেতে হবে। চললাম।

কুসুম কোনমতে বের হয়ে আসে। খবরটা সোজা গিয়ে ঠিক জায়গায় দিতে হবে। ডাক্তারবাবু, অতুলদেরও মান রাখতে হবে।

ভবতোষবাবু বাড়িতেই ছিলেন। কুসুমকে ঢুকতে দেখে চাইলেন। ভবতোষবাবুও চেনেন মেয়েটাকে। কুসুম বলে,

—একটা জোর খবর আছে বাবু!

চাইলেন ভবতোষবাবু, কুসুম বলে,

—হাসপাতালের চোরাই ওষুধের পাত্তা পেয়েছি।

ভবতোষবাবুও বুঝেছেন অবনীদের ষড়যন্ত্রের কথা। চুরির কেসটার কোন তদন্তই হয়নি। বড় দারোগা বলে—তদন্ত করছি। কোন ক্লু পাবোই।

আর মেজবাবু তরুণ পুলিশ অফিসার। অনেক সৎ। তিনিও চান এসব কেসের তদন্ত হোক। গাঁয়ে তিন চারজন দাগী আসামী আছে। ঈশ্বর তাদের অন্যতম। মেজবাবু বলেন,

—স্যার, ওদের ধরে এনে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করি।

বড়বাবু অবনীবাবু শেঠজীর কাছে নানা ভাবে ঋণী। জানে সে ওদের স্বার্থে ঘা দেওয়া উচিত হবে না। তাই বলে,

—কেন সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবে মনীশ। পরে রিপোর্ট দেব—নো ক্লু। ব্যস—

কেস ক্লোজড। অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি ? বেশী মাইনে পাবে ?

মনীশবাবু বলে,

—কিন্তু চুরির আসামী ধরাই তো আমাদের চাকরী।

বড়বাবু বলে—নতুন চাকরীতে ঢুকেছো তাই ছটফটানি। চুপচাপ থাকো আখেরে লাভই হবে।

মনীশবাবু যুক্তিটা মানতে রাজী নয়।

বড়বাবু কি কাজে সদরে গেছে, থানার চার্জে রয়েছে মেজবাবুই। এমনি সময় ভবতোষবাবু, নির্মলবাবুদের আসতে দেখে মেজবাবু চাইল।

ভবতোষবাবুই বলে—আপনারা তো তদন্ত করে কিছুই করতে পারলেন

না। আমরা যদি খবর দিই কিছু করবেন? একেবারে চোরাই মাল সমেতই ধরতে পারবেন সেই ওষুধচোরকে—হয়তো আরও অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

মনীশবাবুও একটা কেসের ফয়সালা করার জন্যই উঠে পড়ে লাগে। বলে সে—চলুন। কোথায় আছে সেই সব মাল বের করবোই। চুরির কেস-এর বিহিত হবেই। হাসপাতালের ওষুধ গেছে—চুপ করে থাকবো না।

তারপরই মনীশবাবু সদলবলে এসে হানা দেয় সেই বিকালেই ঈশ্বরের বাড়িতে। ঈশ্বর তখন বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছে, রাতে মেলায় জুয়ার আসর আছে। ভালোই আমদানী হচ্ছে। দিনে ঘুমও হয় ভালোই।

হঠাৎ কাদের ডাকাডাকিতে হকচকিয়ে ওঠে। ঘুম চোখেই বলে ঈশ্বর —গোপেনবাবু!

মেজবাবু জবাব দেয়—দরজা খোলো।

দরজা খুলতেই চমকে উঠে ঈশ্বর—আজ্ঞে আপনারা?

ততক্ষণে সারা গ্রামের লোক এসে পড়েছে। মেজবাবু কনস্টেবলদের নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে সেই চোর কুঠুরি থেকে হাসপাতালের চুরি যাওয়া ওষুধের দশটা কার্টুনের মধ্যে সাতটাকে উদ্ধার করে।

ঈশ্বর ভেবেছিল এর মধ্যে মাল সব পাচার হয়ে যাবে। গোপেনবাবুও মেলার কাজে ব্যস্ত। ঈশ্বরও রাতে ছক পাতছে জুয়োর, মাল ওইভাবে চোর কুঠুরিতে রয়ে গেছে।

কিন্তু থানা থেকে এভাবে মেজবাবু এসে চড়াও হবে ভাবতে পারেনি। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে ঈশ্বর। মেজবাবু ধমকায়,

—বাকী মাল কোথায়?

ঈশ্বর বলে—বিচে দিয়েছি বাবু।

—কোথায় বিচেছো?

জবাব দিতে পারে না ঈশ্বর। কারণ ও কাজটা গোপেনবাবুই করে। তাই চুপ করে থাকে। ওদের নামও করে না। মেজবাবু ধমকে ওঠে। —বলো? চুপ করে আছো যে?

তবু নীরব থাকে ঈশ্বর। মেজবাবু বলে।

—মালপত্র সমেত এটাকে ধরে নিয়ে চল। থানায় নিয়ে গিয়ে পালিশ করলে তবে মুখ খুলবে।

বুড়ি এবার চীৎকার করে—তখন বলিনি মুখপোড়া ওপথে যাসনে, যা এইবার তোর বাবারা বাঁচাক তোকে! এবার মরবি জেলের ঘানি টেনে।

সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে, হাসপাতালের ওষুধচোর ধরা পড়ার খবর।

কুসুমের কানেও গেছে কথাটা।

সেই বলে চন্দনাকে—শুনছো দিদি। ওষুধচোর ধরা পড়েছে মাল সমেত। বলিনি ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। ওই ঈশ্বর—

গগন ডাক্তার বলে—তাই নাকি! ওটা তো অবনীবাবুদের ওখানে প্রায় যায় টায়। বাজারে মস্তানি করে, হাটতলায় তোলা তোলে, গোপেনের চ্যালা।

চন্দনা বলে—যাও, তোমার পেটের অসুখের রুগীর চিকিৎসা করবে না? নগদ কুড়ি টাকা বকশিস পাবে।

গগন ডাক্তার বলে—নেভার! ওসব রোগী এই শম্মা দ্যাখে না। মরলেও ওকে হোমিওপ্যাথী ওষুধ দেব না। ননসেন্স!

চন্দনা বলে—ওই চুরির পিছনে ঈশ্বরই নেই, আরও বড় কেউ আছে।

গগন ডাক্তার বলে—পুলিশ যখন ধরেছে, তাদেরই টেনে বের করবে। কান টানলেই মাথা আসে। বুঝলি।

কিন্তু মাথা একটু ভারী হলে কান টানলেও মাথা সহজে আসে না। অবনীবাবুর খবরটা শুনেই দিবানিদ্রা ছুটে যায়।

কাল রাতে বদ্যিনাথ বেশ খাসা কেচ্ছা বেঁধেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি গালটা। তবু ওতেই বেশ কাজ হয়েছে।

খবর পেয়েছে সকালে ডাক্তার আউটডোরে বসেনি। রোগীরাও ছটফট করেছে। এবার ওদের দু দশ জন আসবে তারই নার্সিং হোমে। অমল ডাক্তার বোধহয় চলেই যাবে। অবনী শেঠজীকে খবরটা দিতে শেঠজীও এসেছে। এবার গোপেন বলে, কেমন এক ডোজ দিয়েছি কাকাবাবু! এক ডোজেই ডাক্তার ভাগলবা।

চুরির কেসেই এবার ওকে জড়াতে বলুন।

মুকুন্দরাম বলে—হ্যাঁ। উ যেতে চাইলে ইয়ার চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে সেক্রেটারীকে। তুমি ভি কমিটিতে আছো অবনী, ব্যস—সেক্রেটারীকে বলো ওই ডাক্তারই পঞ্চাশ হাজার রুপেয়ার ওষুধ চোরালো। ওকে অ্যারেস্ট করতে বলো দারোগাবাবুকে।

অবনীও এবার একটা আইনের পথ পেয়েছে।

ডাক্তারকে একবার অ্যারেস্ট করাতে পারলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। তারপর চলুক মামলা। বদনামের সবটাই হবে ওই ডাক্তারের। অবনীদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

অবনী বলে—গোপেন থানায় গে বড়বাবুকে একবার আসতে বল এখুনি। ব্যাটা ডাক্তারের কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাক থানায়। এমনিই ওকে চলে যেতে দোব না।

গোপেনও তাই চায়। চুরির ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে আর কেউ তাদের কোন রকম সন্দেহই করবে না। বাকী মালপত্র পরে সহরের চেনা ওষুধের দোকানে পাচার করে দেবে।

গোপেন বলে—যাচ্ছি, কাকা।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে গুপীনাথ। সে ডাক্তারকে গালাগাল দিয়ে খেউর গেয়ে ইট খেয়েছিল নাকে। সেই নাকের ক্ষতটা বিষিয়ে গিয়ে মুখ ফুলে গেছে। নিবারণ ডাক্তার বলে—পঞ্চাশ টাকা লাগবে। ইনজেকশন নানা ওষুধ দিতে হবে।

গুপী বদ্যিনাথের কাছেই যায়। বদ্যিনাথের মাথাও ইট খেয়ে ফুলে গেছে। মাথায় ঘৃতকুমারীর পাতার পটি লাগিয়ে সে ঘরেই রয়েছে। ওর নাকের অবস্থা দেখে বলে বদ্যিনাথ—এযে বিষিয়ে গেছে রে।

—ওষুধ দাও।

বদ্যিনাথ বলে—উঠতে পারছি না। মাথা ঘুরছে। নিবারণের কাছে যা—

—পঞ্চাশ টাকা চাইছে, কুথায় পাবো। ওদের হয়ে খেউর গেয়ে ইট খেলাম, এখন বলে ট্যাকা দে।

—তাহলে নার্সিং হোমেই যা, অবনীকে বলগে—

অবনীবাবু তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। ওদের কাজ হয়ে গেছে। গুপীনাথকে তখন তার দরকার ছিল, এখন আর নাই। তাই অবনী বলে, এখন ব্যস্ত। পরে আসবি।

গুপীনাথ বলে—ঘা বিষিয়ে গেছে গো। তুমাদের কথায় ওসব কেচ্ছা গাইলাম। এখন দেখবা নাই?

চটে ওঠে অবনী—আমার কথায় গেয়েছিলি? হারামজাদা! এর জন্যে গোপেনের কাছে মদের টাকা নিসনি? আবার কি রে!

—নার্সিং হোমে দেখিয়ে দাও প্রধান মশাই, খুব লাগছে নাকে। উঃ! গুপীর কাতরানিতে কান দেবার সময় ওর নাই। মুকুন্দরাম বলে,

—নার্সিং হোমে কত টাকা লাগে জানিস? ভদ্দর লোক ছাড়া কাউকে ভর্তি করি না। যা-যা ওই গগন ডাক্তারের হোমেপ্যাথী খাগে। সারবার হয় ওতেই সারবে, না হলে সরেই যাবি দুনিয়া থেকে। যেতে তো একদিন হোবেই? হ্যায় না?

গুপীনাথ নাক ধরে বসে আছে। হঠাৎ এমনি সময় শীতল মাস্টারের চ্যালা হরিহর ছুটে এসে খবর দেয়—সর্বনাশ হয়েছে গো গোপেনবাবু, পুলিশ এসে ঈশ্বর জুয়াড়ির ঘরে ঢুকে ওর চোরকুঠুরির ভেতর থেকে হাসপাতালের চুরি করা সব ওষুধের বাক্স বের করেছে। ঈশ্বর পাঁচীল টপকে

পালাতে গেছল ঠ্যাং-এ লাঠির বাড়ি মেরে ওকে ধরেছে।

চমকে ওঠে গোপেন—সেকি রে।

—হি গো। ব্যাটা জুয়াড়িই চুরি করেছিল ওসব। দারোগাবাবু, জজ বাবু, নির্মল মাস্টারদের এনে সব ধরে থানায় নে গেল ঈশ্বরকে কোমরে দড়ি বেঁধে।

অবনী মুকুন্দরাম গুম হয়ে যায়। ওদিকে গুপীকে তখনও বসে কাতরাতে দেখে বলে, যা এখান থেকে। যত্তোসব—

গুপীনাথের চোখের সামনে এবার এদের প্রকৃত স্বরূপটা ধরা পড়ে। সে দেখছে ওই চোর ধরা পড়তে এরা খুশী হয়নি, উলটে এরাই যেন বিপদে পড়েছে।

গুপীনাথ বাড়ি ফেরে। হাসপাতালে যাবার সাহস তার নাই। ও ভেবেছিল তার এই বিপদে অবনী, গোপেনবাবু তাকে দেখবে। কিন্তু ওরা ওসব ভাবেই না।

বরং চোর ধরার খবর শুনে গোপেন ভাবনাতে পড়ে।

এসময় গুপীনাথকে ওরা এখানে রাখতে চায় না। ওদের জরুরী পরামর্শের জন্যই গুপীকে তাড়িয়ে দেয়।

অবনী বলে—এ যে মহা বিপদ হল। যদি ঈশ্বর সব বলে দেয়?

মুকুন্দরাম বলে—লেকিন দারোগার বাচ্চা আমাদের টাকা খেয়ে আমাদের পিছনে লাগবে। ই ক্যায়সা!

অবনী বলে—গোপেন দারোগাবাবুকে আসতে বল।

গোপেন থানায় এসে দেখে বড় দারোগা নাই। কোর্টে কেস আরও কি কাজে সদরে গেছে। দু তিনদিন দেরী হবে ফিরতে। মেজবাবু তখন রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। মালখানায় সেই চোরাই ওষুধের পেটিগুলোও রয়েছে।

আর ঈশ্বরকে জেরা করছে—কোথায় বিচেছিস বাকী মাল, বল শালা?

ঈশ্বর গোপেনবাবুকে দেখে এবার কেঁদে ফেলে।

—দ্যাখেন গোপেনবাবু, আমি কিছুই জানি না। কে আমার ঘরে ওসব রেখে এসেছে, ঘরে থাকি না। আর এরা ধরেছেন আমাকে। বিশ্বেস করুন, জুয়া টুয়া খেলি তবে—

মনীশ গর্জে ওঠে—খেলাচ্ছি এবার। সদরে পাঠাও একে। হাসপাতালের মাল চুরি করে এলাকার মানুষকে সামান্য ওষুধও পেতে দিবিনা—

গোপেন বলে—সরকারী হাসপাতালের সব ওষুধচোরকেই ধরুন তাহলে।

মনীশ দেখছে গোপেনকে। ওর কাছে গোপেনের সম্বন্ধে অনেক খবর আছে। ধানগাছের বাতিল খুদে গুড়ো চাল প্রচুর হয়। গোপেন ওসব জলের দামে কিনে এখন চোলাই মদ বানাবার ব্যবসা সুরু করেছে। মাঠের মধ্যে ধানকলের এক কোণে ওর ওই ব্যবসা চলে। মনীশ তাও জানে। এখানেও দেখেছে ওকে নানা অকাজে। যে কোন কারণেই হোক বড়বাবু ওকে প্যার করে।

মনীশ সেটা পছন্দ করে না। বলে সে,

—সব চোরকে ধরার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই ধরতাম, তবু একটাকে ধরেছি মালসমেত। ওকে ছাড়বো না। সদরেই চালান দেব। তার আগে ওর মুখ খোলাবই। ও একা নয়, ওর পিছনে কারা আছে সেটাও জানা দরকার।

গোপেন বলে—প্রথম বার করেছে বেচারা—

—বলুন প্রথমবার ধরা পড়েছে। আপনি যান গোপেনবাবু, আমার কাজে বাধা দেবেন না।

অমল শুনেছে কথাটা। দুপুরে আউটডোর সেরে থানায় গিয়ে মালগুলো হাসপাতালের তাও সনাক্ত করে পুলিশের কাছে লিখেছে, ওগুলো এভাবে পড়ে থাকলে দামী ওষুধ নষ্ট হবে, রোগীদেরও দেওয়া যাবে না। তাই ওষুধ-গুলোকে রিলিজ করা হোক। মনীশবাবু বলেন—আদালতের অনুমতি নিয়ে ওগুলো দিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। আইনের ব্যাপার জানেন তো! একেও সদরে চালান করছি।

ঈশ্বর অবশ্য মুখ খোলেনি। জানে গোপেনের কাছে এর দাম সে পরে উশুল করবে। এখন শাস্তি সে নিজেই ভুগবে।

খুশি হয় অতুল। সে বলে—মেজবাবু, সেদিন দারোগাবাবু আমাকেই চোর বানিয়েছিল। এখন দ্যাখেন ব্যাপারটা। অতুলই বলে,

—ঈশ্বর, ঝেড়ে কেসে বল। একা কেন মরবি? যারা তোকে করিয়েছিল একাজ, তাদের নামও বল।

ঈশ্বর বলে না কিছুই। সে এসব বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ। জানে কখন মুখ খুলতে হয় আর কখন মুখ বন্ধ করতে হয়। তাই চুপ করেই থাকে।

অতুল ফিরছে। তার মনে হয় ওই রাতে ওদের ইট মারতে পারে একজন, সে ওই কুসুমই। আর ঈশ্বরের খবরটাই বা কে দিল পুলিশকে! আসছে সে ধানমাঠ ধরে। হঠাৎ দেখে কুসুমকে।

সে নির্মলবাবুর চাষ বাড়ি থেকে সব্জী নিয়ে ফিরছে।

—কিগো কবিয়াল। মেলায় এলি তেলি সং বাধলো, তুমি গাইলে না ?

অতুল বলে—ওরে বাবা, ইট পাটকেল খেতে পারবো নি। বাবা রুদ্রপালের থানে ভূতের দল আছে, যা ইট মারে—

হাসে কুসুম—ভূত নয় গো পেতনী, শাকচুন্নির দলই বলো।

—মানে! অতুল চাইল—তাহলে তুমিই! অবশ্য হাতের টিপ দেখেই বুঝেছিলাম।

কুসুম বলে—ওইসব করবে আর চুপ করে থাকবো ? দিলাম মুখ বন্ধ করে।

অতুল বলে—তা ভালোই করেছো। এবার চোরের দায় থেকেও বাঁচলাম, লোকে ভাবতো ওষুধপত্র আমিই চুরি করেছি।

কুসুম বলে—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে গো। বাবা রুদ্রপালই চোখে আঙ্গুল দে দেখিয়ে দিল আসলে চোর'কে ? ঈশ্বর মাল রেখেছিল ভালো জায়গাতেই, তা বাপু নজরে পড়ে গেল গে, খবর দিলাম জজবাবুকে! ব্যস—

অতুল অবাক হয়—তাহলে তুমিই খবর দিয়েছিলে জজবাবুকে ?

কুসুম বলে—তোমাকে সেদিন ওই পেট মোটা দারোগা চোর বলাতে যা রাগ হয়েছিল, বাবা রুদ্রপালকে বলেছিলাম, তুমি ইয়ের বিচের করো বাবা। হ্যাঁ—বাবা জাগ্রত গো।

অতুল দেখছে কুসুমকে। বলে—আমার জন্য এত ভাবো কুসুম ?

হাসে কুসুম—কে কার জন্য ভাবে বলো ? দুনিয়ায় তাহলে তো দুঃখু বলে কিছুই থাকতো না। চলি—

অতুল দেখছে কুসুমকে। জীবনে ও পেয়েছে শুধু দুঃখ কষ্ট আর লাঞ্ছনা। নিজের অন্ন নিজেকেই যোগাতে হয়। পাশে কেউ নাই। তবু এই পাঁকের মধ্যে ও যেন পদ্মফুলের মত সুন্দর, পবিত্র হয়েই আছে। সবার জন্যেই করে ও, বিনিময়ে কোন প্রতিদানও চায় না। ও যেন এক আনন্দময় ভুবনেরই বাসিন্দা। সেখানে স্বার্থ-লোভের নীচতা নেই আছে এক নিঃস্বার্থ সেবার পরিবেশ। লেখাপড়াও জানে না, নীতিবাক্যও জানে না। তবু যা জানে তার দাম অনেক।

কথাটা ভেবেছে চন্দনাও।

অমলকে সে যেন নতুন করে চিনছে। এত অপমান সয়েও কোন প্রতিবাদ করেনি। নীরবে আর্ত মানুষের সেবা করে চলেছে।

চন্দনা আজ মানুষটিকে শ্রদ্ধা করে।

গগন ডাক্তার ঢুকছে। বলে সে, ওষুধচোর ধরা পড়েছে একেবারে হাতে নাতে। কট্ রেডহ্যান্ডেড।

চাইল চন্দনা। গগন ডাক্তার বলে—ওই ঈশ্বর, ওই ব্যাটাই চোর।

পর্নিলশ একেবারে সদরে চালান করেছে। চন্দনা খর্নশি হয়, তাই নাকি !

হ্যাঁ !

—কিন্তু ওকে দিয়ে যারা একাজ করিয়েছে তাদের তো ধরেনি।

গগন ডাক্তার অবাক হয়—মানে ?

—তোমাকে দিয়ে ওই অমলবাবর্কে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল কারা ?

চন্দনার কথায় চাইল গগন ডাক্তার। ব্যাপারটা সে এবার বর্ঝেছে।

চন্দনা বলে—তেমনি এতদিন কিছর্ হল না, হঠাৎ ওষর্ধ চুরি হলো কেন ? সেটা বর্ঝছ না ? ডাক্তারবাবর্কেই ওর লোকেরা চোর সাজাতে চেয়েছিল। নিশ্চয় ওই অবনীবাবর্র দল। ঈশ্বরের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে নিজেরা সাধর্ সেজে রইল এখন।

গগন ডাক্তার এবার বর্ঝতে পারে। ওই অবনীর দল এমনিই করে। তাকে দিয়ে অমলকে অপমান করিয়েছে। আজ ওই আহত গর্পীনাথও এসেছিল তার কাছে। নাকটা সেপটিক হয়ে গেছে—নিবারণ পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিল। অবনীবাবর্দের কথায় খেউর গেয়েছিল, অথচ এখন তাকে যেন চেনে না। তাই শেষ অবধি এসেছিল গর্পী গগন ডাক্তারের কাছে। কিন্তু গগন ডাক্তার বলে—ওষর্ধ দিচ্ছি, তবে তুই বাপর্ হাসপাতালেই বড় ডাক্তারের কাছে যা। ঘা টার ব্যাপার, গতিক সর্বিধের বর্ঝছি না।

গর্পীনাথ বলে—সেখানে যাবার মর্খ নাই গো। যা করালে ওরা আমাকে দে ? ও গান গাইতে চাইনি। গোপেনই বললে—কোন ভয় নাই। আমরা আছি তোর পিছনে। আর এখন গাছে তুলে দে মই কেড়ে নিলে গ। বললাম নার্সিং হোমে দেখে দাও, তা শেঠ বলে—সিখানে ভদ্দরলর্ক যায় আর কারোও ঠাঁই নাই। আমরা মানর্ষ লই ? চিকিৎসেও পাবো না ?

গগন ডাক্তার বলে—এবার বোঝ ; সেই চিকিৎসার জন্য গড়া হাসপাতাল, ওখানের ডাক্তারবাবর্, তার নামেই কেচ্ছা গাইলি। আমার মান সম্মানও ডুবোলি ওদের কথায়। কি পেলি ?

গর্পীনাথও হাড়ে হাড়ে বর্ঝেছে ব্যাপারটা।

সে বলে—অনেক পাপ করেছি গো ! কে জানে তারই শাস্তি দেছেন বাবা রর্দ্রপাল এমনি করে।

•

বদি কবরেজও কাল থেকে মাথা তুলতে পারেনি ! মাথা ঘর্রছে, তেমনি বেদনা। ঢিলটা কানের কাছে বেশ জোরে লেগেছিল। অজ্ঞানই হয়ে গেছল। কোনমতে বাড়ি এসে প্রলেপ লাগায়। কিছর্ই হয়নি। তাই সে নিজেই নার্সিং হোমে গেছে।

হাসপাতালে যাবার মর্খ নাই বদ্যিনাথের। শেঠজী অফিসে বসেছিল।

—নমস্কার শেঠজী।

বদ্যিনাথকে কানে প্রলেপ লাগিয়ে আসতে দেখে চাইল। বুঝেছে শেঠ এখানে দেখাতে এসেছে। কবিরাজী বুদ্ধিতে কুলোয় নি। বদি কবরেজ বলে, কাল আপনাদের জন্যে ওইসব করতে গেয়ে চোট লাগলো, তাই এলাম।

—আমাদের জন্যে! আমি বলেছিল? খিঁচিয়ে ওঠে শেঠজী। সে বলে,

—এখানে এলে পঞ্চাশ টাকা ডাক্তারের ফি আগাম, তারপর ওষুধ ইনজেকশন যা লাগে তার দাম ভি লাগবে।

বদি কবরেজ বলে—তখন বললেন অবনীবাবু আমরা আছি—

তাহলে অবনীবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনো, ইলাজ হবে। নাহলে নিকালো রুপেয়া। ই দাতাবা হাসপাতাল নয় বাবুজী, নার্সিং হোম আছে।

বদ্যিনাথ ধীরে ধীরে বের হয়। মাথাটা যেন জোর ঘুরছে। রোদে কোনরকমে পা পা করে বাড়ি ফিরে আসতে এবার গিন্নী বলে,

—যাও, ওই বাবুদের হয়ে খুব কেচ্ছা বেঁধেছিলে। ধম্মো ভয় নাই? মিছে কেচ্ছা গাইতে গেলে বাবা রুদ্রপালের সামনে। বাবাই শাস্তি দিয়েছেন। ভোগ এইবার। চলছিল তবু বড়ি—পাঁচন বেচে, এখন পড়ে থাকো।

বদ্যিনাথও বুঝেছে ওদের বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছিল।

মাথা তুলতে পারছে না সে। তেমনি অসহ্য যন্ত্রণা। তার বিদ্যেয় এর ওষুধ জানা নেই।

অবনী এবার বিপদেই পড়েছে। ওদিকে মেজবাবু গোপেনকেও শাসিয়ে বিদেয় করেছে থানা থেকে। বলে—কেন এসব হচ্ছে তা জানি গোপেনবাবু। এখানের অনেক রুই কাতলাই জড়িত এই ব্যাপারে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ নাই, তাই তাদের ধরতে পারছি না।

তবে প্রমাণ পাবোই, সেদিন দেখা যাবে।

গোপেনের মুখে কথাগুলো শুনে চুপ করে কি ভাবছে অবনী। ঈশ্বরকে সদরে চালান দিয়েছে।

এরপর বড় দারোগাবাবু দুদিন পর ফিরেই এসব ব্যাপার জেনে চমকে ওঠে। মনীশ যা করেছে একেবারে আইন মোতাবেক করেছে।

কোথাও কোন ফাঁকই রাখেনি।

তবু বলে বড়বাবু—এসব কেন করলে?

মনীশ বলে—জজবাবু নিজে এসেছিলেন, তাকে ফেরানো অসম্ভব।

হাতেনাতে বামাল সমেত ধরে চোরকে ছেড়ে দেব কি করে? ওরা থানা ঘেরাও-করতো। পাবলিকও এখন আর বোকা নয় স্যার।

বড়বাবু তবু খুশী হয় না। অবনীবাবুর লোককে আসতে দেখে চাইল সে।

অবনীবাবুর বাড়িতে রয়েছে শেঠজী গোপেনও।

বড় দারোগা তাদের বলে—আমি ছিলাম না মেজবাবু এইসব করেছে। আর গাঁয়ের লোক চোরকে মাল সমেত ধরে খবর দিয়েছে, কিছু না করেও উপায় ছিল না।

—তাই বলে একেবারে সদরে চালান করে দেবে ? গোপেন বলে।

বড় দারোগা ভাবছে কথাটা। অবনী বলে,

—আগে জামিনে ওটাকে ছাড়াতে হবে। তারপর দেখা যাক কি করা যায়। জামিনের ব্যবস্থা করুন বড়বাবু।

শেঠ বলে—হামার আদমীকে ওইসা চালান করলো, ফি মাসে তাহলে খামঠো আপনাকে কেনে দিই ? বলেন!

বড়বাবু পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যই বলে, আমি দেখছি কি করা যায়।

—আর মেজবাবুটাকে বদলি করতে হবে ইখান থেকে। শেঠজীও দাবী করে। ওরা জানে সদরে নাহয় কলকাতার নেতাদের বিশেষ পন্থায় চাপ দিলে এটা হয়ে যাবে। ওই মনীশবাবু এখানে থাকলে তাদেরই বিপদ হবে। এই চুরির কেসে ঈশ্বর কিছু বললে মুস্কিল হবে। ওকে তাই জামিনে ছাড়িয়ে এনে টাকাকড়ি দিয়েই মুখ বন্ধ করতে হবে। তারপর মেজবাবুকে দেখা যাবে।

সারা অঞ্চলে এবার খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

অবনী শেঠজীরাই যে গোপনে কলকাঠি নেড়ে এসব করাচ্ছে তাও জেনেছে অনেকে।

একটা জনমত গড়ে উঠছে অবনীদের বিরুদ্ধে তা অবনীবাবুও বুঝেছে। এতদিন ধরে যা করেছে সবাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু ওই হাসপাতালের সুবিধে পাবার পর মানুষজন বুঝেছে এ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য—এতদিন ধরে ওই স্বার্থান্ধ মানুষের দল তাদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। যেদিন সেটা পাবার সময় হলো তখন ওরাই পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে সেটুকু পাওয়াতে বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে নানা কৌশলে।

তাই সাধারণ মানুষও এবার মাথা তুলছে।

নরেশবাবুর স্কুলেও এবার পড়াশোনা ভালোই হচ্ছে, নরেশবাবুই স্কুলের পর কিছু শিক্ষককে দিয়ে নামমাত্র দক্ষিণায় স্কুলেই স্পেশাল কোচিং ক্লাশ খুলেছেন। ছাত্রদের অধিকাংশ সেখানেই পড়ছে। ফলে এবার শীতল

মাস্টারও বিপদে পড়েছে। তাদের কোচিং ক্লাশে ছাত্রও তত হয় না।

তবু শীতলবাবু স্বপ্ন দেখে অবনীবাবুরা স্কুল কমিটিতে ফিরবেই। তখন নরেশবাবুকে তাড়িয়ে সেইই হেডমাস্টার হবে। আর তখন স্কুল থেকে এই লোকসান পুষিয়ে নেবে। সেই আশাতেই সে অবনীবাবুর মেয়ে লতিকাকে এখনও পড়িয়ে চলেছে।

অবশ্য সবদিন তাকে পাওয়াও যায় না।

ওই গিরিধারী ডাক্তার আসে। লতিকাই বলে—মাস্টারমশাই, আজ বাড়ি যান।

—পড়বে না লতিকা ? শীতল মাস্টারের আগ্রহই যেন বেশী। অবশ্য মেয়েটার বুদ্ধি ওর দেহের মতই মোটা।

লতিকা বলে—একটু সহরে যাবো।

তারপরই গিরিধারীর গাড়িতে সেজেগুজে বের হয়ে যায় সন্ধ্যার আগেই। ওদের এই অভিসার পর্ব প্রায়ই চলে।

শীতল নীরব দর্শকের মত দেখে মাত্র। বড়লোকদের ব্যাপারে কথা না বলাই উচিত জেনে সেও নীরবই থাকে।

কিন্তু এই নিয়ে গিরিধারীর বাড়িতেই গোলমাল শুরু হয়।

চন্দ্রা এসব খবর ঠিক পায়। নিজের জেদে সে আবার ছিরিকে ডাকিয়ে এনে চাকরীতে বহাল করে। শাশুড়ী বলে, ওকে তাড়ালাম।

চন্দ্রা বলে—আমার ইচ্ছা কাকে কাজে রাখবো না রাখবো। মাইনে তো আমিই দিই। ও-ই থাকবে।

শাশুড়ী চুপ করে যায়।

চন্দ্রা রাত অবধি জেগে থাকে। গিরিধারী ফেরে অনেক রাতে। মনটা বেশ খুশী খুশী। লতিকাকে নিয়ে সহরে জমাটি প্রেমের ছবি দেখেছে। লতিকার খুব সখ সেও সিনেমায় নামবে। অমনি গাইবে, প্রেম করবে কোন নির্জন ফুলের বনে। দুজনে কোথাও উধাও হবে।

গিরিধারীও স্বপ্ন দেখে তারা দুজনে অমনি কোন ফুলফোটা স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে গেছে। খুশিমনে ফিরছে বাড়িতে।

—এতক্ষণে ফেরার সময় হলো ?

গিরিধারীর চমক ভাঙ্গে। চাইল সে চন্দ্রার দিকে। চন্দ্রা বলে—যেখানে ছিলে সেখানে থাকলেই তো পারতে।

—নার্সিং হোমে অপারেশন ছিল।

গিরিধারীর কথায় ফুঁসে ওঠে চন্দ্রা।

—ঝুটবাত, নার্সিং হোম তো প্রায় বন্ধই। সবাই তো হাসপাতালেই যাচ্ছে। তুমি কোথায় গেছলে তা জানি। ওই ছুঁড়িটার সঙ্গে সহর থেকে

ফিরছো।

গিরিধারী গর্জে ওঠে—বেশ করেছি। ফের কথা বললে

চন্দ্রা এগিয়ে আসে—কি করবে? মারবে? বেসরম—লোভী একটা মানুষ। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। মেরুদণ্ডহীন একটা অপদার্থ তুমি।

গিরিধারী ইদানীং একটু মদ্যপানও করে।

তাই বেশ বীরদর্পে সে গর্জে ওঠে—খবরদার।

চন্দ্রা বলে—ধমকে থামাতে পারবে না আমাকে। তোমাদের কেচ্ছা কাহিনীর কথা সবাইকে বলবো। দরকার হয় আদালতে গিয়ে তোমাকে ডিভোর্স করবো, যাতে আমার বিষয় আশয় এক তিলও না পাও।

মুকুন্দরাম ও তার স্ত্রী ছেলেবউ-এর মাঝরাতের চেঁচামেচি শুনে এসেছিল। হঠাৎ বউ-এর ওই শাসানির কথাটাও শুনেছে শেঠজী।

অবশ্য তারপরই তার সুপুত্র চন্দ্রাকে যে চড় চাপড় মেরে ঠাণ্ডা করেছে এটা টের পেয়ে খুশী হয়।

শেঠজী বলে—মারছে বহুকে গিরিধারী।

শেঠের গিন্নী বলে—বেয়াদব মেয়েদের মেরেই ঠাণ্ডা করতে হয়। ওকে সহবৎ শেখাবো এই বার ওই করেই। তুম চুপ রহো জী।

শেঠজীর সুপুত্র গিরিধারী তখন চন্দ্রাকে বেশ কয়েকটা চড়ই মেরেছে। অবাধ্য স্ত্রীকে শাসনই করবে সে কারণ পতিদেবতাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয় সেইটাই ভুলে গেছে চন্দ্রা।

চন্দ্রাও ভাবতে পারেনি যে ওই গিরিধারী যে বিদেশে তাদেরই আশ্রয়ে থেকে ডাক্তার হয়েছিল সেইই আজ তাকে এইভাবে অপমান করবে।

চন্দ্রাও এবার সিদ্ধান্তই নিয়েছে। দরকার হলে সে এখান থেকে চলে যাবে তার দেশে, সেখানের আদালতেই সে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করবে।

ওই অপমানের পর চুপ করে যায় চন্দ্রা।

গিরিধারীও ভেবেছে তার বীরত্বে ভয় পেয়ে চুপ করেছে চন্দ্রা। তখনও গর্জায় গিরিধারী—মুখ বুজে থাকতে হবে এ বাড়িতে। আমি পুরুষ মানুষ, যা খুশী করার হক্ আমার আছে। ঘরের বৌ এ নিয়ে কথা বললে সইব না। মেরে হাত পা ভেঙ্গে ফেলে রেখে দোব।

চন্দ্রা কোন জবাবই দেয় না।

সে বুঝেছে এখানে কিছুর প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না। তাই চুপ করেই থাকে।

কিন্তু শেঠিয়ান কড়া নজর রেখেছে চন্দ্রার দিকে। ছিরি কাজ করতে আসে, শেঠিয়ানও কান পেতে থাকে। চন্দ্রা সেদিন ওকে একটা চিঠি দিয়ে বলে, ওটা ডাকবাক্সে ফেলে দিবি। খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে।

কোথায় ফেলতে হয় চিঠিপত্র জানিস তো ?

ছিরি তা জানে। বলে সে—হ্যা গ, ডাকঘরের বাইরে লালমত একটা বাক্স আছে, তাতেই সবাই চিঠি ফেলে। সেখানেই দিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, আর কেউ যেন জানতে না পারে।

ছিরি চিঠিখানা জামার মধ্যে নিয়ে বলে—হলোতো এবার। দেখবে চিঠি ঠিক চলে যাবে।

শেঠ মুকুন্দরাম জানে বিপদ কোনদিক থেকে আসবে। তাই আটঘাট বেঁধেই চলে সে। তার জন্য কিঞ্চিৎ খরচ হয় তা সেটা সে করে নিজের নিরাপত্তার জন্যই।

গ্রামের ডাকঘরের পিওন সত্যসাধন একাধারে সব। সেই ডাক বাক্স খালি করে বাইরে পাঠাবার চিঠিপত্র মোহর করে ব্যাগ বাঁধে, আবার ডাক এলে সেই ব্যাগ কেটে চিঠিপত্র বের করে গ্রাম হিসাবে ভাগা বানায়।

পোস্টমাস্টার বাবুর অন্যসব কাজ আছে। এছাড়া একজন ক্লার্কও আছে। সে সেভিংস ব্যাঙ্ক মনিঅর্ডার এই সবের কাজ করে।

সাধারণ চিঠিপত্রের কাজ, তাদের বিলি করার কাজ করে সত্য। হাটবারের দিন বিভিন্ন গ্রামের চিঠি নিয়ে হাটতলাতেই বসে যায়। ডেলিভারির কাজ ওখানে বসেই সারে। অবশ্য গোঁসাইগঞ্জের কিছু লোকের চিঠিপত্র সে সঠিক ভাবেই পেঁছায়। শেঠ মুকুন্দরাম তাদের একজন। সে মাঝে মাঝে কিছু বকশিস দেয়। আর শেঠই কিঞ্চিৎ বকশিস দিয়ে বলে রেখেছে চন্দ্রার বাপের বাড়ির ঠিকানায় কোন চিঠি গেলে বা ওখান থেকে বৌরানীর নামের কোন চিঠি এলে যেন তাকেই দেওয়া হয়। বৌরানীর কোন চিঠি যেন তাকে না দেখিয়ে বাইরে না যায়।

সত্যসাধন তা জানে।

তাই সেদিন ডাকবাক্স থেকে ওই হরিয়ানা যাবার চিঠিখানা হাতে পেয়েই এদিক ওদিক চেয়ে পকেটে পুরে ফেলে সত্য। জানে শেঠজীকে দিলে কিঞ্চিৎ বকশিস মিলবে।

শেঠ মুকুন্দরাম অবশ্য সত্যসাধনকে বঞ্চিত করেনি।

কিন্তু চিঠিখানা পড়েই চমকে উঠেছে। চন্দ্রা হরিয়ানায় তার চাচাতো ভাই উকিল তাকেই লিখেছে এইখানে তাকে আটকে রেখে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। তার স্বামী এবার অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশছে। তার বাপেরও অনেক টাকা। ওর উদ্দেশ্য তাকে শেষ করে ওই বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে আবার অন্যের অনেক সম্পত্তি হাতাতে চায়।

এরা পিশাচ। তাকে মারধোরও করছে।

সে এখান থেকে চলে যেতে চায়, ওরা কেউ এসে যেন নিয়ে যায় তাকে।

আর এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেয়। সেও এই অপদার্থ স্বামীকে আর মানতে পারছে না। মুক্তি পেতে চায় চন্দ্রা।

শেঠিয়ানও এসেছে।

ই সব ক্যা জী! ঘরকা বহু এই সব করবে? মান ইজ্জত আর থাকবে না। ওই শয়তানীকে হামি মার মারকে সহবৎ শেখাবে।

মুকুন্দরাম জানে তাতে কাজ হবে না।

তাই বলে—এসবে আর কাজ হবে না।

—তব্ ক্যা হোগা। গিরিধারীর নসীবে এতনা দুঃখ। বহু ভি বিগড়ে গেল। উ চলে গেলে এতনা সারা জমিন রুপেয়া, জেবর কারোবার সব কুছ চলে যাবে।

মুকুন্দও ভেবেছে কথাটা। তাই বলে সে, কিছুই যাবে না। যাবে ওই বদমাইশ বহু। ওটাকেই শেষ করে দিতে হবে। অথচ সবাই জানবে স্রিফ অ্যাকসিডেণ্ট করে মারা গেছে ওই বহু! সব শান্তি হয়ে যাবে।

শেঠিয়ানের মুখটা খুশীতে চক চক করে ওঠে।

—আর বিষয় আশয়ের ওয়ারিশান হবে ওই গিরিধারী।

—লেকিন ক্যায়সে হোবে ই কাম?

ওই অবাধ্য মেয়েটাকে সযুত করার কথাই ভাবছে এবার ওরা। শেঠিয়ান হঠাৎ কি যেন পথ পায়। বলে ওঠে,

—তুম ফিকির মৎ করো জী। কাম বন জায়েগা।

শেঠজীর এসব ব্যাপারে স্ত্রীর উপর অগাধ বিশ্বাস আছে। বদবুদ্ধিতে ওই ভদ্রমহিলা কম যায় না, তাই শেঠ স্ত্রীকে সমীহ করে চলে।

অমল একটু সাবধান হয়েই এখন কাজ করছে। সেও দেখেছে এখানের একটা শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ওই সাধারণ মানুষদের নানা ভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। আইন কানুনের মার প্যাঁচে তাদের জমি জায়গাও দখল করে নিয়ে তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়। তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের সামান্যতম কিছু দিয়ে অনেক কিছু কেড়ে নেয়। তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগও নেই।

গোপেন অবনীর দল তাদের ভোটগুলোও দিতে দেয় না। ধমকে সরিয়ে নিজেরাই নিজেদের মত ছাপ্পা ভোট দিয়ে নিজেদের স্বার্থের গণতন্ত্রকে কায়েম রাখে।

ওদের শিক্ষা পাবার অধিকার নিয়েও প্রহসন চলে।

মাসে মাসে জেলাসদরের লোকজন আসে। কোন আটচালায়—না হয় স্কুলে সেদিন গ্রামের লোকজনকে, মেয়েদের এনে সতরঞ্চে স্লেট বই নিয়ে

বসতে হয়।

সরকারী টাকা যায় গোপেনের পকেটে আর একটা অক্ষরও না শিখে ওদের শ দরুণে সাক্ষর বলেই চালানো হচ্ছে খাতায় কলমে।

বাউরী পাড়ার নিধে বাউরী একটু মাথাঠাড়ো লোক। মুখের ওপর সত্য কথা বলতে ওর বাধে না। কিছুদিন ধরেই দেখছে সে একবেলার রোজ কামাই হয় তবুও বাউরী পাড়া লোহার পাড়ার লোকদের মায় ঘরের মেয়েদের অবধি সাবান কাচা কাপড় জামা পরে ওই আটচালায় গে সেলেট বই নিয়ে বসে থাকতে হয়।

বাবুরা কি বলাবলি করে। শীতল মাস্টার গোপেনরা চীৎকার করে ক-খ পড়ায়। কখন অজ-গজও পড়ায়।

ওগুলো ওদের কানে ঢুকে গেছে। তারপর ছুটি হয়ে যায়। তারাও চলে আসে। খাতায় লেখা হয় দুশো জন সাক্ষর হইল।

অবশ্য তাদের দলে ইস্কুলের দু পাঁচ জন ছেলে মেয়েরাও বসে। শীতল মাস্টার তাদেরই বানান ধরে, কাউকে বোর্ডে গিয়ে লিখতে বলে।

এমনি ওদের প্রায়ই যেতে হয় গোপেনবাবু, অবনীবাবুদের ডাকে। এক-বেলার রোজ প্রায় আঠারো টাকা মারা যায়। মুনিবরা তার জন্য পয়সা দেয়না।

অথচ ফটিক বোর্ডের পেয়াদা। ওই বলে,

—সরকার এইসব করার জন্য টাকা দিচ্ছে।

নিধু শুধোয়—সে ট্যাকা কুথায় যায় রে? ওই গোপেনবাবুর গন্ধে;

ফটিক ওসব প্রশ্নে যেতে চায় না। বলে সে—তা কে জানে?

নিধু মনে মনে রেগেই থাকে।

সহরের বাবুরা এসেছে।

সেদিন আবার আটচালায় ডাক পড়েছে। সেজেগুজে যেতে হয়েছে ওদের। শীতল, গোপেনও ক্লাশ নেবার অভিনয় করছে। পাঠশালার দু চারজন লেখাপড়া জানা ছেলে মেয়েকেও নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করছে ওদের সামনে।

নিধু হঠাৎ উঠে পড়ে। বেশ সতেজ কণ্ঠে বলে—ও সহরের সাহেব মশায়রা। ই সব পেঁদো ইস্কুল ইস্কুল খেলা করে আমাদের রোজকার মারেন কেনে গ? আমরা উসব কুছু জানিনা। উ বাবুরা ই সব ছল করে ট্যাকা মারেন—উরা ইসব করে ট্যাকা পায় ওই গোপেনবাবু, শীতল মাস্টার তাহলে রোজ কামাই করে একবেলা কাজ ছেড়ে এসে আমরা কেনে সি ট্যাকার ভাগ পাবো নাই বলেন আজ্ঞে?

গোপেন ধমকে ওঠে—অ্যাই নিধে।

এই প্রশ্নটা এদের সকলেরই। তারাও টাকা মারার এই নাটক দেখেছে। সব যেন একটা ধাপ্পার খেলাই চলেছে তাদের নিয়ে। তাদের লেখাপড়াও হয়

না। মাঝে মাঝে আসতে হয়। তাই লখাইও বলে, নিধেকে থামাবা কেনে ? উ লায্য কথাই বলেছে।

ইসব কাপকলায় দরকার নাই। চলরে সবাই উঠ।

ওরাও ছাড়া গরুর মত উঠে পড়ে।

শীতল বলে—কি বলছিস তোরা ? শোন—

আর শোনার অপেক্ষা রাখে না। অবাধ্য ছাত্রর দল চলে গেল হৈ হৈ করতে করতে ; পড়ে থাকে শূন্য প্রায় আটচালা। দাঁড়িয়ে থাকেন গোপেন, শীতল মাস্টার আর সহরের অফিসার ক'জন।

গোপেন বলে—এদের মত গোমূক্ষুদের লেখাপড়া শেখানো কি কঠিন কাজ দেখুন স্যার।

শীতল বলে—সেই দুঃসাধ্য কাজই আমরা অক্লান্ত ভাবে করছি।

অবশ্য অবনীবাবুর বাগান বাড়িতে সাহেবদের জন্য ভুরি ভোজের আয়োজন হয়েছে। ফ্রায়েড রাইস চিলি চিকেন সন্দেশ আর আইসক্রীম খেয়ে ওঁরাও মত দেন, হ্যাঁ গোঁসাইগঞ্জে নিরক্ষর নাই বললেই চলে। পূর্ণ সাক্ষর গ্রাম।

অবনীবাবু বলে—আমার অঞ্চলই পূর্ণ সাক্ষর বলে ধরতে পারেন। দু চারটে নিরক্ষর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে এদিক ওদিক।

গোপেন বলে—ওদেরও সাক্ষর করে দেব।

সরকারী খাতায় ওদের কথামতই সব রিপোর্ট লেখা হয়ে যায়।

সেদিন অতুল বেশ জমিয়ে কবিগানের আসর বসিয়েছে গ্রামের পঞ্চানন তলায়। ন্যাপা গায়েন হলে কি হবে, ভালো ঢোল বাজায়। ন্যাপা ঢোলে কড়া বোল তুলেছে।

নেচে নেচে গাইছে অতুল

গাঁয়ে খুলেছে কত পাঠশালা
এলে পরেই সব শিখবি
না এলে পাবি কাঁচকলা।

এ গাঁয়ের সবই কেমন আলফালা।
হাসপাতালকে তুলে দিতে
চলছে কত কাপকলা—

মাস্টার ঘরে বসে মাইনে তোলে
ইস্কুলে যায় কোন শালা॥

বড় লোকে করে চুরি—
গরীবের কোমরে দড়ি—
স্বয়ং ঈশ্বরকেই চোর বানায়

এমনি এদের কাপকলা॥

গাঁয়ে খুলেছে এক পাঠশালা॥

সারা গাঁয়ের মানুষ এসে জুটেছে পঞ্চাননতলায়।

কুসুমও এসেছে। শুনছে ওই গান। আজ কেউ আর ইট মারতে সাহস করে না ওকে। সারা গ্রামের মানুষ আজ ক্রমশঃ বুঝেছে তাদের উপর এতদিন ওই মুষ্টিমেয় মানুষ কজন অবিচারই করেছে। এবার তাদের স্বরূপ চিনছে। ওরাও চায় শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, মানবিক স্বীকৃতি।

তাই অবনীবাবুদের মনে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। গোপেনও শোনে ওই ব্যঙ্গের গান। আগে হলে ওইখানেই অতুলকে ধরে মারধোর করে শাস্তি দিত।

আজ দিন বদলাচ্ছে।

অমলও দেখছে সেটা।

সে ফণীর মত একটা ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের মনে বাঁচার আশ্বাস এনেছে। সারা এলাকার মানুষ ক্রমশঃ তাকে আপনজন বলে জেনেছে।

অমল বসে আছে তার ঘরের বারান্দায়।

দূর থেকে অতুলের গানের সুর, ন্যাপার ঢোলের তেহাই ভেসে আসে।

পড়ন্ত বেলায় আবীর ছড়ানো বিকালে চন্দনাকে এসে প্রণাম করতে দেখে চাইল অমল।

—কি ব্যাপার?

চন্দনা বলে - আজ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। অনার্স নিয়ে পাশ করেছি, তাই।

অমলও খুশী হয়—আরে তবে তো মিষ্টি মুখ করাতে হয়।

একেবারে গাঁয়ের বাইরে বাস করি, অতুল ন্যাপা তো কবি গাইতে গেছে মালোপাড়ায়। কি যে করি?

চন্দনা বলে - এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বাবা বললেন, আজ যদি ও বাড়িতে আসেন, সন্ধ্যাবেলা ওখানেই খাবেন। অবশ্য যদি যান—

চন্দনা জানে ও বাড়ি থেকে বাবা ওকে তাড়িয়েছিল। তাই সংকোচভরেই কথাটা বলে। অমল ওসব মনেই রাখেনি। কারণ সে চিনেছে ওই আপন-ভোলা গগন ডাক্তারকে। বলে,

—নিশ্চয়ই যাবো। বুঝলে ডাক্তারবাবু এখন মানেন এলোপ্যাথীতেও অনেক কিছুই আছে।

হাসে চন্দনা—বাবা এমনিই। হ্যানিম্যান নিয়েই রইলেন—তার বাইরে যেন সংসারে আর কিছুই নাই।

অমল বলে—এবার কি করবে?

চন্দনা বলে—জানি না। ইচ্ছে ছিল এম-এ টা করি। কিন্তু বাবার অবস্থা তো জানেন। হোস্টেলে রেখে পড়ানোর খরচ অনেক, তারপর

মানুষটাকে একা রেখে যেতেও ভরসা হয় না। আমি ছাড়া আর ওর কেউ নাই।

এমন সময় কুসুমকে আসতে দেখে চাইল অমল।

হন্তদন্ত হয়ে আসছে সে। অমল শুধোয়, 'কি হলরে, কবি গানের আসরে কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

—না গো ডাক্তারবাবু, একবার চলেন। ওই গুপীনাথ-এর সেই ইঁটের ঘা বিষিয়ে গেছে। জ্বরে বেহুঁস—ভুল বকছে। মুখ ফুলে ঢোল।

চন্দনাই বলে—সেদিন খেউর গাইবার সময় মনে ছিল না? তখন তো অবনী গোপেনের কথায় সারা অঞ্চলের লোকের সামনে যা তা অপমান করলো ডাক্তারবাবুকে, আমাদের। এখন ওদের নার্সিংহোমে যাক।

অমল বলে – চন্দনা, মানুষ অমলকে ও গাল দিয়েছে, কিন্তু ডাক্তার অমলের তো এসব মনে রাখলে চলবে না। সে অসহায় রোগী—এসময় ওসব মনে রাখতে নাই।

ব্যাগটা নিয়ে বলে—চল কুসুম। চন্দনা, সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই যাবো। ন্যাপার হাতের ওই বিশ্রী রান্না থেকে আজ মুক্তি পাব শুনে সত্যিই দারুণ ভালো লাগছে।

চলে গেল অমল ব্যাগ হাতে।

গুপীনাথকে গগন ডাক্তারই দেখছিল। কিন্তু ক্ষত বিষিয়ে গেছে। প্রবল জ্বর। গগন ডাক্তারই অমলকে ডাকতে পাঠায়।

অমল যেতেই গগন ডাক্তারই বলে।

—তোমাকে খবর দিতে বললাম অমল। তুমি একটু দ্যাখো। আমি ভালো বুঝছি না।

অমল দেখেই বলে—একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। স্যালাইন দিতে হবে। দেখি কোনমতে জ্বরটা কমলে দরকার হলে অপারেশন করতে হবে। মনে হচ্ছে ইটের টুকরো ভিতরে রয়ে গেছে।

গুপীনাথ আর্তকণ্ঠে বলে—ডাক্তারবাবু বাঁচান গো। মহাপাতক করেছিলাম তাই বাবা রুদ্রপাল এই শাস্তি দেলেন। উ শয়তানদেরও চিনেছি এবার।

পাড়ার লোকজনই কোনমতে একটা ভ্যান রিক্সা ডেকে এনে ধরাধরি করে গুপীনাথকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

বেশ ভিড় জমে গেছে। লোকে ভেবেছিল ওইসব ঘটনার পর বড় ডাক্তার এখানে আসবে না। গুপীর চিকিৎসাও করবে না। কিন্তু তারাই অবাক হয়।

তাই যেন সাহস পেয়ে এবার বদ্যি কবরেজের ভাই গৌর এসে বলে, একটা নিবেদন ছিল ডাক্তারবাবু।

অমল চাইল। গগন ডাক্তার বলে—বদ্যিনাথের অবস্থাও ভালো নয়।

—বদ্যিনাথ কবরেজ?

—হ্যাঁ, যদি একবার যান। দাদার মাথা তোলার সাধ্য নাই।

অমল বলে—হাসপাতালে যেতে হবে, গুপীনাথকে অ্যাটেন্ড করতে হবে।

গগন বলে—ওইতো বাড়ি। একবার চলো—

বদ্যি কবরেজেরও চমক ভাঙে। সেই দারুণ গান বাঁধার পর যে ডাক্তার নিজে তার বাড়িতে আসবে তা ভাবেনি। তাই অবাক হয়।

—ডাক্তারবাবু!

অমল বলে—কি অসুবিধে হচ্ছে?

কান-এর দিকটা ফুলে উঠেছে। ডাক্তার বলে—মনে হচ্ছে কানের এদিকের হাড়ে চোট লেগেছে, কোন নার্ভও ড্যামেজ হয়েছে।

বদ্যিনাথ বলে—কুকর্ম করেছি ডাক্তার। বাবা রুদ্রপাল তাই এই চরম শাস্তি দিয়েছেন। কোনমতে সুস্থ করো ডাক্তার। এ ভুল আর হবে না।

অমল একটা ইনজেকশন দিয়ে গৌরকে বলে, হাসপাতালে আসুন, ওষুধ দিচ্ছি। কাল কেমন থাকেন জানাবেন।

গৌর-এর মধ্যে দশটা টাকা বের করেছে—আজ্ঞে ভিজিট।

হাসে অমল—ওটা নিই না। সরকারী চাকরী করি। সরকারই মাইনে দেন।

বের হয়ে যায় অমল।

জনতা দেখছে এক নতন মানুষকে। যারা সেদিন প্রকাশ্যে ওই অমলকে চরম অপমান করলো আজ সে সব ভুলে অমল নিজে এসেছে তাদের পাশে। ভূতনাথ ঘোষ বলে,

—দেখলে হে? এই মানুষটাকে, ওই হাসপাতালকে এখনও অগ্রাহ্য করবে তোমরা?

কে বলে—কথাটা ওই অবনীবাবু, শেঠজীদেরই বলতে হবে।

—ওরা শুনবে না।

ভূতনাথ বলে—শোনাতে হবে ওদের। ওই ইস্কুল—হাসপাতালের দিকে যেন আর হাত না বাড়ায়। বাড়ালে আমরাও চুপ করে থাকবো না।

গৌর বলে—এবার ওর পঞ্চায়েতের প্রধান গিরিই যদি না খসাতে পারি আমার নাম গৌর কবরেজই নয়। দেখে নিও তোমরা।

অবনীবাবুর কানেও খবরগুলো পেঁছায়।

এবার মনে হয় তার—তার দলের লোক যারা এতদিন তাদের জন্য লড়েছে, সেই লোকগুলোর উপরই অবিচার করে ফেলেছে তারা। ঈশ্বর এখন জেগে।

তার বুড়ি মা কেঁদে বেড়ায়। রোজকারপাতি নাই। ক'দিন জ্বরে পড়ে আছে। বুড়ি ভেবেছিল গোপেনবাবুরা তাকে দেখবে। ঈশ্বর কোর্টে পুলিশের কাছে ওদের নামও করেনি। তাই ওর জেল হয়ে গেছে।

গোপেনও জানে ওর মাকে টাকা দিলে লোকে সন্দেহ করবে। তাই এদিক মাড়ায় না। অবশ্য গোপেনের অনেক টাকাই লোকসান হয়েছে। ওষুধগুলো সরিয়ে নিতে পারলে এসব হতো না। তা ঈশ্বরই দেয় নি। এখন মর ব্যাটা।

বুড়িই এবার হাটতলায় এসে গোপেনের দোকানের সামনেই গলা তুলে বলে—এই যে বাবু, ছেলেটাকে চোর সাজিয়ে জেলে পাঠ্রে নিজে তো দেশ সাধু সেজে পাটোয়ারগিরি করছ? বলি ইকি ধম্মে সইবে?

গোপেন ইদানীং হাটতলায় 'কৃষিলক্ষ্মী' নাম দিয়ে বেশ বড় সড় দোকান করেছে। সার, বীজ, চাষের যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ এসব বিক্রী করে। অবশ্য এর বেশীর ভাগ মাল বিশেষ করে সার বীজ এসব ব্লক অফিসের থেকে নানা হেরি ফেরি করে কম দামে আনে আর কৃষি লোন টোন, পাম্প সেটের জন্য লোনের তদ্বির করে লোন বের করে দেয় পার্টিকে, তার বাবদ আগেই বেশ কিছু টাকা কমিশন তো পায়ই তারপর দুনম্বরী পাম্পসেট পার্টিকে গছিয়েও বেশ ভালোই রোজকার করে।

হাটবার। দোকানে অনেক খদ্দের আছে সারা অঞ্চলের। বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধের খুবই দরকার চাষীদের। এই ভীড়ের মাঝে ঈশ্বর দাসের বুড়ি মাকে এসে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে দেখে অনেকেই মজা দেখবে বলে ওখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বুড়ি গর্জায়—তুমিই ওকে পাঠালে হাসপাতালের ওষুধ মালপত্র চুরি করতে। আজ সাধু হয়েছো!

লোকজন এই চুরির ঘটনাটা জানে কিন্তু চুরির মূলে আসলে কে আছে তা জানত না। এখন সেই খবর শুনে গুঞ্জন শুরু হয়। গোপেন দোকানে বসেছিল। হঠাৎ বুড়িকে এসে এভাবে সব ফাঁস করতে দেখে চটে ওঠে।

ওর লোকজনদের বলে—ওই পাগলীটাকে দূর করে দে। একেবারে হাটতলার বাইরে করে দিবি।

মালিকের হুকুম। ওরাও ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতে চায়। একজন এসে বুড়ির গায়ে হাত দিতে বুড়িও হাতের লাঠি তোলে। গর্জে ওঠে—আয় মুখপোড়া! দেখছি ক্যামন মরদ তুই? চোরের সর্দারের চ্যালার আবার মর্দানি।

এই নিয়েই বেশ জমে ওঠে। লোকটা বুড়ির ওই রণমূর্তি দেখে এগোতে পারে না। বুড়িও হাট মাথায় করে ঘোষণা করে ওই গোপেনের কুকর্মের কথা।

বুড়ি চলে যায়, কিন্তু ততক্ষণে অর্ধেক হাটতলার লোক জেনে গেছে যে

হাসপাতালে চুরির মূলে কোন ব্যক্তি। আর সে যে ওই অবনীবাবুরই একান্ত আপনজন, তাও জানাজানি হয়ে যায়।

খবরটা মনীশবাবু অর্থাৎ থানার মেজবাবুও শোনেন। তিনিও ঈশ্বরের কথায় কিছুটা এমনিই অনুমান করেছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করে বলেনি ঈশ্বর, তবুও তার ইচ্ছা ছিল ওই মস্তান গোপেনকেও চালান করে দিতে।

মায়ের কথার উপর সেটা করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষ্য প্রমাণ কিছুই নাই।

থানার বড়বাবু অবশ্য সদর থেকে ফিরে ওই ঈশ্বরকে চালান করে কেস দেবার জন্য মনীশবাবুর উপর খুশী নয়। কারণ অবনীবাবু, মুকুন্দরাম তাকেই বলে,

—কেসটা সামলাতে পারলে না দারোগাবাবু, বদনাম হয়ে গেল। কি করতে আছো তুমি?

বড় দারোগার আর করার কিছুই নাই। বলে সে অবনীবাবুকে।

—ছোকরাকে বদলি করার ব্যবস্থাই করুন!

বড্ড একগুঁয়ে ছোকরা। এখানে থাকলে আপনাদেরই বেগ দেবে।

অবনীবাবুও কথাটা ভেবেছে।

বিশেষ করে ওই ভবতোষ, নির্মলবাবু, পরেশদের সঙ্গে মনীশদের মাখা-মাখিটা এরা পছন্দ করে না। বেশ জেনেছে অবনীবাবু সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার বেশ লড়াইই করতে হবে। কারণ এতদিন প্রতিপক্ষ তেমন ছিল না, এখন একটা বিরুদ্ধ জনমত গড়ে উঠেছে। আর তাদের সহজে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

তার জন্য প্রশাসনকে হাতে রাখতেই হবে।

বড দারোগা তাদের অনেক কার্যকলাপ দেখেও দেখেনা। কিন্তু ওই মনীশ এখন মাথা তুলছে। সেদিন হাটতলায় ওই ঈশ্বরের মাকে গোপেনের লোকরা গায়ে হাত তুলতে গেছল, মনীশবাবুই তাদের বাধা দেয়।

ফলে বুড়ি হাটময় কথাটা প্রচার করতে পারে।

মুকুন্দরাম বলে—ওকেই হঠাতে হবে।

এছাড়া আর একটা কথা এবার ভাবছে তারা গভীরভাবে। ওই অমল ডাক্তারকে এত চেষ্টা করেও তাড়ানো গেলনা এখান থেকে। হাসপাতালকে সেও বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। আর সারা অঞ্চলের মানুষও চায় হাসপাতাল টিকে থাক।

নার্সিং হোমের সেই আমদানী আর নেই। লাখ লাখ টাকা লাগিয়ে এখন নার্সিং হোমই অচল, বন্ধ করে দিতে না হয়। এ যেন অবনী মুকুন্দের ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ছেলে এভাবে বাইরে থেকে এসে তাদের

সব কিছু তছনছ করে দেবে তা ভাবেনি। তাই এবার অবনী শেষ আঘাতই দিতে চায়।

গোপেন এসব কাজে বেশ নিপুণ।

ওরাই ভাবে ডাক্তারকে এই জগত থেকেই সরিয়ে দিতে হবে কোনও কৌশলে। ওই ডাক্তার মারা গেলে ভয়ে গ্রামের দিকে আর কোন ডাক্তার আসতেই চাইবে না।

মুকুন্দ ভেবেছিল হাসপাতালে ওষুধ না পেলেই রোগীরাই চড়াও হবে ডাক্তারের উপর, হাসপাতালের কর্মচারীদের উপর। মারধোর, ভাঙ্গচুর একদিন হলেই ওরাও ভয়ে পালাবে! সেই মতলবও করে বেশ কিছু লোককেও ফিট করেছিল তারা।

কিন্তু তার আগেই ওই ওষুধ চুরির ব্যাপারটা হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতেই সব গোলমাল হয়ে যায়, তাই সে কৌশলও খাটাতে পারেনি।

মানুষজন সবাই জেনে গেছে চুরির খবর। তাই কিছুদিন চুপ চাপ থেকে এবার ওই পথই নেবে।

গোপেনও ভাবছে। তার কাছে ঈশ্বরের ধরা পড়াটা খুবই অপমানজনক হয়ে গেছে। আর কে এই গোপন খবর দিল ওই শয়তান মেজবাবুকে এ নিয়ে ও খোঁজখবর করতে করতে কুসুমের খবরটাও পায়। ওই ডাকাবুকো মেয়েটাকেও এখন গোপেনও কিছু শিক্ষা দিতে চায়।

কুসুম এখন স্বপ্ন দেখে, ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

জীবনে এতদিন তার কোন আশা, আশ্বাস ছিল না। সমাজের অবহেলিত একটা প্রাণী। নিজের বাপটাও ছিল মাতাল, অচল প্রায় মানুষ, নিজেকে খেটে নিজের অন্ন যোগাতে হতো, তার রোজকারও ছিনিয়ে নিত বাবা।

ক্রমশঃ দেখেছিল অতুলকে।

তারও পায়ের তলে মাটি নাই। বাড়ি থেকে খেদানো এক বাউণ্ডুলে ঘুরে বেড়ায়, গান বাঁধে, গেয়ে বেড়ায়।

দুই চলমান জীবন হঠাৎ আজ পায়ের তলে মাটি পায়, কুসুমের চায়ের দোকান তার বাবা ভালোই চালায়। কুসুমও এখন ট্রেন্ড নার্সের কাজ করছে। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। বাড়ি বাড়ি আর বাসন মাজার কাজ করতে হয় না। অতুলও হাসপাতালেই কাজ পেয়েছে।

তাই এবার দুজনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

তারা এই নতুন করে বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে ওই অমল ডাক্তারের জন্যই।

কুসুম সেদিন আসছে গ্রাম থেকে। এদিকটায় এখনও গাছ গাছালি কিছু আছে। হঠাৎ গোপেনকে দেখে চাইল।

গোপেনের ওই চাহনীটা চেনে কুসুম। এর আগেও দু একবার ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে গোপেন, কিন্তু কুসুমই পাত্তা দেয়নি তাকে। আজ ওকে দেখে চাইল কুসুম।

গোপেন এগিয়ে আসে। কুসুম দেখছে। গোপেন বলে—ঈশ্বরের বাড়িতেও তুই যেতিস ?

কুসুম চমকে ওঠে। সেই চুরির ব্যাপারটা নিয়েই গোপেন এখনও তদন্ত করছে। কুসুম বলে,

—ওর কি আছে গো ? গায়ে তো চিটেগুড় লাগানো নাই তাই চাটতে যাবো ? তোমার মত শাসালো নাগর ছেড়ে ওই জুয়াড়ির কাছে কেনে যাবো বলো ?

গোপেন যেন কুসুমকেই এবার কাছে পেতে চায়। ওই মেয়েটাকে হাতে আনতে পারলে তবু কাজ হবে। তাই বলে—আমার দিকেও তো চাস না। একদিন আয়, অনেক কথা আছে। সন্ধার দিকে আয়।

কুসুম বলে—দেখি।

—দেখি নয়, কালই আয়। জরুরী কথা আছে।

কুসুম বলে—ঠিক আছে।

গোপেন জানে ওকে একান্তে পেলে তার অনেক উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে চাই কি ডাক্তারটাকেও বিপদে ফেলার পথ হবে। তাই কুসুমের কথায় চুরির তদন্তটা চেপেই যায়।

গিরিধারী ডাক্তারের এখন কাজকর্ম বিশেষ নাই। নার্সিং হোমেও রোগী আর তেমন আসে না। সহরের ডাক্তারদেরও আগে এখানে ভালো রোজকার হতো। অপারেশন করলেই ভালোই আমদানী হতো, ফি ভিজিটও পেতো।

এখন ওসব কমে যেতে তারাও বসন্তশেষের কোকিলের মত উধাও হয়ে গেছে। গিরিধারীরও ভালো লাগে না।

বাড়িতে দিনরাত অশান্তি লেগেই আছে। মা-বাবা বৌ এর মধ্যে বকাবকি, চেল্লামেল্লি তো হয়ই।

চন্দ্রাও ক্রমশঃ যেন মনস্থির করে ফেলেছে এখান থেকে চলেই যাবে হরিয়ানায়। সেখানে গিয়ে আদালতে মামলা করে ডিভোর্স নেবে। কথাটা সেদিন সে গিরিধারীকেও বলে।

গিরিধারী অবশ্য মনে মনে চায় চন্দ্রা যায় যাক, তবে তার বিষয় আশয় তাকে লিখে দিয়ে যেতে হবে। চন্দ্রার উপর নয়, তার নজর ওর বিষয় আশয়ের দিকেই।

কারণ গিরিধারী এখন গোপনে চেষ্টা করছে পাটনার ওদিকে তার এক

শ্বশুর গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিস করবে। চলে যাবে এখান থেকে।

আর অবনীর মেয়ে ওই লতিকার সঙ্গেও এখন তার ব্যাপারটা বেশ এগিয়েছে। অবনীর একমাত্র মেয়ে, তারও টাকা বিষয় আশয়ের অভাব নাই।

গিরিধারী তাই চন্দ্রার কথায় বলে—তোমার যা খুশী করো।

চন্দ্রা বলে—চলেই যাবো আমি।

—তাহলে তোমার বিষয় সম্পত্তি আমাকে লিখে দাও, ব্যস, ছুটি। কেউ তোমাকে আটকাবে না।

চন্দ্রা লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। ঘৃণায় তার সারা অন্তর মন রি রি করে ওঠে। বলে—তোমার কাছে ওই টাকা, জমিন জায়দাদই বেশী দামী তা বুঝেছি। আমাকে বিয়ে করেছিলে ওসবের জন্যই ?

গিরিধারী বলে—সত্যি কথাটা যদি জেনেই থাকো সেইমত কাজ করো।

চন্দ্রা বলে—ভেবে দেখি।

ব্যাপারটা এড়িয়ে যায় সে। গিরিধারী বেশ বুঝেছে চন্দ্রা তাকে পাত্তাই দিতে চায় না। সে চলতে চায় নিজের মতে।

গিরিধারীও তার কর্তব্য স্থির করে নেয়।

কিন্তু মুকুন্দরামের স্ত্রী অর্থাৎ গিরিধারীর মা জননী ব্যাপারটা আঁচ করেছে আগে থেকেই। তাই স্বামীকেও বলেছে,

—বহুর মতলব সুবিধার বুঝছি না। উ কুছু লিখে দিতে চায় না। মুকুন্দরামও প্ল্যান করেছে ওর কাছ থেকে সবকিছু লিখিয়ে নিয়ে ওকে বের করে দেবে। সেইমত দলিলপত্রও করেছে সে।

তারপর আবার তার ডাক্তার ছেলের বিয়ে দিয়ে অর্ধেক রাজত্ব ঘরে আনবে। সেইমত এগিয়ে গেছে সে।

তাই বলে স্ত্রীকে—তুমি কিছু বোল না, যা বলার হামিই বলবে বহুকে।

মুকুন্দরাম বৌ-এর চিঠিখানা পোস্টাপিস থেকেই হাতিয়ে নিয়েছে। এর আগে ওর কাকার চিঠিও এসেছে কিন্তু সেসব চিঠি চন্দ্রার হাতে পৌঁছয় নি।

চন্দ্রাও তাই ভাবে দেশেই যাবে সে।

সেইমত বলে চন্দ্রা মুকুন্দরামকে—চাচাজীর খবর পাই নি। একবার হারিয়ানায় যাবো ভাবছি।

মুকুন্দরাম বলে—হ্যাঁ। অনেকদিন এসেছো, বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন তো করবেই। যাও, একবার ঘুরেই এসো। হ্যাঁ, যাবার আগে ওই কাগজগুলোয় দস্তখত করে দিয়ো।

ওর সামনে দলিলটা বের করে।

চন্দ্রা শুধোয়—কিসের কাগজ!

মুকুন্দরামের স্ত্রীও এসে পড়েছে। শেঠিয়ানীর নজর সব দিকেই।

মুকুন্দরাম বলে—মামুলী কাগজ। এখানে তোমার নামে কিছু জমিন নিল, উখানে ভী ফ্যাক্টরী করবে। তাই তুমি কোম্পানীকে লিখে দিচ্ছ।

কিন্তু চন্দ্রা ইংরাজী জানে, সে দলিলটা পড়েই চমকে ওঠে।

—আমার সবকিছু লিখিয়ে নিতে চান কৌশল করে? এত লোভী—নীচ আপনি?

মুকুন্দরাম ধরা পড়ে যেতে এবার বলে—সই করো। নাহলে তোমার ব্যবস্থা আমি করবো, জিন্দগীতে এ বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না।

চন্দ্রাও বুঝেছে ব্যাপারটা। সে জানে এদের স্বরূপ। তাই বলে।

ওটা রেখে যান, আমি পরে সই করবো।

—ঠিক তো! মুকুন্দরাম ওকে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না।

চন্দ্রা বলে—তাহলে নিয়ে যান।

মুকুন্দরাম বুঝেছে একে চাপ দিলে হবে না কিছু। তাই কাগজটা দিয়ে বলে—সাবধানে রেখে দিও। কালই সই করে দেবে।

চন্দ্রা ভেবে রেখেছে এই শত্রুপুরী থেকে যে ভাবেই হোক তাকে বের হয়ে যেতেই হবে। বের হতে পারলে এই দলিল দেখিয়ে সে পুলিশকে বলতে পারবে এদের লোভ লালসা, অত্যাচারের কথা। তাই সন্ধ্যার পরই চন্দ্রা ব্যাগে সামান্য কিছু জিনিষপত্র টাকা গহনা পুরে নিয়েছে।

সন্ধ্যার সময় শাওড়ী দেবতার আরতি করতে তিনতলায় যায়। মুকুন্দরামও থাকে বাইরের গদি ঘরে, সেই ফাঁকে কোনমতে বের হয়ে যাবে চন্দ্রা।

বের হয়ে বাসরাস্তার ওদিকে গেলে সহরে যাবার বাসও পাবে। কোনমতে সহরে পৌঁছে গেলে সে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

সেইমত বের হবার মতসবই করেছে চন্দ্রা।

সন্ধ্যার পর বাড়িটা কেমন থমথম করে। বেশী আলো জ্বালার হুকুম নেই শেঠজীর। বিজলির জন্য বাজে খরচা সে করতে চায় না। বাড়িটার সর্বত্র থমথমে অন্ধকার।

পিছনের দরজাটায় এমনি খিল আটকানো থাকে। রাতে ওখানে তালা পড়ে, সদরেও। গিরিধারীর ফিরতে রাত হয়। তখন ভজুয়া চাবি খুলে দেয়।

চন্দ্রা একতলার চাতালে নেমে উঠানের দিকে এগিয়ে চলেছে। উঠান পার হলেই খিড়কির দরজা। ওখানে তালা পড়েনি এখনও। দরজা খুলে পিছনের গলি দিয়ে অন্য পাড়ার মধ্যে দিয়ে বড় রাস্তায় উঠে পড়বে সে।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা হাত এসে ওর ঘাড়টাই টিপে ধরে। চাপা স্বরে গর্জে ওঠে মুকুন্দরাম—কাঁহা ভাগতা! অ্যাঁ—

চমকে ওঠে চন্দ্রা। হাতে ব্যাগ সমেত ধরা পড়ে গেছে সে।

মুকুন্দরাম তার উপর কড়া নজর রেখেছিল। সেও কম ধূর্ত নয়। ঠিক

বুঝেছিল এই মেয়েটা পালাবার মতলবই করেছে। ও বাইরে গেলে তার সব মতলব ফাঁস হয়ে যাবে।

এবার হাতে নাতে ধরে ফেলেছে চন্দ্রাকে।

শেঠিয়ানীও নেমে আসে। ভারী শরীর নিয়ে বাচ্চা হাতির মত হেলতে দুলতে এসে এবার বাঘের মত থাবায় চন্দ্রাকে ধরে টানতে টানতে এনে দোতলার কোণের ঘরে ঢুকিয়েছে। মুকুন্দরামও তার ব্যাগে গহনা, টাকা কড়ি মায় সেই দলিল পেয়ে চমকে ওঠে।

চন্দ্রাও বলে—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি পুলিশে যাবো। তোমাদের সব ষড়যন্ত্রের কথাই বলবো।

মুকুন্দরাম জানে তাতে সর্বনাশই হবে। থানায় বড়বাবু নেই, এখন রয়েছে মেজবাবু ওই খচ্চর পুলিশ অফিসার মনীশ। সে তার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

শেঠিয়ানী বলে—তুমু খামোস রহো জী। ইস্‌কা বন্দোবস্ত হম্‌ করে গা।

গিরিধারীও দেখেছে বৌ হাতে নাতে ধরা পড়েছে মা বাবার হাতে। ওদের এখন সমূহ বিপদ। চন্দ্রাকে ছেড়ে দিলে ওদের রক্ষা থাকবে না। ওই মেয়ে তাদের সর্বনাশ করবে।

চন্দ্রাকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়।

গিরিধারীও বুঝেছে একটা চরম বিপর্যয়ই হতে চলেছে। বাবা মাকে তবু থামাবার চেষ্টা করে সে।

—এসব করো না, ওকে ছেড়ে দাও।

বাবা গর্জে ওঠে—এত বিষয় আশয় ছেড়ে দিবে? ওই মেয়ের সব বন্দোবস্ত আমি করে দিবে। কোই ঝুট ঝামেলা হবে না। তু ফিকির মৎ কর

মাও বলে, তু কাহেকো ঘাবড়াতা রে! মুঝ পর বিশোয়াস রাখ। সব কুছ শান্তিসে হয়ে যাবে।

গিরিধারী সরে আসে। সে বুঝেছে এদের থামানো যাবে না। তাই নিজেই সে এসব ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চায়। তার পথ সে নিজেই বের করে নিয়েছে।

•

লতিকাও এই কিছুদিনের মধ্যে গিরিধারীর অনেক কাছেই এসে গেছে। মেয়েটা বুঝেছে এখানে থাকলে গিরিধারীকে সে কাছে পাবে না। তাই ওই মেয়েটাও সহজেই গিরিধারীর কথায় রাজী হয়ে যায়।

মেয়েরা প্রেমে পড়লে কেমন বেহিসেবী হয়ে যায়। তাই বোধহয় এমন হিসেবী লোক অবনীবাবু, তার একমাত্র মেয়েও সহজেই গিরিধারীর জালে পা দিয়ে কেমন একটা বেপরোয়া সিদ্ধান্তই নিয়ে বসে।

গোঁসাইগঞ্জের শান্ত পরিবেশ পরদিন সকালেই কেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ এতগুলো বিচিত্র ঘটনা একসঙ্গে ঘটে যাবে তা কেউ ভাবেনি।

সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে যায়।

কাল রাতে মুকুন্দরাম শেঠের রান্নাঘরে একটা দারুণ অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে। তার ছেলের বৌ চন্দ্রা রান্নাঘরে রান্নার কাজ করার সময় গ্যাসের আগুনে সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে গেছে। গ্যাস আগে থেকেই লিক্ করছিল, রান্নাঘরের হাওয়া তাতেই বিষিয়ে ছিল, চন্দ্রা খেয়াল করেনি। গ্যাস জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই বেড়া আগুনে মেয়েটা পুড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

তারপরই খোঁজ পড়ে গিরিধারীর।

গিরিধারীকে নাকি সন্ধ্যার পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না, আরও বিচিত্র ব্যাপার যে অবনীবাবুর মেয়ে লতিকাও বাড়িতে নেই।

অবনীবাবুও চমকে ওঠে। চারিদিকে খোঁজ খবর চলতে থাকে। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। গোপেনও তার দলবল নিয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে।

অবনীবাবুর স্ত্রী বলে—বিকালে গিরিধারী এসেছিল। ইদানীং অবনীবাবুও দেখেছিল যে গিরিধারী প্রায় আসে এখানে। লতিকার বেসুরো গলার গানও শোনা যায় ও এলে। হাসির শব্দও শোনা যায়।

মাঝে মাঝে দুজনে গাড়িতে করে সহরেও যায়, কেনা কাটা করে সিনেমা দেখে রাত করে ফেরে।

ব্যাপারটা তার মোটেই ভালো লাগেনি। স্ত্রীকেও বলেছে বার বার—এতটা মেলামেশা ঠিক নয়।

কিন্তু তার স্ত্রীই বলে—ছেলেবেলা থেকে চেনা জানা, এ বাড়িতে আসে ছেলের মত। লতিকাও এলে একটু খুশী হয়। এ নিয়ে এত ভাবছ কেন?

অবনীবাবু মুকুন্দরামের ব্যবসার পার্টনার হলেও লোকটাকে মনে মনে সহ্য করতে পারে না। ও চেনে লোভী মুকুন্দরামকে। ছেলের বিয়ে দিয়ে এক জায়গায় প্রচুর কিছু পেয়েছে, তার মত লোভী মানুষ যে তার ছেলেকে এখানে তার বিষয়ের লোভে এগিয়ে দেবে না তাই বা কে জানে? তাই অবনী বলে—যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। ওদের বিশ্বাস নাই।

স্ত্রী বলে—এসব নিয়ে এত ভাবছ কেন? মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টাই করো। বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবনীবাবু এর মধ্যে কুসুমপুরের একটি ছেলেকে পছন্দও করেছে। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার। গরীবের ঘর—তাই অবনীর টাকা, কারখানা এসবের লোভে তার বাবাও রাজী হয়েছে। মেয়েকেও দেখে গেছে তারা। লতিকা তখন কোন কথাই বলেনি।

অবশ্য এসব খবর গিরিধারী জানে। তাই সেও এসব কিছু ঘটার আগেই এই কাজ করেছে।

সন্ধ্যার পরই গিরিধারী তৈরী ছিল গাড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনের রাস্তায়। লতিকাও খামার বাড়ির নির্জন গলিপথ দিয়ে অন্ধকারে বেশ কিছু টাকাকড়ি আর গহনাপত্র নিয়ে কেটে পড়ে। দুজনে গাড়ি নিয়ে সোজা ওই রাতেই কলকাতায় চলে আসে। সেখানে বন্ধুর বাড়িতে গাড়ি রেখে ওরা পরদিন সকালের ট্রেনেই পাটনার দিকে চলে যায়।

গ্রামের মানুষ যখন হৈ চৈ করছে তখন ওরা অনেক দূরে।

অবনীবাবুও আশা করেনি যে মুকুন্দরামের ছেলে এইভাবে তার বংশের মুখে কালি দিয়ে তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে।

সে যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে।

তবু তার স্ত্রী বলে—লতিকাকে আর কেউ জোর করে তুলে নিয়ে গেল কিনা খবর নাও। ওদিকে গিরিধারীর বাড়ির খবর শুনেছো?

অবনীর ওসব খবর শোনার সময় নাই। সে নিজের বিপদ নিয়েই ব্যস্ত। এতকাল ধরে সে সকলের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। মানুষকে বঞ্চনাই করেছে। আজ তার জীবনে তাই এক চরম সর্বনাশই ঘটেছে। তার একমাত্র মেয়েকে কারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

তার মান সম্মানও আজ লুণ্ঠিত। কি অসহায় বেদনায় বুকটা কেঁপে ওঠে, চোখের সামনে নেমে আসে অতল অন্ধকার। সোফায় বসেছিল, জ্ঞানহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ে অবনীবাবুর।

তার স্ত্রী চীৎকার করে—গোপেন, ওরে গোপেন! একি সর্বনাশ হলো দ্যাখ। শিগগীর ডাক্তার—ডাক্তারকে ডাক। গোপেনও এসে পড়ে।

অবনীবাবুকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে এবার গোপেন ভাবনায় পড়ে। নার্সিং হোম থেকেও না থাকা। গিরিধারীও নেই। বাইরের ডাক্তাররাও আসে না।

এখন অবনীর প্রাণ সংশয়। বোধহয় স্ট্রোকই হয়েছে। গোপেন বাধ্য হয়েই ছুটলো হাসপাতালে অমল ডাক্তারের সন্ধানে।

ওদিকে অমল তখন ব্যস্ত ওই চন্দ্রাকে নিয়ে। বেশ ভালোভাবেই পুড়েছে। বেশী নড়াচড়া করার উপায়ও নাই।

শেঠ মুকুন্দরাম রাতেই ওই কাণ্ড করেছে।

অবশ্য এই কাণ্ডের মূল হোতা তার স্ত্রীই। সেইই রান্নাঘরে আগে থেকেই সিলিন্ডারের মুখটা খুলে রান্নাঘরে গ্যাস ভরিয়ে রেখেছিল।

বাড়ির বৌ রান্নাঘরে গ্যাসের আগুনে পুড়েছে এটা সহজেই বিশ্বাস

করবে অনেকে। কারণ এমন দুর্ঘটনা বাড়িতে ঘটতেও পারে। বধূহত্যার এই সহজ পথটাই বেছে নিয়েছিল শেঠজীর স্ত্রী।

ওই গ্যাস ভর্তি ঘরে চন্দ্রাকে এনে ঢুকিয়ে দেশলাই জেবলে ছুঁড়ে দিতেই জবলে ওঠে ঘরটা। চন্দ্রা ভাবতে পারেনি এইভাবে তার ঔদ্ধত্যের জবাব দেবে ওরা।

ওই জবলন্ত ঘর থেকে বের হয়ে আসে কোনমতে তখন শাড়িটা জবলছে।

আর শেঠিয়ানও ভাবতে পারেনি এইভাবে মেয়েটা বের হয়ে আসবে সবাঙ্গে আগুন নিয়ে। ভয়ে এবার সে চীৎকার করে ওঠে আগুন—আগ্—আগ্ জবলতা।

শেঠ মুকুন্দরামই কোনমতে জল ঢেলে আগুন নেভায় ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

গিরিধারীও বেপাত্তা।

ডাক্তারও নাই নার্সিংহোমে, তাই রাতেই অমলকে ডাকতে হয়। অমল এসে দেখে বলে—বেশ ভালোভাবেই হাত টাত পুড়েছে। হাসপাতালে নিয়ে চলুন। স্যালাইন, ইনজেকশন দিতে হবে, দরকার হলে ব্লাডও দিতে হবে।

বাধ্য হয়েই সেই হাসপাতালেই আনতে হয়েছে। আর অমলই পুলিশকেও খবর পাঠায়। বড় দারোগাবাবুও ছুটে আসে।

মুকুন্দরাম তখন কপাল চাপড়ে হো হো করে কাঁদছে—মেরে বেটিকো ক্যা হো গিয়া? হায় রাম!

শেঠিয়ানী তো কান্নায় কথাই বলতে পারছে না। তার ঘরের লক্ষ্মীর এই হাল দেখে স্নেহময়ী শাশুড়ী কেঁদেই চলেছে।

অমলই বলে—এভাবে কান্নাকাটি করে কি হবে?

বড় দারোগাই মেজবাবুকে এসব জানতে না দিয়ে আগে থেকে নিজেই এসে এখানে হাজির হয়েছে।

অমল বলে—ফাস্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট করে রাখুন ডাইরীতে। পেসেন্টের জ্ঞান ফিরলে তার স্টেটমেন্টও নিতে হবে।

বড় দারোগা শুনছে ওর কথা।

মুকুন্দরাম বলে—উসব পিছু হোবে ডাক্তারজী, পহেলা মেরা লছমীকো বাঁচান! যিত্না রুপেয়া লাগে দিবে।

অমল বলে—ওষুধপত্র কিছু আনান, আর টাকা লাগবে না। এ আপনার নার্সিং হোম নয়।

রাতভোর খেটেছে অমল, বিনোদ ডাক্তার দুজনে। নার্সও রয়েছে সঙ্গে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি চন্দ্রার। তবে হার্ট বিট, পাল্স অনেক নর্মাল হয়ে এসেছে।

সকাল বেলাটা এখানে এখন বেশ মনোরম। পাখীদের ডাকে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস। ওদিকে সবুজ ধান ক্ষেতে দিগন্তপ্রসারী সবুজ গালচে পাতা। বর্ষার দাপট চলে গিয়ে শরতের ছোঁয়া লেগেছে, টুকরো মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ দেখা যায়। আপনা থেকেই ধরনীর খুশী যেন রূপ নিয়েছে ওই শালুক—রক্তশাপলার ফুলে, কাশফুলের শ্বেত উত্তরীতে।

কুসুম চা আনে।

হঠাৎ এমন সময় গোপেনকে আসতে দেখে চাইল অমল। কোনদিন ওরা এই হাসপাতালের ত্রিসীমানায় পা দেয়নি বরং সব রকমে চেষ্টাই করেছে যাতে এই হাসপাতাল উঠে যায়।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস যে মুকুন্দরামের ঘরের বৌ চন্দ্রাকে এখানেই আনতে হয়েছে, কারণ যে ভাবে পুড়েছে তাতে সহর অবধি নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব।

আর একটা কারণেও সহরে নিয়ে যেতে চায়নি মুকুন্দরাম। জানে এরপর পুলিশের হাঙ্গামা হবে। বাইরে সেটা সামলাতে পারবে না। এখানে সেটা কোনমতে সামলে নিতে পারবে। আর এখানে ঠিকমত চিকিৎসা হবে না। যদি মরেই যায় চন্দ্রা তারা বেঁচে যাবে।

তাই মুকুন্দরাম কান্নার ভান করলেও মনে মনে রামজীকে ডাকছে—ও যেন খতমই হয়ে যায়। তাতে তার অপরাধ আর প্রমাণিত হবে না, অথচ ঠিকমত চিকিৎসা হয়নি এই অজুহাত তুলে এবার হাসপাতালের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে সে কেসই করতে পারবে।

মুকুন্দরাম মনে মনে এই মতলবই ভাঁজছে।

বড় দারোগাবাবু রাতে এখানে থেকে গেছে, অমলকে বলে।

—পুলিশও স্টেপ নেবে ভাববেন না।

অমল সকালে গোপেনকে আসতে দেখে চাইল।

গোপেন বলে—কাকা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যদি একবার যান।

কুসুম বলে ওঠে—তা বাবু, আপনাদের এত বড় নার্সিংহোম, গিরিধারী ডাক্তার, অন্য ডাক্তার থাকতে ইখানে?

গোপেন বলে—ওরা কেউ নাই।

অমলও জানে খবরটা। গিরিধারীবাবু নাকি কাল বিকালে সহরে গেছেন। তার স্ত্রীকেও এখানে আনতে হয়েছে। এবার অবনীবাবুর খবর শুনে বলে অমল—কি হয়েছে তার?

গোপেন বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না। যদি যান।

অমল উঠে পড়ে।

অতুল, কুসুমদের মনে হয় এ যেন কোন ষড়যন্ত্রই। তাই অতুলই অমলের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলে—চলুন। আমি সঙ্গে যাচ্ছি। অর্থাৎ ওরা তাকে একলা যেতে দিতে রাজী নয়।

অমল অবনীবাবুর বাড়িতেও এই প্রথম আসছে। সে দেখে এদের প্রাচুর্য। আর এসবের উৎসটা কোথায় তাও জানে। জমিদারী প্রথা উঠে গেলেও সেই জমিদারদের ঠাঁই নিয়েছে আজকের জনসেবকদের অনেকে। জমিদারদের কিছু সংস্কৃতি, কিছু ঐতিহ্য, কিছু হৃদয়বত্তা ছিল, কিন্তু একালের এই সদ্য গজিয়ে ওঠা তথাকথিত প্রভুশ্রেণীর সে সবের কোন বালাই নাই, এরা চেনে টাকা আর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ। সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনতাকে ধাপ্পা দিতে, বঞ্চনা করতে এতটুকুও বিবেকে বাধে না তাদের।

অবনীবাবুকে দেখে অমল।

ওর স্ত্রীর চোখে জল। বলে—একমাত্র মেয়ে সে ওই গিরিধারী শয়তানের পাল্লায় পড়ে কোথায় চলে গেল। এসব শোনার পরই এই অবস্থা। মানুষটাকে বাঁচাও বাবা।

অমল বলে—গোপেনবাবু, এঁকে অক্সিজেন দিতে হবে। আর ই সি জিও করতে হবে। আমার নিজের ওই মেশিন আছে। সর্বক্ষণ নজরে রাখতে হবে। ওদিকে হাসপাতাল ছেড়ে আসা যাবে না। ওঁকে হাসপাতালেই নিয়ে চলুন।

তেমন দেখলে তখন সহরে পাঠাতে বলবো। ওঁকে ওখানে নিয়ে যেতে হবে।

ওঁর স্ত্রী বলে—তাই নিয়ে চল গোপেন।

—কিন্তু! গোপেন জানে জ্ঞান ফিরলে কাকা তাকেই বকবে।

কাকীমা বলে—ওসব আমি সামলাবো। এখন এঁকে বাঁচানো দরকার। নিয়ে চল ওখানে।

হাসপাতালে অবনীবাবুর জ্ঞান ফেরে। স্ত্রী—গোপেনকে দেখে চাইল। ওদিকে দাঁড়িয়ে অমল ডাক্তার।

অবনী অবাক হয়—এখানে!

ওঁর স্ত্রী বলে--বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। গ্রামে হাসপাতাল ছিল, ওই ডাক্তার ছিল তাই প্রাণে বাঁচাতে পেরেছি তোমাকে। ওই অমল দিনভোর এখানে তোমার পাশে রয়েছে।

অমল বলে—এখন কোন কথা নয় অবনীবাবু, এখন আপনি আমার পেসেন্ট। আমার কথা মতই চলতে হবে, কোন কথা নয়, চুপচাপ রেস্ট নিন।

নার্স এসে কি একটা ইনজেকশন দেয়। কি গভীর আলস্যে অবনী ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যায়।

জ্ঞান ফিরেছে চন্দ্রার।

অতুল থানায় খবর দিতে মেজবাবু ডিউটিতে ছিল, সেই মনীশবাবুই আসে চন্দ্রার স্টেটমেন্ট নিতে।

মুকুন্দরাম শেঠিয়ানীও তখন নেই। কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে গেছে। তাদের সতর্ক প্রহরাও নেই।

মনীশ অবশ্য এর মধ্যেই বেশ কিছু কথা শুনেছে।

কুসুমই ছিরিকেও এনেছে। মনীশকে চন্দ্রা আজ ওর বিবাহিত জীবনের সব কাহিনী, ওই শেঠজী, তার স্ত্রী এমনকি তার স্বামী গিরিধারীর লোভ, লালসা, হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাও বলে।

আর চন্দ্রা বলে—আমার সর্বস্ব লিখিয়ে নেবার দলিলটাও পাবেন আমার ঘরে আমার ব্যাগের মধ্যে, অবশ্য ওরা যদি সরিয়ে না নেয়। আমার ধারণা—গিরিধারীর বাবা চেয়েছিল আমার সবকিছুর দখল নেবে, আমাকে শেষ করবে। আর তার ছেলে এবার অবনীবাবুর সর্বস্ব হাতাবার জন্য ওর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে। কৌশলে তাকে ধাপ্পা দিয়ে বিয়ে করে ফিরে এসে এবার অবনীবাবুরও সর্বস্ব গ্রাস করে তার মেয়েরও আমার মত অবস্থাই করবে।

স্টেটমেন্টে চন্দ্রা নিজেই সই করে, অমল ডাক্তারকেও সাক্ষী হিসাবে রাখে মনীশবাবু। বলে সে,

—ডাক্তারবাবু, এমন লোকদের শাস্তি দেওয়াই উচিত। আর আমি হাসপাতালে পুলিশ পোস্টিং করছি।

—কেন? অমল অবাক হয়।

মনীশ বলে—এসব জানার পর শেঠজীর মত লোকদের বিশ্বাস নাই। চন্দ্রাদেবীকে ওরা মার্ডার করতেই চেয়েছিল, পারেনি। এখানেও সেই কাজটা করতে পারে। তাই এই স্টেপ আমাকে নিতে হবে।

অবনীবাবুও সব খবরই শোনে।

এবার তার স্ত্রীই বলে—যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসার নামে লোককে ঠকিয়ে এসেছো, সেই শেঠজী কেমন লোক বোঝো এইবার। আমাদেরও সর্বনাশ করেছে। কে জানে ললিতাকে কোথায় নিয়ে গেছে গিরিধারী।

গোপেনও বসে নেই। পুলিশই লতিকার মিসিং রিপোর্ট করেছে। আর খবর পেয়েছে গিরিধারীর পাটনার সেই বন্ধুরও।

গোপেন পাটনাতেই গেছে যদি তাদের কোন খবর পায়।

থানার বড় দারোগাবাবু এবার চন্দ্রার স্টেটমেন্ট দেখে চমকে ওঠে। মেজবাবুকে বলে—এসব কেন লিখলেন?

মনীশ বলে—চন্দ্রাদেবী যা বলেছে তাই লিখেছি। এবার শেঠজী, ওর

স্ত্রীকে অ্যারেস্ট করতে হবে।

এদিকে গ্রামেও খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। বধূহত্যার চেষ্টার খবর, অবনী-বাবু আজ হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। অমলও আসে ওর বাড়িতে। ওর স্ত্রীকে বলে—ওষুধপত্রগুলো ঠিকমত খাওয়াবেন। আর কোনও উত্তেজনা যেন না আসে। কোন দরকার পড়লে আমাকে খবর দেবেন।

অবনীবাবুর স্ত্রী বলেন—হ্যাঁ, বাবা।

আজ ওই মহিলাই নয়, অবনীবাবুরও মনে হয়, ওই মুকুন্দরামের কথামত চলে নিজের এই সর্বনাশ ডেকে এনেছিল সে। ওই ডাক্তারের নামে যা তা বদনাম দিয়েছে, হাসপাতাল তুলে দেবার চেষ্টাই করেছে। স্ত্রী বলে,

—এমনি একটি ছেলের বিরুদ্ধে লেগেছিলে তোমরা। ওর জীবন নেবার মতলবও করেছিলে, অথচ ওই বাঁচালো তোমাকে।

বাইরে তখন জনতার চীৎকার চলেছে। সারা এলাকার মানুষ আজ চলেছে থানা অবরোধ করে তাদের প্রতিবাদ জানাতে। ওই লোভী, খুনে মুকুন্দরামকে চরম শাস্তি দিতেই হবে।

অবনীবাবুও শোনে ওই সমবেত কণ্ঠের সোচ্চার প্রতিবাদ। আজ মনে হয় মুকুন্দরাম তারও সর্বনাশ করেছে। আজ সেও বলে—ওরা ঠিক করছে। ওই মুকুন্দরামের শাস্তি হওয়া উচিত।

ওর স্ত্রী বলে—এবার জ্ঞান হয়েছে তাহলে?

থানার বড়বাবু প্রথমে ভেবেছিল ভালো টাকায় রফা একটা করবে মুকুন্দ-রাম। কিন্তু বাদ সাধল ওই মনীশবাবু, আর তারপরই এই অঞ্চলের মানুষ ভবতোষবাবু, নির্মলবাবু, নরেশবাবুদের নেতৃত্বে এসে থানা ঘেরাও করে এই অন্যায়ের প্রতিকারের দাবী জানায়।

বড় দারোগাও চতুর সাবধানী লোক। সেও বুঝেছে অবনীবাবুও সরে দাঁড়িয়েছে ওই মুকুন্দরামের পাশ থেকে। জনতাও বিরূপ। এসময় চাকরী বাঁচানোর জন্য তাকে কর্তব্যপরায়ণ হতেই হবে।

তাই মুকুন্দরামের নামে—ওর স্ত্রীর নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টও বের করে দেয়, মায় সার্চ অর্ডারও। সেই দলিলটা চাই। তাই মনীশই সার্চ ওয়ারেন্টও বের করতে বলে।

বড় দারোগা একেবারে নিমক হারাম নয়। মুকুন্দরামের অনেক নুন খেয়েছে। তাই গোপনে তার কোন অনুগত চরকে দিয়ে খবরটা আগেই পৌঁছে দেয় মুকুন্দরামের কাছে। ইঙ্গিত দেয় আপাততঃ চলে যাক এখান থেকে ওরা। এইভাবেই অ্যারেস্টকে এড়ানো যাবে। পরে কোর্টে আত্ম-সমর্পণ করে জামিন নেবে সহর থেকে। তাহলে এই জনতার সামনে অপদস্থ

হতে হবে না।

মুকুন্দরামও বুঝেছে আপাততঃ এখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় তার ভাই এর বাড়িতেই চলে যাবে ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে। বড় দারোগার কথামতই চলবে।

গোছগাছ করে তখুনিই পালাবে তারা। গাড়িও তৈরী। গ্রামের পিছনের পথ দিয়ে ঘুর পথে চলে যাবে।

গাড়িতে উঠতে যাবে—হঠাৎ মনীশকে পুলিশ নিয়ে আসতে দেখে চমকে ওঠে মুকুন্দরাম।

মনীশবাবু বলে—আপনাদের দুজনকেই থানায় যেতে হবে।

—কাহে! আমাদের এখন বিপদ। বিটিয়া হাসপাতাল—মুকুন্দরামের কথায় মনীশ বলে।

—চন্দ্রাদেবীর জ্ঞান ফিরেছে। তিনি পুলিশকে সব কথাই বলেছেন। তাই আপনাদের অ্যারেস্ট করা হোল। আর ওই রান্নাঘর, বাড়ি আমরা সার্চ করবো।

মুকুন্দরাম ফুঁসে ওঠে—এ জুলুম।

—যা বলার আদালতে বলবেন। চলুন—আমরা সার্চ করবো সঙ্গে থাকবেন। কিচেনটাও দেখাবেন।

তাড়াতাড়িতে রান্নাঘরের সেই সিলিন্ডারের মুখও বন্ধ করা হয়নি। সব গ্যাস নিঃশেষ হয়ে গেছল তবু মুখটা খোলাই আছে।

মনীশ বলে—একি! সিলিন্ডারের মুখ খোলা কেন? সর্বনাশ! এবার চন্দ্রার কথার সত্যতার প্রমাণ পায়, আর চন্দ্রার ব্যাগ থেকে ওরা দলিলটাও বের করতে ভুলে গেছল। সেই দলিলখানাও বের হয়। তাতে মুকুন্দরামই যে ওই স্ট্যাম্পপেপার কিনেছিল পিছনে ভেন্ডারের লেখা থেকেই তা প্রমাণ হয়।

মনীশ বলে—শেঠজী, এত লোভী, এত নিষ্ঠুর আপনি! ছেলেও এসব ব্যাপারে জড়িত। কোথায় সে।

শেঠজী বলে—মালুম নেহি।

—মালুম সবই হবে। চলুন।

সারা গ্রামের মানুষ থানায় ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের মধ্য দিয়েই মুকুন্দ-রামকে সস্ত্রীক সমারোহ করে থানায় আনা হলো।

এর মধ্যে গোপেনও পাটনায় গিয়ে হাজির হয়েছে এখানের পুলিশকে নিয়ে। সেখানে সেই বন্ধুর বাড়িতেই পাওয়া গেল গিরিধারীকে। লতিকাকেও এনেছে এখানে। এখান থেকে কালই তারা গ্রামের দিকে চলে যেতো। কিন্তু তার আগেই গোপেন এভাবে এসে ওদের হাতে নাতে ধরবে তা ভাবেনি

গিরিধারী।

লতিকাও ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে এখন পস্তাচ্ছে। বাবা মায়ের কথা মনে পড়তে সেও বলেছিল গিরিধারীকে—ফিরে চলো।

গিরিধারী বলে—ওসব কথা বলবে না। এখন আর ফেরার পথ নাই। বিয়ে সাদী করে তারপর ফিরবো।

অর্থাৎ গিরিধারী আইন মাফিক দখলদার হয়েই ফিরতে চায়।

লতিকা বলে, বাবা মায়ের মত নিয়েই বিয়ে হবে, চলো।

—নেহি। গিরিধারী তাতে রাজী নয়। সে কাজ পাকাই করতে চায়। লতিকারও আপত্তি এখানেই। তাই নিয়েই বচসা হতে গিরিধারী গর্জে ওঠে—চুপ করে থাকবে। একদম চুপ। নাহলে

—নাহলে কি করবে? মারবে? ওই আগেকার বউ এর মত। লতিকাও একদিনেই যেন গিরিধারীকে চিনেছে। কিন্তু ফেরার পথ আর নাই। আপশোষ হয় লতিকার। ভুলই করেছে।

তার এতদিনের দেখা স্বপ্নটা এক দিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

এমনি দিনে গোপেনদাকে পুলিশ নিয়ে আসতে দেখে এবার লতিকাই বলে—ও মিথ্যা কথা বলে আমাকে নিয়ে এসেছে।

গোপেন আজ ওদের চিনেছে। নেহাৎ পুলিশ সঙ্গে আছে তাই মারতে পারেনি। নাহলে গোপেন প্রথমেই গিরিধারীকে আড়ং ধোলাই দিত।

গিরিধারী বলে—মিছে কথা এসব।

গোপেন বলে—নাতো কি লতিকাই তোমাকে ভুলিয়ে এই পাটনায় তোমার বন্ধুর কাছে এনেছে? শয়তানের বাচ্চা—শয়তান!

গিরিধারী বলে—বাপ তুলে কথা বলবে না।

পুলিশ অফিসার বলে—আপনার বাবার গুণের কথাও সব জানতে পারবেন। একটা বৌকে খুনের ব্যবস্থা করে আর একটি মেয়ের সর্বনাশ করতে চান! চলুন।

গ্রামে ফিরে দেখে গিরিধারী বাবা মা বাড়িতে নেই। বাড়িটা তালাবন্ধ, পুলিশ পাহারা রয়েছে।

—বাবা মা? ওরা কোথায়?

পুলিশ অফিসার বলে—সেখানেই নিয়ে যাবো, চলুন।

মুকুন্দরাম, সস্ত্রীক এখন জেল কাস্টডিতে, গিরিধারীকেও সেখানেই এনে তোলা হয়। তার বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা, নারী অপহরণ এসব কেসই দেওয়া হয়েছে।

গোঁসাইগঞ্জের রূপ এখন বদলেছে। অবনীবাবুও তার হারানো মেয়েকে

পেয়ে খুশী হয়। এতদিন পর যেন তার জীবনেও রাহুমুক্তি ঘটেছে।

এবার হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা উৎসব হচ্ছে বেশ ঘটা করে। ভবতোষবাবু নবেশবাবু, নির্মলবাবুদের চেষ্টায় হাসপাতালের নতুন একটা বিলডিং হচ্ছে।

সেই সভায় অবনীবাবুই তার নার্সিং হোমের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব হাসপাতালকেই দান করে, আর নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকাও দেয় বিলডিং ফান্ডে। বলে,

—ডাক্তার, সেদিন ভুল করেছিলাম অনেক। তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

অবশ্য হাটতলায় এখনও নিবারণ ডাক্তার, বদি কবরেজের দোকান আছে। সগৌরবে সাইন বোর্ডটা ঝুলছে।

হ্যানিমান হোমিও হলের গগন ডাক্তার এখন হোমিওপ্যাথী নিয়েই গ্রামে একাধিপত্য করছে। রোগী না থাক সে ঠিকই বসে তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া খায় আর সাপ লুডো খেলে।

এখন সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। চন্দনার বিয়ে থা হয়ে গেছে। চন্দনা গ্রামের গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করছে। ভালোই আছে ওরা। গগনও নিশ্চিন্ত হয়েছে।

অমল এসেছিল এই দূর পল্লীগ্রামে একক—নিঃসঙ্গ।

আজ তার কাছে এই গ্রামই যেন আপন হয়ে উঠেছে। এই মাটি—এই সবুজ প্রকৃতি, এখানের সহজ মানুষগুলো তার আপনজন।

চন্দনা বলে—এখান থেকে চলে যাবে বলছিলে, যাও!

অমল চন্দনাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—যাবো কি করে? এখানে এসে যে বাঁধা পড়ে গেলাম তোমাদের কাছে।

চন্দনা হাসে।

—আমার কাছে বাঁধা পড়েছো?

অমল স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—এই গ্রাম—এই জগৎকে তুমিই চিনিয়েছো চন্দনা। সেদিন তুমি পাশে না থাকলে হয়তো হার মেনে ফিরে যেতে হতো। তুমিই আমাকে জয়ী করেছো। তাই তো চিনেছি এই মাটিকে —মানুষদের।

চাঁদনী রাত। নিঝুম চারিদিক। দূরে রুদ্রপালতলার ওদিক থেকে অতুলের গানের ক্ষীণ সুর ভেসে আসে। ভাষাটা ঠিক বোঝা যায় না। সুরটা এই রাতের আকাশে কেমন মধুর একটি আবেশ আনে।

এখনও গান বাঁধে—গান গায় অতুল এত কাজের মধ্যেও। গোঁসাইগঞ্জের জীবনের সুর আজও হারায় নি। আজ অতুল গাইছে—পরে অন্য কেউ গাইবে এই পাঁচালী।